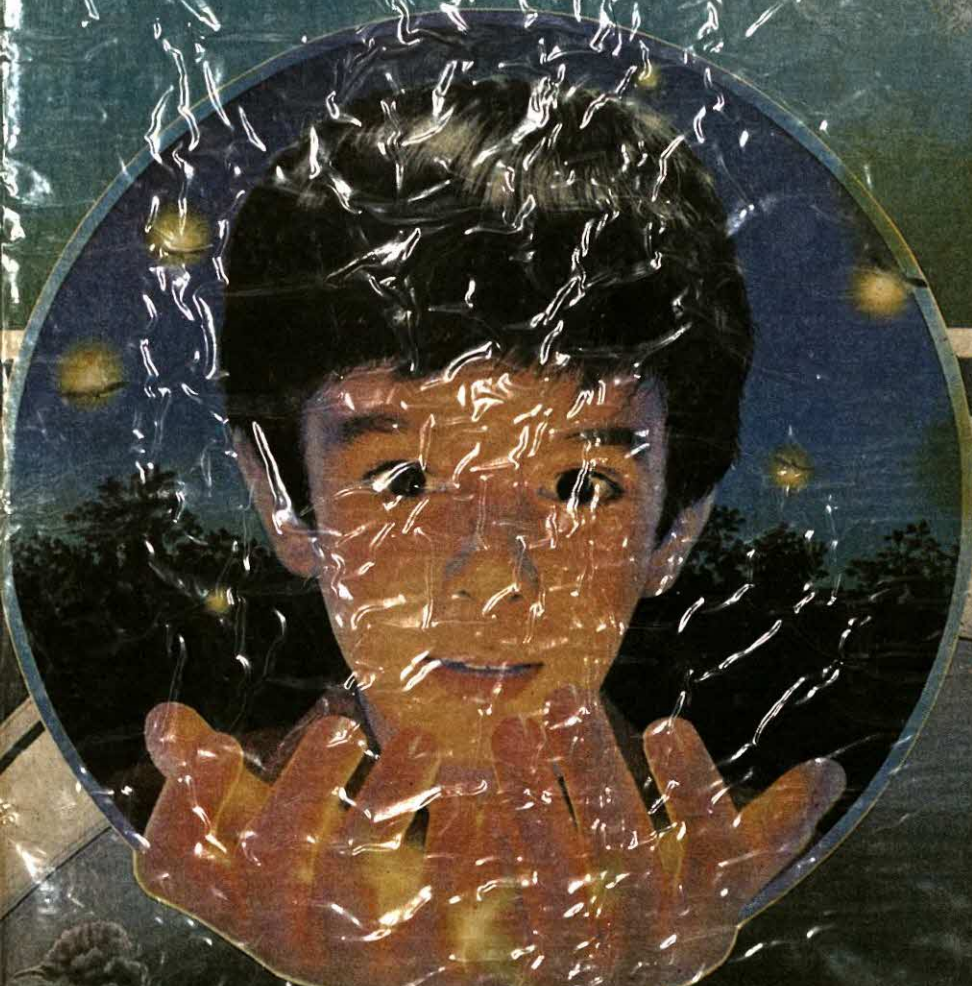
রাষ্ট্রীয় পুরস্কার প্রাপ্ত

মহাবিশ্ব মহাপ্রাণ

দেবদাস দাশগুপ্ত



মহাবিশ্ব মহাপ্রাণ

(ছোটদের বিজ্ঞান সাহিত্য)

রাষ্ট্রীয় পুরস্কার প্রাপ্ত

দেবদাস দাশগুপ্ত

পাঁচটি বইয়ের একত্র সংকলন

আকাশ ও পৃথিবী

পরাভূত প্রকৃতি

প্রাণ-এর কথা

চাঁদের দেশ

আজব কল

পাত্র'জ পাবলিকেশন

কলিকাতা-৭৩

১৯৬০-৬১ সনে ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ লোকসাহিত্য।
হিন্দি, উর্দ্দু ও কানাডী ভাষায় অনুবাদিত।
পশ্চিমবঙ্গ সরকার শিক্ষাবিভাগ কর্তৃক সাধারণ পাঠাগার
ও সমাজ শিক্ষা কেন্দ্রের জন্য নির্ব্বাচিত।

প্রথম পাত্র'জ সংস্করণ ১লা বৈশাখ—১৩৯৩, এপ্রিল—১৯৮৬

প্রকাশক :
শ্রীমানস কুমার পাত্র
পাত্র'জ পাবলিকেশন
২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-৭৩

প্রচ্ছদ :
প্রদোষকান্তি বর্মন

মুদ্রাকর
শ্রীএস সাহা
আশুতোষ লিথোগ্রাফিক কোং
১৩, ছিদাম মুদী লেন
কলিকাতা-৭০০০০৬

মূল্য পঁচিশ টাকা

প্রকাশকের নিবেদন

ইদানিং ছোটদের জন্য বিজ্ঞান সাহিত্য রচনায় শ্রীদেবদাস দাশগুপ্ত একটি বিশিষ্ট নাম। মাত্র পাঁচখানা বিজ্ঞানের বই রচনা করে তিনি চারবার রাষ্ট্রীয় পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করেছেন এবং দেশের বিশিষ্ট জ্ঞানী-গুণীজন দ্বারা অভিনন্দিত হয়েছেন। ভারত সরকারের অর্থানুকূল্যে পশ্চিমবঙ্গ গ্রন্থাগারিক সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত। "বাংলা শিশু সাহিত্য : গ্রন্থপঞ্জী" পুস্তকের প্রারম্ভে একশত বৎসরের বাংলা শিশু-সাহিত্যের বিভিন্ন ধারায় ক্রমবিকাশ নিয়ে যে মূল্যবান প্রবন্ধটি রয়েছে তাতে আধুনিক যুগের শিশুদের বিজ্ঞান সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীদাশগুপ্তের স্থান জগদানন্দ রায়ের পরেই নির্দিষ্ট হয়েছে। (পৃঃ ৩০)। একটি প্রথম শ্রেণীর বাংলা দৈনিক পত্রিকায়ও অনুরূপ অভিমত প্রকাশিত হয়েছিল—"সুন্দর কথায় গল্পের ভঙ্গীতে কঠিন জিনিষকে হৃদয়গ্রাহী করিয়া বলার ক্ষমতা গ্রন্থকারের অসাধারণ। ৺জগদানন্দ রায় মহাশয়ের পরে এইরূপ বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ দুর্লভ।" বস্তুতঃ লেখক তাঁর বিষয়কে জানেন, উপরন্তু তাঁর পাঠককেও জানেন। পাঠকের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাবার একটা দুর্লভ ক্ষমতা তাঁর আছে, আর এখানেই তাঁর বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্ব।

দুর্ভাগ্যক্রমে বই কখানা

আকাশ ও পৃথিবী, আজব কল, পরাভূত প্রকৃতি, চাঁদের দেশ এবং প্রাণ-এর কথা পুনঃমুদ্রণের অভাবে কিছুদিন বাজারে ছিল না। বহু পাঠক বইগুলি খোঁজ করেছেন, পাননি। বাংলা সাহিত্যের শিশু-বিজ্ঞান বিভাগের এই অতি মূল্যবান পুস্তকগুলির প্রকাশনার ভার তাই আমরা নিয়েছি। পাঁচখানা বই একত্রে সন্নিবেশিত করে এক মলাটের ভেতর **মহাবিশ্ব মহাপ্রাণ**' নামে বইগুলি প্রকাশিত হল। আশাকরি বইখানা পাঠকদের কাছে সমাদৃত ও অভিনন্দিত হবে।

এ একখানা চিরকালের বই।

—প্রকাশক

নিবেদন

বর্তমান বাংলা সাহিত্যের বাজারে যে প্রকাশক ছোটদের বিজ্ঞান-সাহিত্য প্রকাশ করবার জন্য অর্থ ব্যয় করতে সাহসী হন, অবশ্যই তিনি শ্লাঘনীয়। কারণ, তাঁর এই প্রচেষ্টার পেছনে অর্থ-প্রীতির চাইতে আদর্শ-প্রীতিই প্রকট হয়ে ওঠে। ব্যবসাক্ষেত্রে এটা খুব সুলভ নয়।

১৯৫৩ সনে 'আকাশ ও পৃথিবী' প্রথম প্রকাশিত হয়। এবারে তার দশম মুদ্রণ প্রকাশিত হ'ল। ১৯৫৬ সনে এর দ্বিতীয় সংস্করণ রাষ্ট্রীয় পুরস্কার পায়। প্রতিটি সংস্করণ বেরুবার আগে বইখানি পরিমার্জিত হয়েছে—এবারও হ'ল।

যাঁদের জন্য লেখা তাঁরা বইখানাকে ভালবেসেছেন, সেটাই আমার বড় পুরস্কার।

বইখানার অলংকরণ করেছেন আমার তিনপুত্র। ত্রিদিব কুমার দাশগুপ্ত সব্যসাচী দাশগুপ্ত ও মনসিজ দাশগুপ্ত

বারাসত
চব্বিশ পরগণা

দেবদাস দাশগুপ্ত

বৈশাখ
১৩৯৩

নতুন সংস্করণের ভূমিকা

অনেকদিন পরে **মহাবিশ্ব মহাপ্রাণ** সংস্করণ প্রকাশিত হল। আশা করব, এই নতুন সংস্করণটিও যাদের জন্য লেখা তাদের কাছে সমাদর পাবে।

উল্লেখ করা যেতে পারে; এই বইগুলি ভারতবর্ষের সকল ভাষায় রচিত সকল পুস্তকের মধ্যে অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতায় ১৯৬০-৬১ সনে দুইবার রাষ্ট্রীয় পুরস্কার পেয়ে সদ্য শিক্ষিতদের জন্য রচিত সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কারের বিরল সম্মান লাভ করেছে।

পুস্তকে আলোচিত একান্ত দুরূহ বিষয়টি বোধগম্য করতে যাঁরা আমাকে সাহায্য করেছেন তাঁরা হলেন আমার দুই ডাক্তার বন্ধু, বারাসতের ডাঃ দুর্গাদাস মুখোপাধ্যায় এম, বি এবং ডাঃ মোহিত কুমার চট্টোপাধ্যায়, এম, বি, বি, এস। তাঁদের কাছে আমার কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। তাঁদের সাহায্য না পেলে অবিজ্ঞানী আমার পক্ষে এ পুস্তক রচনা সম্ভব হত না।

আশা করব আমার দেশের আগত ও অনাগত ভবিষ্যৎদের কাছে বইখানা একখানা চিরদিনের বই হয়ে থাকবে।

বারাসত ২৪ পরগণা। দেবদাস দাসগুপ্ত

সূচী

আকাশ ও পৃথিবী

রাজা নয়, রাণী নয়, রাক্ষস-খোকক্স নয়, ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমী নয়, ভূতের নয়, বাঘের নয়, এ এক নতুন গল্প—শুনবে ?

এ হচ্ছে তাদের গল্প, যাদের আমরা উঠতে, বসতে, খেতে, শুতে দেখছি—আকাশ, সূর্য, চাঁদ, তারা, মাটি, বন-জঙ্গল, পোকামাকড়, পশু, পাখী, বানর, মানুষ,—এই সব। এদের জন্মকথা, এরা কোথায় ছিল, কি করে এলো, তারপরে কি করে কি হল, সে কথাই বলব তোমাদের। ভারী মজার গল্প—মন দিয়ে শুনো কিন্তু।

তা হলে সুরু করি ?

সে অনেক, অ-নে-ক বছর আগের কথা। এত আগের যে গুণেও শেষ করতে পারবেনা। তখন আকাশে না ছিল সূর্য, না ছিল চাঁদ, না ছিল তারা, আর নিচে না ছিল মাটি, না ছিল পশু-পাখী, গাছ—পালা,—আর আমরা তো ছিলাম-ই না। চারদিক ছিল শুধু অন্ধকার আর অন্ধকার। সেই ঘুটঘুটে কালো আকাশে ধোঁয়ার মত কতগুলো জিনিস ভেসে বেড়াত। ওগুলি কিন্তু মেঘ নয়। ওদের নাম নীহারিকা। এক একটা নীহারিকা আকাশের কতখানি জায়গা নিয়ে যে ঘুরে বেড়াত, তা হিসেব করে বলা কঠিন। পাতার পরে পাতা শুধু আঁক কষেই যাবে, হিসেব তবু মিলবে না। কাজেই ও

চেষ্টা বাদ দেয়া যাক।

রাতের-বেলা আকাশের দিকে তাকালে দেখবে তারায় তারায় আকাশটা ছেয়ে আছে,—কত তারা, কত রকমের, ছোট, বড়, মাঝারি,—যেন আকাশ জুড়ে এক রাশ যুঁই ফুল ফুটে আছে। আর ওরই মাঝে দু-একখানা সাদা কাপড় কে যেন বিছিয়ে দিয়েছে। ঐ যে সাদা জায়গাগুলি, ওর কতগুলি হল নীহারিকা,



কুমোরের চাকার মত বোঁ বোঁ করে ঘোরে

আর কতগুলি হল বহু-দূরের তারার জটলা। এরা এত দূরের যে আমরা এদের চেহারা দেখতে পাই না, চোখে পড়ে শুধু বহু-দূর-হতে-আসা এদের আলোর ঠিকরে-পড়া একটু আভাস মাত্র। এখন, এই যে নীহারিকা, এদের কতগুলি শুধু হালকা মেঘের মত ঘুরে বেড়ায়, আর কতগুলি কুমোরের চাকার মত বোঁ বোঁ করে ঘোরে। ঘোরে যে, সে কিন্তু বেতাল নয়, প্রত্যেকটাই ঘুরছে একটা কেন্দ্র, মানে, ঠিক মধ্য জায়গায়

একটা বিন্দুর চারদিকে। এই ভাবে এরা ঘুরছে, আর এ টানছে ওকে, আর ও টানছে একে,—যে যার নিজের দিকে। এই ঘোরাঘুরি আর টানাটানিতে হল কি, ওদের দেহের বাষ্প বা গ্যাস জায়গায় জায়গায় উঠল ঘন হয়ে। আর যতই হল ঘন, ততই তাদের মধ্যে তাপ সৃষ্টি হতে লাগল। আবার তাপ যতই বাড়তে লাগল—ওরা উঠল চক্ চক্ করে। মানে, ওদের দেহে আলোর সৃষ্টি হল,—আর সেইগুলিই হয়ে উঠল তারা। এমনি করে সেদিনের সেই ঘুট্‌ঘুটে আঁধার আকাশে একটি একটি করে তারার আলো জ্বলে উঠল,—আকাশের দেওয়ালী হল সুরু।

তারা এলো নীহারিকা থেকে। কিন্তু নীহারিকা? ওরা এলো কোথা থেকে? সে কথা আজও কেউ বলতে পারেনি। তবে একথা জেনো, মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধির কাছে চিরকাল তা অজানা থাকবে না,—সে খবর মানুষ একদিন জানবেই জানবে। নীহারিকা তো নিজের দেহ বিলিয়ে দিয়ে দিনের পর দিন তারার জন্ম দিয়ে যাচ্ছে,—তারায় তারায় আকাশটা ঝলমল করে উঠছে। এমনি করে একদিন তো নীহারিকা যাবে সব ফুরিয়ে। আর ওদের থেকে ফুটে বেরুল যে তারা, ওরাও তো জ্বলবে না চিরদিন। কারণ, আগুন যেমন জ্বলে জ্বলে নিভে যায়, ওরাও তেমনি জলে জলে নিভে যাবে একদিন। তবে আগুন জ্বলে পুড়ে রেখে যায় শুধু ছাই, আর তারাগুলি নিভে যায় যখন, তখন থেকে যায় শুধু একটা কালো—কঠিন

পিণ্ড। তখন কি হবে? নীহারিকাও নেই, তারাও নেই। আকাশ কি আবার প্রথম দিনের মত অন্ধকারে ছেয়ে যাবে? তারার দেওয়ালী কি আর জ্বলবে না? ভয় পেয়ো না। সৃষ্টির যিনি মালিক, তিনি সব ঠিক করে রেখেছেন। আলো নিভবে না, বিশ্বসংসার মুছে যাবে না। সব ঠিক থাকবে। কি ভাবে— শোনো।

তোমরা জেনেছ নীহারিকাগুলি কি ভাবে এক একটা কেন্দ্র নিয়ে ঘোরে। তারাগুলিও জন্মের প্রথম দিন থেকেই ঘুরতে সুরু করে ওই একই নিয়মে। তারপরে নিভে ঠাণ্ডা হয়ে যাবার পরেও কিন্তু তাদের ঘরপাক খাওয়া থামে না। শুধু ঘোরে আর ঘোরে। এই ভাবে পাক খেতে খেতে দুটো মরা তারা, বা একটা মরা ও একটা জ্যান্ত তারা কখনও কখনও খুব কাছাকাছি এসে মুখোমুখি হয়ে দাঁড়ায়, আর এ টানে ওকে, ও টানে একে। সে এক ভীষণ টান! যে তারাটা কাহিল, মানে যার জোর কম, সে বেচারা হুড়মুড় করে এসে পড়ে অন্যটার ঘাড়ে, —আর তখনই হয় একটা ভিষণ ব্যাপার। এই টানাটানি আর ঠোকাঠুকির চোটে এমন তাপের সৃষ্টি হয় যে, মরা তারাটা গলে যায়। আর গলে গিয়েই হয়ে যায় গ্যাস। কিন্তু তাতেও কি রক্ষা আছে? সেই ঘোরণ-মন্ত্র চেপে বসেছে তার ঘাড়ে। আবার সেই বিরামহীন ঘরপাক। আবার সেই নীহারিকা। এই ভাবেই চলেছে মহাকাশে সৃষ্টির মহাখেলা। এ যে কখনও থামবে, কখনও ফুরিয়ে যাবে তা ভাবাও যায় না।

দুই

তারার কথা

এক-কথায় যাদের তারা বলা হয়—তারা কিন্তু সবাই 'তারা' নয়,—এ কথাটা খেয়াল রেখ। 'তারা' যাদের বলব, তাদের আসল নাম নক্ষত্র। তাই, আকাশে যারা জ্বলছে, তাদের সবগুলিই কিন্তু নক্ষত্র নয়। তার কতগুলি নক্ষত্র, আর কতগুলি হল গ্রহ। একটু নজর দিয়ে আকাশের দিকে তাকালেই দেখবে, কতগুলি তারা মিটমিট করছে, আর কতগুলি করছেনা। যেগুলি মিট্ মিট্ করছে, সেগুলি হল নক্ষত্র, আর বাকিগুলি গ্রহ। গ্রহদের কথা পরে বলব। এখন নক্ষত্রের কথা শোন।

আকাশে কত নক্ষত্র আছে বলতে পার? পারবে না। কেউ পারে না। খুব পরিষ্কার রাতে ইংলণ্ডের বিজ্ঞানীরা খালি চোখে মাত্র পঁচিশ হাজার নক্ষত্র গুণতে পেরেছিলেন। কিন্তু মানুষের বুদ্ধির সীমা নেই। বুদ্ধির সাথে চলেছে তার ক্লান্তিহীন চেষ্টা। অবশেষে ইটালী দেশের বিজ্ঞানী, গ্যালিলিও আবিষ্কার করলেন এক যন্ত্র আজ থেকে প্রায় চারশ' বছর আগে, ১৬০৯ খৃষ্টাব্দে। সেই যন্ত্র দিয়ে বহু-দূরের জিনিস খুব বড় করে দেখা যায়। তার নাম দেয়া হল দূরবীন বা দূরবীক্ষণ যন্ত্র, ইংরেজীতে টেলিস্কোপ। এই দূরবীন বানানোর অপরাধে রাজার আইনে গ্যালিলিওর জেল হয়। সাতজন পুরোহিত ছিলেন বিচারক। কেন,

বলি শোনো। তখনকার ইউরোপের ধারণা ছিল পৃথিবী স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে, আর সূর্য ইত্যাদি সবাই ঘুরছে তার চারদিকে। এ-কথা যাঁরা মানতেন না, দেশের আইনে তাঁরা মহাপাপী। গ্যালিলিও দূরবীন দিয়ে প্রমাণ করলেন,—তাঁদের বিশ্বাস মিথ্যা। সত্য যা, তা ঠিক উল্‌টো, মানে, সূর্য ও প্রতিটি নক্ষত্র স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে, আর ঘুরছে যারা, তারা হল গ্রহ-উপগ্রহের দল,—তার মধ্যে পৃথিবী-ও আছে। হলে কি হবে ? অজ্ঞানের কাছে বিজ্ঞানকে হার মানতে হল সেদিন।

অথচ দেখ, এরও বহু আগে মস্ত এক পণ্ডিত জন্মেছিলেন পোল্যাণ্ড দেশে, ১৪৭৩ খৃষ্টাব্দে। মহাপণ্ডিত তিনি। নাম কোপার্নিকাস। অনেক আঁক কষে, অনেক হিসেব করে, প্রায় চল্লিশ বছর পরিশ্রমের পরে তিনিই সকলের আগে ইউরোপকে বুঝাতে চেয়েছিলেন ঐ একই কথা, পৃথিবীই ঘোরে, সূর্য নয়। হৈ-চৈ পড়ে গেল ইউরোপে। বলে কি! পাগল না ক্ষ্যাপা ? শাস্ত্র বলে সূর্য ঘোরে, আর পাষণ্ড বলে কিনা পৃথিবী! চরম অপমান জুটেছিল সেদিনও তাঁর ভাগ্যে। দুঃখে অপমানে সেই জ্ঞানের পূজারী সেদিন পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছিলেন। অ-বিদ্যা সেদিনও জয়ী হয়ে ছিল।

জিওরদানো ব্রুণো নামে এক পণ্ডিত পুরোহিত সে সময়ে ইটালীতে বাস করতেন। সত্যের লাঞ্ছনা তাঁর সহ্য হল না। সমস্ত ভয় তুচ্ছ করে বীরের মত তিনি এগিয়ে এলেন সত্য-সাধক কোপার্নিকাসের সাহায্যে। কোপার্নিকাসের দেয়া যুক্তি তর্কের সাথে আরো যুক্তি-

তর্ক জুড়ে তিনি লোককে বুঝাবার চেষ্টা করলেন, বৃথাই তারা একজন মহাপণ্ডিতকে অপমান করছে। তিনি আরও বল্‌লেন, শুধু পৃথিবী যে সূর্যের চারদিকে ঘোরে তাই নয়, পৃথিবীর উত্তর দক্ষিণ কিছুটা চাপাও বটে,—কমলা লেবুর মত।

আর যায় কোথা? অ-জ্ঞানের পুরোহিতেরা হত্যা করল জ্ঞানের পুরোহিতকে ধর্মের নামে। ব্রুণোকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারা হল।

দুঃখ পেয়োনা। চিরকালই অ-বিদ্যার হাতে বিদ্যার লাঞ্ছনা এমনি ভাবেই ঘটেছে। কিন্তু সত্য অনির্বাণ। তার আলো কেউ নিভোতে পারে না।

এরও আগে, অনেক, অনেক আগে। তখনও ইউরোপে জ্ঞানের আলো জ্বলেনি। আমাদের দেশ, ভারতবর্ষ তখন জ্ঞান গরিমায় বহু উঁচুতে। তেমনি সময় আর্যভট্ট নামে এক মহাজ্ঞানী জন্মেছিলেন এদেশে। তিনি বহু গবেষণা করে দেশকে জানালেন সূর্য নয়, ঘোরে পৃথিবী, ঘোরে গ্রহরা আর উপগ্রহরা। নক্ষত্রেরা সব স্থির। জ্ঞানের এহেন পূজারী দেশে থাকতেও অবিশ্বাসের হাসি হেসে ছিল তখনকার দেশ। কত যুক্তি-তর্ক উপস্থিত করলেন অবিশ্বাসীরা, কত প্রশ্ন। তাই যদি হবে, তবে সকালে বাসা ছেড়ে পাখীরা বেরিয়ে সন্ধ্যায় বাসা খুঁজে পায় কি করে? তাতো হারিয়ে যাওয়ার কথা। তাই যদি হবে, তবে আমরা সব ছিট্‌কে পড়ে যাচ্ছি না কেন? কেন তবে দেখি সূর্য পূবে উঠে পশ্চিমে অস্ত যায়? আরো কতো কি।

সব যুক্তি মেটালেন আর্যভট্ট, সব তর্ক খণ্ডন করলেন তিনি। কিন্তু শোনে কে? নিদারুণ অপমানিত হয়েছিলেন তিনিও সেইদিন।

তার পরে একদিন দেশকে স্বীকার করতে হয়েছিল তাঁর আবিষ্কারকে।

কিন্তু মজা হল, অত্যাচার কর, আর অপমানই কর, সত্যকে কখনো চেপে রাখা যায় না। আসন সে প্রতিষ্ঠা করবেই একদিন আপন শক্তিতে। মৃত্যুভয়ও তাকে রোধ করতে পারে না। দেরী হতে পারে, কিন্তু তাকে অস্বীকার করবার যো নেই। যতই বড় হবে, ততই দেখবে ইতিহাসের পাতায় পাতায় এর স্বাক্ষর। সর্বকালে, সর্বদেশে, আলোর জন্য গুটিকতক মানুষের কী আকুল কাকুতি, আর তার কণ্ঠ রোধ করবার জন্য অন্ধকারের কি নিষ্ঠুর উৎপীড়ন। সেই কাকুতিইতো একদিন ভাষা পেয়েছিল ভারতের ঋষিদের প্রার্থনায়—

অসতোমা সদগময়
তমসো মা জ্যোতির্গময়
অ-সত্য হতে সত্যের পথে,
অন্ধকার হতে জ্যোতির পথে
আমাকে নিয়ে চলো।

আর তাইনা, জ্ঞানের যে দীপটি ভারতের আর্যভট্ট জ্বেলেছিলেন একদিন, অনির্বাণ তার শিখা কেমন করে, কোথা দিয়ে দেশকালের সীমানা ডিঙিয়ে, পোল্যাণ্ডের কোপার্নিকাসের হাত থেকে

ইটালীর ব্রুনো, ব্রুনো থেকে গ্যালিলিওর হাতে জ্বলে উঠল কি ভাবে। এতকাল যা প্রমাণ হত হিসেব পত্রে আর বই-এর পাতায়, এবার প্রমাণ হল তা চোখের দেখায়।

অসীম আকাশ সীমা হারিয়ে ধরা দিল গ্যালিলিওর দূরবীনের কাঁচে। আলোর হল জয়।

বিজ্ঞান চল্‌ল জোর পায়ে এগিয়ে।

এই দূরবীন আবিষ্কারের পর থেকে আকাশ সম্বন্ধে আমরা এত খবর জেনেছি যা ভাবতেও অবাক লাগে। গ্যালিলিওর পরে মানুষ আরও অনেক শক্তিশালি দূরবীন আবিষ্কার করেছে। সেই দূরবীনের ভেতর দিয়ে সে আজ পনের কোটি নক্ষত্র গুণতে পেরেছে। তবে ভেব না এই শেষ, আকাশে এর বেশী আর নক্ষত্র নেই। আছে,—আরও বহু, বহু কোটি আছে,—যা নাকি আজও দূরবীনে ধরা পড়েনি। হয়তো পড়বে। হয়তো কেন? নিশ্চয়ই পড়বে। মানুষের চেষ্টার কি শেষ আছে? তার জয়যাত্রা তো এগিয়েই চলেছে।

এই যে অগুণতি নক্ষত্রের দল, এরা মহাশূন্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে,—প্রত্যেকে প্রত্যেকের বাঁধা পথে, যে পথের বাইরে যাবার সাধ্য নেই তাদের। জ্বলন্ত আগুনের গোলা—দাউ দাউ করে জ্বলছে আর ছুটছে,—ভাবা যায় না সে কথা, মাথা বোঁ বোঁ করে। এদের আকার যে কত বড়, কী ভীষণ, তাও কি ভাবা যায়? শুধু এইটুকু জেনে রেখো, এদের মধ্যে বেশ ছোট আর

সবচেয়ে আমাদের কাছে যে,—নাম তার সূর্য। আর তারই দাপটে আমরা অস্থির। কত ছোট আর কত কাছে শুনবে? ১১০টা পৃথিবী পাশাপাশি এক সরল-রেখায় রাখলে সূর্যের এমাথা থেকে ওমাথায় পৌঁছন যেতে পারে। আর তার ওজন? পৃথিবীর চেয়ে ৩ লক্ষ ৪০ হাজার গুণ বেশী। আর তিনিই হলেন নক্ষত্রদের মধ্যে শিশু! বোঝ এবার। এর চাইতে কত লক্ষ গুণ বড় নক্ষত্র যে আছে, তা শুনলে হিম্‌সিম্ খেয়ে যাবে। তবুও একটু বলি শোন। সূর্যের ব্যাস, মানে ওর গোল চাকতিটার ঠিক মাঝখান দিয়ে একটা রেখা টেনে দুদিকটা মিলিয়ে দিলে যা হয়, তার মাপ হল ৮ লক্ষ ৬৪ হাজার মাইল। আর 'এ্যান্টবেস' নামে একটা নক্ষত্র আছে, তার ব্যাস হল ৩৯ কোটি মাইল। তারপরে সূর্য আমাদের কত কাছে শুনবে? ন' কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল মাত্র। তার মানে, কোন গাড়ী চেপে ঘণ্টায় ত্রিশ মাইল বেগে যদি তাকে সূর্যের দিকে চালিয়ে দাও আর তিনশ-পঞ্চাশ বছর যদি তোমার পরমায়ু থাকে, তবে হয়তো সূর্যে পৌঁছতে পারবে। কিন্তু কথা হল, সাড়ে-তিনশ' বছর বেঁচে থাকলেও পৌঁছতে পারবে তো? ন'কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল দূরে থেকেও যার সামান্য একটু তেজের দাপটে আমরা অস্থির, তার কাছে আবার পৌঁছন! কাজেই প্রাণ বাঁচাতে চাও তো, ও চেষ্টা বাদ দাও।

অল্প কথায় এই হল নক্ষত্রদের ছোট ভাইয়ের খবর। তারপরে যদি তার ন'দা, সেজদা, মেজদা,

বড়দা'দের খবর শোন তবে তো তাজ্জব বনে যাবে। তারা যে আমাদের থেকে কত দূরে, তা তুমি অঙ্কে যত বড় পণ্ডিতই হও,—হিসেব করে কিনারাই পাবে না। তাই মানুষ আকাশের হিসেব-পত্রের ব্যাপারে এক নতুন নিয়ম আবিষ্কার করেছে। হিসেব করে দেখা গেছে যে আলো চলে সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল বেগে। একটু থেমে বুঝে নাও। ষাট সেকেণ্ডে হল এক মিনিট, আর ষাট মিনিটে এক ঘণ্টা। ঘড়িটা যে টিক্‌টিক্ শব্দ করছে, তার দুটি শব্দের মাঝখানের সময়টুকুকে বলে এক সেকেণ্ড। আজকাল সবচেয়ে বেগে যে ছোটে, সে হল এক রকম উড়ো জাহাজ। 'জেট প্লেন' বলে তাকে। তার সাধারণ বেগ ঘণ্টায় পাঁচশ মাইলের উপরে। আর সেই তুলনায় আলো ছোটে সেকেণ্ডে, অর্থাৎ, তোমার 'এক' এই কথাটি বলতে যতটুকু সময় লাগে, তার মধ্যে একলক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল! আবার, তুমি বলছ, আমি শুনছি। তোমার বলা আর আমার শোনার মধ্যে যে কোন ফাঁক থাকতে পারে, এ আমরা বিশ্বাসই করিনে। যেন তোমার মুখ দিয়ে কথা বেরুবার সাথে সাথেই আমার কান তা লুফে নিল। কিন্তু সত্যই কি তাই? শব্দ চলারও একটা গতি আছে, আলোর যেমন। শব্দ চলে সেকেণ্ডে এগারশ' কুড়ি ফুট বেগে। তিন ফুটে এক গজ, আর সতেরশ' ষাট গজে হল এক মাইল। সেই হিসাবে শব্দের গতি দাঁড়ায় সেকেণ্ডে সিকি মাইলের কিছু বেশী মাত্র। এবার

বোঝো! কোথায় সেকেণ্ডে একলক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল, আর কোথায় সেকেণ্ডে সিকি মাইলের কাছা-কাছি! এক ঝলক্ বিদ্যুত আকাশটাকে চাবুক মেরে চলে গেল। সাথে সাথে চড়্ চড়্ চড়াৎ। আকাশটা যেন ফেটে পড়ল। এক ছুটে ঘরে পালালে। বাজ পড়ল। ভাবলে, বড় বাঁচা বেঁচে গেলে! কিন্তু সত্যই যদি বাজটা পড়ত তোমার গায়ে বা কাছে-পিঠে, ছুটে পালিয়েও কি বাঁচতে পারতে? কক্ষণো না। ওই শব্দ হওয়ার বহু, বহু-আগেই বাজটা পড়ে গেছে, ভীষণ বিদ্যুত প্রবাহ সেকেণ্ডে সিকি-মাইল-ছোটা খোঁড়া-ঘোড়াটাকে ঢের পেছনে ফেলে। কাজেই বাজ লেগে যে মরল, বাজের শব্দ শোনার ভাগ্য তার আর হল না!

তা হলে বুঝতে পারছ, এক আলো সেকেণ্ড যাকে বলব, তার মানে হল এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল। একে আবার ষাট দিয়ে গুণ করলে হল এক আলো মিনিট, তাকে আবার ষাট দিয়ে গুণ করলে হল এক আলো ঘণ্টা। কষে দেখ, শূন্যয় শূন্যয় খাতা ভরে উঠবে। এই হল আকাশের হিসেবপত্তরের কানুন। এখন, এই বেগে ছুটে পৃথিবীতে সূর্যের আলো পেঁছুতে লাগে প্রায় সাড়ে-আট মিনিট। এর পরের নক্ষত্র যে, তার কাছ থেকে আলো আসতে লাগে প্রায় চার বছর। নাম তার আল্‌ফা সেণ্টাউরি [Alpha Centauri]। বড় বিদ্‌ঘুটে নাম। আরও দূরের যারা, তাদের আলো পেঁছয় বহু-লক্ষ বছর পরে। ব্যাপারটা তাহলে এই

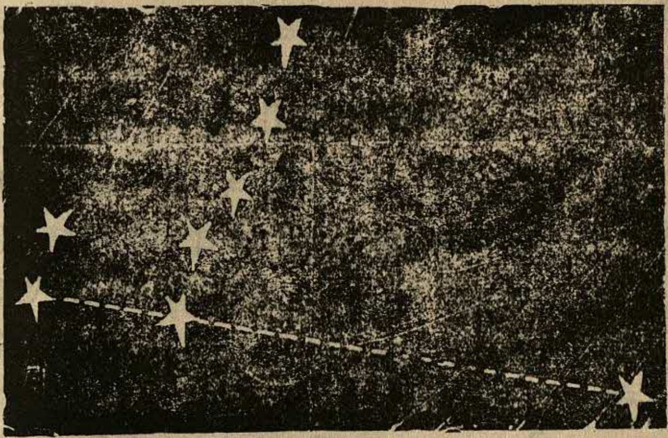
দাঁড়াল যে, যে নক্ষত্রকে তুমি আজ দেখছ, হয়তো সে আকাশে আর নেই-ই,—জ্বলে পুড়ে নিভে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে একলক্ষ বছর আগে। সেই লক্ষ বছর আগে যে আলো রওনা হয়েছিল পৃথিবীতে, তাকেই দেখতে পেলে আজ। সম্রাট অশোকের জন্মদিনে হয়ত যে তারাটা জন্মেছিল আকাশে, এই মাত্র পৃথিবীর লোক দেখতে পেল তাকে। ব্যাপার বোঝ!

আকাশের গায়ে নক্ষত্রদের জটলার কথা আগে বলেছি, যাদের বলে ছায়াপথ। নীল আকাশে সাদা কাপড়ের আঁচলবিছানো যেন। ওরা হল নক্ষত্রপুঞ্জ —বহু-কোটি নক্ষত্র বহুদূরে জটলা করে আছে কাছা-কাছি। বহু দূর থেকে তাদের চেহারা দেখতে পাইনে, দেখি শুধু তাদের আলোর আভা। আমাদের খুব কাছে যে নক্ষত্রপুঞ্জ, নাম তার এ্যাণ্ড্রোমিডা [Andromeda]। নামটা শক্ত হলেও মনে রেখ। তার আলো পেঁছিয় পৃথিবীতে ন' লক্ষ বৎসরে। খুব কাছেই বটে!

তারপর এদের চেহারা। সে নানা রকমের। কেউ বা সূর্যের চাইতে শতগুণ বড়, কেউ বা লক্ষগুণ, কেউ বা আর-ও। তবে এদের এত ছোট দেখি কেন? দূরের জিনিস ছোট দেখায়, কাছের জিনিস বড়, এ তো সোজা কথা। এরা কেউ সূর্যের চাইতে দশ হাজার গুণ বেশী আলো দেয়, কেউ দেয় একশো ভাগ কম। কারুর দেহের গ্যাস খুব ঘন, কারুর বা পাতলা। কেউ চলে একা একা, কেউ বা জোড়

বেঁধে। এই জোড়-বাঁধার দল কিন্তু মোট নক্ষত্রদের তিন ভাগের এক ভাগ। এর মধ্যে জোর যার কম, তাকেই ঘুরতে হয় অপরটার চারদিকে,—বেচারা! আবার, দুটোই যদি হয় সমান জোয়ান, তখন তারা নেয় একটা রফা করে। দু'য়ের মাঝামাঝি একটা বিন্দু ঠিক করে দুটোই ঘোরে তার চারদিকে। এই জোড়া-নক্ষত্র জন্মে কি করে জান? নক্ষত্র যতই ঠাণ্ডা হতে থাকে, ততই সে ঘন হয়,—আর বেগ যায় বেড়ে। তারপরে একদিন ভেঙ্গে দুখান হয়ে জোড় বেঁধে চলতে থাকে।

উত্তর আকাশে নীচের দিকে দপ্ দপ্ করে একটা নক্ষত্র জ্বলছে দেখবে। ও আমাদের বড্ড আপন। নাম ওর ধ্রুবতারা। প্রায় একই জায়গায় দাঁড়িয়ে ও জন্মের প্রথম দিন থেকে আমাদের দিকে চেয়ে আছে। সাতচল্লিশ আলো-বছর দূর থেকে ও যেন অনাদি-কাল ধরে পৃথিবীতে ফেলে-আসা ওর আপনজনকে খুঁজছে। এই একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে বলে ও আমাদের বড় কাজে লাগে। আঁধার রাতে ধূ-ধূ-করা মাঠের মাঝে অথবা সমুদ্রের বুকে তুমি দিশেহারা হয়ে পড়েছ। কোন্‌টা কোন দিক, কোন্ দিকেই বা তোমার ঘর, হারিয়ে গেছে সব। এমন সময় যদি খুঁজে বার করতে পার ধ্রুবকে,—পেয়ে যাবে উত্তর দিক,—পেয়ে যাবে তোমার পথের নিশানা। এরই গায়ে গায়ে আর সাতটি নক্ষত্র আছে। তাদের বলা হয় সপ্তর্ষিমণ্ডল। এদের আলো ধ্রুবের চাইতে



এইভাবেও চিনতে পার ধ্রুবকে

একটু বেশী উজ্জ্বল। চৈত্র-বৈশাখ মাসে আমাদের দেশে এরা সন্ধ্যার পরই উত্তর আকাশে দেখা দেয়। জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়ে একটু পশ্চিমে হেলতে হেলতে অগ্রহায়ণ মাসে একেবারে নীচে নেমে যায়,—সন্ধ্যাবেলা আর দেখা যায় না। আবার পৌষ থেকে উত্তর-পুব কোণে দেখা দেয়। এই সপ্তর্ষির উপর দিকে যে দুটো নক্ষত্র রয়েছে, একটা রেখা টেনে তাদের যোগ করে দাও। তারপর সেই রেখাটা সোজা উপর দিকে টেনে নিয়ে যাও। দেখবে তোমার রেখা ধ্রুব নক্ষত্রের উপর দিয়ে চলে গেছে।

এই ভাবেও চিনতে পার ধ্রুবকে।

তিন

গ্রহের কথা

আগেই জেনেছ, রাতের আকাশে যারা মিট্‌মিট্ করে না,—লক্ষ্মীছেলেটির মত চুপ্‌টি করে তাকিয়ে থাকে, তারাই হল গ্রহ। গ্রহ ও নক্ষত্রদের মধ্যে তফাৎ অনেক। সে খবরগুলো না জানলে রাতের আকাশে সবগুলিকেই একরকম বলে মনে হবে।

নক্ষত্র হল পিতা, গ্রহ পুত্র। ঠাকুর্দা হল নীহারিকা। মানে, নীহারিকা থেকে জন্ম নক্ষত্রের, আবার নক্ষত্র থেকে গ্রহের।

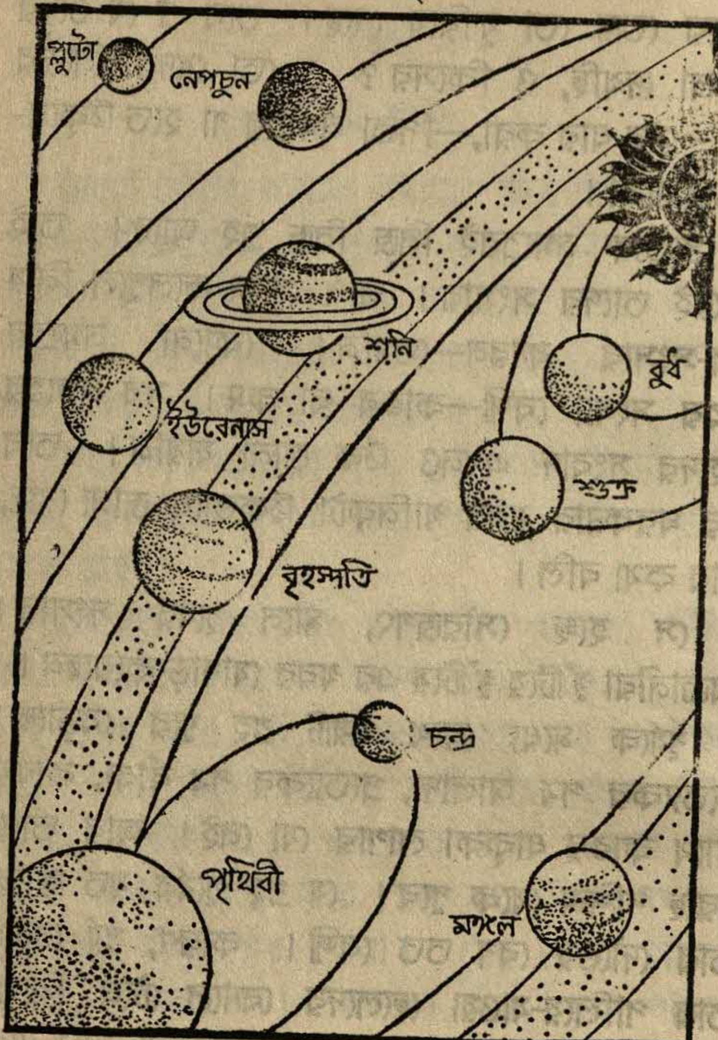
ছোটবেলা নক্ষত্রগুলি যখন খুব হালকা গ্যাসে ভর্তি ছিল, তখন ঘুরপাক খেতে খেতে ওদের গা' থেকে কিছু কিছু যায় খসে, যেমন কাদা-মাখা মোটরের চাকা থেকে কাদা ছোটে। ছুটে গিয়ে তারা কিন্তু পালাতে পারল না। নক্ষত্রদের টানে খানিক দূরে গিয়েই থামতে হল, আর সুরু হল পিতা-নক্ষত্রের চারদিকে বাঁধা পথে ঘোরা। সেই ঘোরা আজও থামেনি, থামবেও না। নক্ষত্রের কাছ থেকে পাওয়া যেটুকু গ্যাসের পুঁজি নিয়ে গ্রহেরা জন্ম নিয়েছিল, সে তো খুব বেশী নয়। অল্প দিনের মধ্যে সেই গ্যাসের পুঁজি জ্বলে পুড়ে শেষ হয়ে গেল,—আর গ্যাস-পিণ্ডটা ঠাণ্ডা হতে হতে শক্ত হয়ে গেল। নানা ধাতুর তৈরি ঠাণ্ডা ঘুরন্ত সেই পিণ্ডগুলিই পরে হয়ে দাঁড়াল গ্রহ। এদের নিজেদের কোন আলো নেই,—কারণ এদের

দেহের তেজ তো ফুরিয়ে গেছে। তবে ঐ যে ওদের আলো দেখছি, ও কিসের? ও তো ওদের নিজের নয়,—সব ধার করা,—পিতা নক্ষত্রের গা হতে ঠিক্‌রে-পড়া আলো।

প্রত্যেক নক্ষত্রেরই নিজ নিজ গ্রহ আছে। তাই নিয়েই তাদের সংসার। বাপ যেমন ছেলেপুলে নিয়ে ঘর-সংসার করেন—তেমনি। কোনো নক্ষত্রের গ্রহের সংখ্যা বেশী—কারুর বা কম। সব নক্ষত্রের গ্রহদের সংবাদ এখনও ঠিক জানা যায়নি। তবে যার ঘরকন্নার খবর খানিকটা ঠিকভাবে জানা গেছে, তার কথা বলি।

সে হচ্ছে সৌরজগৎ, মানে সূর্যের সংসার। বিজ্ঞানীরা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে এর খবর যোগাড় করেছেন।

সূর্যকে মধ্যে রেখে নয়টি গ্রহ ঘুরে বেড়াচ্ছে। প্রত্যেকের পথ আলাদা, প্রত্যেকের পথ বাঁধা, কারুর সাথে কারুর ধাক্কা লাগার যো নেই। আর তারা ঘুরছে পশ্চিম থেকে পুবে। যে গ্রহ সূর্যের যত কাছে, তার দৌড়ের বেগ তত বেশী। কারণ, সূর্য চাইছে তার পালিয়ে-যাওয়া ছেলেদের কোলে টেনে নিতে, আর ছেলেরা পিতার ঐ রুদ্র-মূর্তি দেখে ভয়ে দে-দৌড়! তাই, কেবলি চলেছে এই ধরবার আর পালাবার খেলা। এদের মধ্যে যার অবস্থা সবচেয়ে বেশী কাহিল, সে হল বুধ। সে সূর্যের সব-কাছে। ছুটে পালাতে পারেনি বেশী দূর। আটকে পড়েছে সূর্যের টানে। টানের চোটে একবার মুখও ফেরাতে



সূর্যের সংসার

পারেনা অন্য গ্রহদের মত। তাই ওর একটা পিঠ চিরদিন সূর্যের দিকে ফেরানো থাকে। পুড়ে ছাই হয়ে গেল সেদিকটা। অপর দিকটায় চির-অন্ধকার। সূর্যের একেবারে কাছে বলেই ওর দৌড়ের পাল্লাটাও

সব চাইতে বেশী। সূর্য থেকে ওর দূরত্ব হল মাত্র সাড়ে তিনকোটি মাইল, আর সূর্যের চারদিকে ঘুরে আসে অষ্টাশি দিনে।

বুধের পরে যে, নাম তার শুক্র। গ্রহদের মধ্যে শুক্রই হল সব চাইতে উজ্জ্বল। বছরের কিছুদিন একে দেখি পশ্চিম আকাশে, তখন বলি সাঁঝের তারা। আবার কিছু দিন দেখি ভোরের বেলা, পূব আকাশে। তখন ডাকি শুক-তারা বলে। শুক্র দু'শো পঁচিশ দিনে সূর্যের চারদিকে ঘুরে আসে। সূর্য থেকে এর দূরত্ব হল ছয় কোটি সাত লক্ষ মাইল। শুক্রের চার-দিকে মেঘ ঘিরে আছে, তাই এর সব খবর এতকাল দূরবীনে ধরা পড়েনি। কিছুকাল ধরে আমেরিকা ও সোভিয়েট রাশিয়ার মানুষ শুক্র গ্রহে যন্ত্রচালিত মহাকাশযান পাঠিয়েছে ওখানকার অবস্থা পরীক্ষা করবার জন্য। সোভিয়েট যানগুলোর নাম 'ভেনাস' আর আমেরিকার যানগুলোর নাম 'মেরিণার'। নানা-রকম খবর তারা পাঠিয়েছে পৃথিবীতে ওখান থেকে। খবরগুলি থেকে আজ পর্যন্ত মোটামুটি এইটুকুই বোঝা গেছে যে শুক্রের বায়ুর চাপ পৃথিবী থেকে ১৮গুণ বেশী আর ওখানকার বায়ুমণ্ডলে শতকরা ৯০ ভাগই কার্বন-ডাই-অকসাইড। কাজেই অত তাপে ওখানে মানুষ কেন, কোন জীবনই সৃষ্টি হতে পারে না। অথচ ওখানে প্রাণী বলতে আদৌ যে কিছুই নেই সেকথাও বিজ্ঞানীরা এখনও জোর দিয়ে বলতে পারছেন না। কাজেই শুক্র সম্বন্ধে শেষ কথা জানতে হলে এখনও আমাদের অনেক-

দিন দেরী করতে হবে।

এরপরেই আমাদের পৃথিবী। চলেছে তার বাঁধা পথে। খবরটা শুনে হয়তো একটু অবাক হবে। কারণ, পৃথিবীও যে একটা গ্রহ, সে কথা এতক্ষণ বলা হয়নি। পৃথিবীর কথা পরে বলব, এখন মঙ্গলের কথা শোনো।

মঙ্গল, পৃথিবীর পরেই এর পথ। কেমন যেন লালচে এর রং, কেমন যেন পুড়ে যাওয়া, ঝলসে যাওয়া, কেমন যেন অলক্ষুণে ভাব; নামটা যেন ওর মিথ্যে! এ হল পৃথিবীর সব চাইতে কাছের গ্রহ। তাই খালি চোখে একে বেশ পরিষ্কার দেখা যায়।

পৃথিবীর প্রায় নয় ভাগের এক ভাগ এর আয়তন, আর সূর্যকে ঘুরে আসে ছয়শো সাতাশি দিনে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে মঙ্গলের আবহাওয়া বড্ড শুক্‌নো। ওখানে জল বাতাস অবশ্য আছে, তবে তাতে আমাদের পৃথিবীর প্রাণীদের মত প্রাণী বেঁচে থাকতে পারে না। তার মানে, মঙ্গল নাকি তার দেহের তাপ প্রায়-সব খুইয়ে শেষ করে এনেছে। অক্সিজেন গ্যাসে ওর দেহের পাথরগুলি সব মরচে ধরে গেছে। তাই নাকি ওর চেহারা এমন লাল্‌চে।

মঙ্গলে প্রাণী, বিশেষ করে মানুষ আছে কিনা তাই নিয়ে তর্ক চলেছে,—নিষ্পত্তি এখনও হয়নি। একদিন দূরবীনে মঙ্গলের গায়ে কতগুলি সোজা দাগ ধরা পড়েছিল! একদল বিজ্ঞানীরা বললেন, প্রমাণ হল, মঙ্গলে মানুষ আছে—ঐ দাগগুলি হল মঙ্গলবাসীদের হাতে-কাটা খাল। কারণ, মানুষের কাটা না হ'লে খাল

কি কখনও অমন সোজা হয়? আজ কিন্তু মানুষকে আর দূরবীনের উপর ভরসা করে থাকতে হচ্ছেনা। আমেরিকা ও সোভিয়েট দেশের মানুষ ওখানেও পাঠিয়েছে বৈজ্ঞানীক মহাকাশযান।

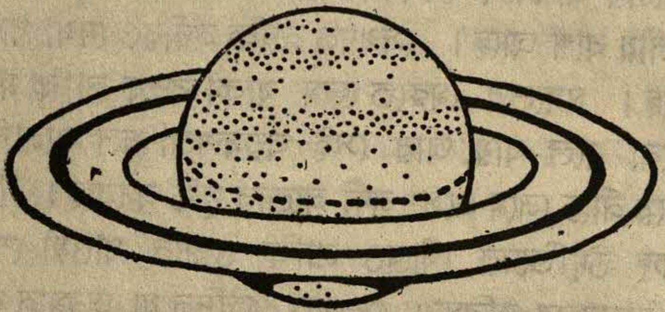
এই মহাকাশযানগুলি (মেরিণার ও মারস্) ওখান থেকে অনেক খবর ও ছবি পাঠিয়েছে পৃথিবীতে। গবেষণাগারে সেগুলো পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে মঙ্গলের আকাশে ঘন মেঘ আছে আর সেই মেঘের মধ্যে জলীয় বাষ্প আছে। সেখানে নাকি নদীরও দেখা পাওয়া গেছে। মঙ্গলের মেরুতে জমে থাকা বরফ নাকি মাঝে মাঝে গলে যায়, আর সেই বরফগলা জল নানাদিক দিয়ে নীচে নেমে এসে নদী-নালার সৃষ্টি করেছে। কিছু কিছু উদ্ভিদের খোঁজও নাকি ওখানে পাওয়া গেছে। অক্সিজেনের পরিমাণ সেখানে এতদিন যা অনুমান করা গিয়েছিল তার চাইতে বেশী থাকা সম্ভব বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু ওখানে মানুষ বা অন্য প্রাণী আছে বা নেই তা এখনও কেউ ঠিক করে বলতে পারছেনা।

যাহোক, আমরা বিজ্ঞানী নই, সোজা মানুষ, বুঝি কম। তাই পণ্ডিতের লড়াই পণ্ডিতের কাছে রেখে, চলো পালাই বৃহস্পতির কাছে।

গ্রহরাজ বৃহস্পতি। গ্রহদের মধ্যে সব চাইতে বড়ো, তাই এর 'রাজ' আখ্যা। চলার পথ মঙ্গলের পরেই। তবে এই দুই পথের মাঝে একটা বড় ফাঁক আছে। বিজ্ঞানীরা মনে করেন এর ভিতরেই হল উল্কা আর গ্রহকণিকার পথ। তারা-ও ঘুরে বেড়ায় সূর্যের

চারদিকে।

বৃহস্পতি সূর্য হতে আটচল্লিশ কোটি বিশ লক্ষ মাইল দূরে। মানে, পৃথিবী সূর্য হতে যত দূরে, এ তার পাঁচ গুণ বেশী। কাজেই পৃথিবী সূর্যের যে তাপ পায়, এ পায় তার সাতাশ ভাগের এক ভাগ মাত্র। সুতরাং গ্রহটি খুব ঠাণ্ডা। সূর্য ঘুরে আসতে লাগে এর বারো বৎসর। এর গতি সেকেণ্ডে আট মাইল,—আর পৃথিবীর উনিশ মাইল।



একবার দেখলে আর ভোলা যায় না

এর পর যে গ্রহের পথ,—নাম তার শনি। নাম যেমন, চেহারাও তেমন, একটু বেয়াড়া। একবার দেখলে আর ভোলা যায় না। ওর কোমরে একঠা বেল্ট্ বাঁধা। এই বেল্ট্টাকে বলে বলয়। এই বলয় কোমরে বেঁধে শনি বেশ ধীরে সুস্থে সেকেণ্ডে ছ'মাইল বেগে সাড়ে উনত্রিশ বছরে সূর্যকে একবার ঘুরে আসছে। বৃহস্পতির পরেই শনি সবচেয়ে বড় গ্রহ এবং পৃথিবী থেকে পঁচানব্বই গুণ বড়।

এর পরের গ্রহের নাম দেওয়া হয়েছে ইউরেনাস। সূর্য থেকে এই গ্রহটি একশো আটাত্তরকোটি আঠাশলক্ষ

মাইল দূরে। সেকেণ্ডে চার মাইল বেগে ছুটে চুরাশি বছরে একবার সূর্যকে ঘুরে আসে। এর দেহ পৃথিবীর চৌষট্টী গুণ বড়।

এর পরে আর দুটি গ্রহ আছে—নেপচুন আর প্লুটো। এরা পথিবী থেকে এত বেশী দূরে যে এদের সম্বন্ধে বেশী কিছু খবর জানা যায়নি।

নেপচুন সূর্য থেকে দুশো উনআশি কোটি পঁয়ত্রিশ লক্ষ মাইল দূরে। আর সূর্য ঘুরতে লাগে তার একশো চৌষট্টি বছর।

সর্বশেষে প্লুটো। আবিষ্কার হয়েছে মাত্র সে দিন, —১৯৩০ খৃষ্টাব্দে। এ এত দূরে আছে যে দূরবীন দিয়েও ভাল করে দেখা যায় না। তিনশো ছিয়ানব্বুই কোটি মাইল দূরে থেকে প্রায় দু'শো পঞ্চাশ বছরে প্লুটো একবার সূর্যের চারধারে ঘুরে আসছে। বহু দূরে বলে সূর্যের আলো পায় খুব কম। সেই জন্যই ওর দেহ খুব বেশী ঠাণ্ডা।

মঙ্গল আর বৃহস্পতি, এ দু'য়ের মাঝে যারা ছুটছে তারা সৌরজগতের খামখেয়ালীর দল। এরা সূর্যের সংসারে ঢুকেছে জোর করে। তাই বাঁধা নিয়মে চলতে চায় না। উঁড়নচণ্ডী, নিয়ম-ভাঙ্গা—তাই নাম এদের উল্কা। এরা একা চলে না—চলে দলে দলে, ঝাঁকে ঝাঁকে। পৃথিবী যখন শিশু,—নরম আর গরম, তখন ওর দেহে ভাঙ্গা-গড়া চলেছিল অবিরত। ভেঙ্গে-চুরে, ফেটে-ফুটে যাচ্ছেতাই হয়ে উঠল ওর চেহারা। সেই ফাটা-ফুটির চোটে কখনো হয়তো পৃথিবীর দেহের খানিক পাতলা ধাতু উড়ে গিয়েছিল

মহাশূন্যে—এত শূন্যে, যেখানে টান পৌঁছয় না পৃথিবীর। সেখানে পৃথিবীর এই ক্ষুদ্র অংশগুলি আলোহীন, নাম-গোত্রহীন হয়ে সূর্যের টানে ঘুরে বেড়াতে লাগল অনন্তকাল ধরে। বিশেষ কতগুলি দিন আছে যখন পৃথিবী চলতে চলতে হাজির হয় এদের পথের কাছে। আর যায় কোথা? পৃথিবীর টান পারে না সামলাতে। সাঁ করে ছুটে আসে পৃথিবীর বুকে। তেজহীন, আলোহীন উল্কা, দারুণ বেগে বাতাস ঠেলে এগুতে থাকে—আর তারই ফলে সে জ্বলে ওঠে।

কিন্তু কথা হল, ঠেলে এগুতে থাকে বলেই জ্বলে উঠবে কেন?

দুটো জিনিষে ধাক্কা লাগলেই তাপ জন্মে। ধাক্কা যত জোর হবে, তাপ তত বাড়বে। এখন, উল্কাপিণ্ড পৃথিবীর টানে সাঁসাঁ করে ছুটে আসছে। পৃথিবী থেকে ১২০ মাইলের মত দূরে এলেই তাকে বাতাসের রাজ্যে ঢুকতে হয়। বাতাসের একটা চাপ আছে। এই চাপের ওজন হল, প্রতি এক ইঞ্চি লম্বা ও এক ইঞ্চি চওড়া জায়গা, যাকে বলে এক বর্গ ইঞ্চি, তার মধ্যে সাড়ে সাত সের। মনে রেখ, আমাদের সবাইর দেহ মোট যত বর্গইঞ্চি, ঠিক তত সাড়ে-সাত সের ওজনের চাপ দেহের ভিতরে ও বাইরে আমরা বয়ে বেড়াচ্ছি। বাইরের ও ভিতরের চাপ সমান থাকে বলেই আমরা বেঁচে আছি। এর কোন একটা বেশী-কম যদি হয় তবেই সর্বনাশ! এখন, এই প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে সাড়ে-সাত সের ওজনের চাপ-

ওয়ালা বাতাস ভেদ করে উল্কা তো ছুটে চলেছে পৃথিবীর দিকে। এতে হচ্ছে এক বিরাট সংঘর্ষ, আর তারই ফলে উল্কার ধাতুপিণ্ড জ্বলে উঠছে। বন্দুক থেকে যখন গুলি বেরয় তখন কিন্তু তা গরম থাকে না। অথচ দেখ, সেই গুলিটা যেখানটায় গিয়ে লাগে, সেখানটা পুড়ে যায়। এর কারণ কি? কারণ ওই একই! বাতাসের সংঘর্ষে গুলিটা গরম হয়ে ওঠে—তাই।

উল্কার এই ছুটাছুটিকেই আমরা বলি 'তারা-খসা'। কাজেই দেখছ, 'তারা-খসা' তারাও নয়, খসাও নয়—উল্কাপাত। আবার বেশীর ভাগ উল্কাই পথের মাঝে জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। তাই তাদের চেহারা কেমন আমরা দেখতে পাই না। উল্কাপাতের বিশেষ দিনগুলি ছাড়াও প্রায় রোজই উল্কা নেমে আসছে পৃথিবীতে।

উল্কা-পোড়াছাই যা পড়ছে পৃথিবীতে, তার ওজন যদি নিতে পার তবে দেখবে দিনে গড়ে তার ওজন দাঁড়িয়েছে ১০ থেকে ২০ টন, মানে ২৭০ থেকে ৫৪০ মনের মত। বাতাসের সাথে উল্কার ছাই মিশে গিয়ে আমাদের ঘরদোর নোংরা করছে, বন্ধ দেরাজের মধ্যে ধূলো জমাচ্ছে, আলমারার বইগুলোকে নোংরা করে দিচ্ছে।

পুড়ে শেষ হতে পারেনি এমন অনেক উল্কা-পিণ্ড কুড়িয়ে পাওয়া গেছে। কলকাতা যাদুঘরে গেলে দেখতে পাবে তাদের,—কেমন কালো কালো পাথরের মত। চেহারা যতটুকু, ওজন তার চাইতে অনেক বেশী। খুব বড় বড় উল্কা যে দেখা যায় না, এমন নয়। একবার সাইবেরিয়া দেশে এত বড় একটা উল্কা পড়েছিল যাতে মস্ত একটা বন পুড়ে ছারখার হয়ে গিয়েছিল। আর

উল্কাটা গিয়েছিল মাটির ভেতরে এত গভীর হয়ে ঢুকে যে, মানুষ অনেক চেষ্টা করেও তাকে খুঁড়ে বার করতে পারেনি। বিরাট গর্তটা এখনও হাঁ করে আছে সেখানে।

চার

চাঁদের কথা

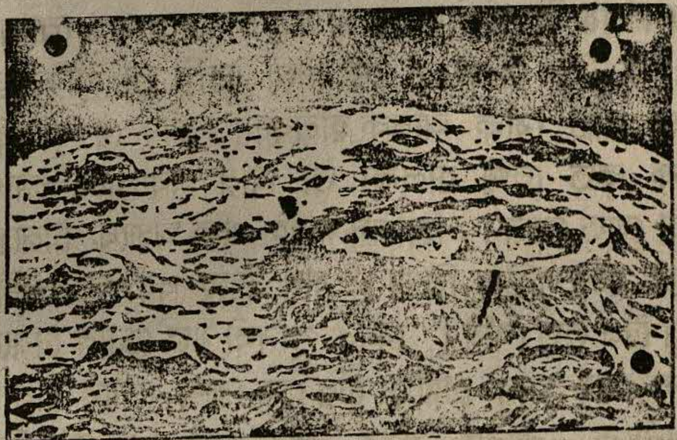
নক্ষত্রের ছেলে গ্রহ। আবার গ্রহের-ও ছেলে আছে, তা জান? তাদের বলে উপ-গ্রহ। এই উপগ্রহদের আমরা বলব চাঁদ। মঙ্গলের চাঁদ দুটি, বৃহস্পতির নয়টি, ইউরেনাসের একটি, আর পৃথিবীর একটি। এই একটি ছেলে কোলে নিয়ে পৃথিবী ঘুরে বেড়াচ্ছে—তাই ও এত আদরের। তাই ও পৃথিবীর 'সোনার-চাঁদ'! এই চাঁদেরাও সৌরজগতের নিয়ম মেনে চলে। কিন্তু পৃথিবীর মত ডিগবাজী খেতে পারেনা। তাই ওর একটা পিঠে কোনদিনই আলো পড়েনা। সেদিকটা চির অন্ধকার। আমরা দেখতেই পাইনা 'সোনার চাঁদের' সেই কালো মুখখানা। অবশ্য দূরের গ্রহগুলির চাঁদের সংখ্যা এখনও ঠিক ভাবে জানা যায় নি।

আমাদের পৃথিবীর ছেলেবেলা যখন, তখন একদিন ঘুরতে ঘুরতে ওর গা থেকে কতকটা খসে বেরিয়ে যায়। তার থেকেই চাঁদের জন্ম। তারপরে দিনের পর দিন ঠাণ্ডা হতে হতে ওটা এখন একদম ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। চাঁদ আমাদের খুব কাছে বলে ওকে এত বড় দেখায়। কাছে মানে, কত কাছে জান? দু'লক্ষ উনচল্লিশ হাজার মাইল।

চাঁদের আলো দেখে আমাদের কত না আনন্দ হয়।

মনে মনে বলি—চাঁদ, চিরদিন তুমি এমনি করে আমাদের আলো দিও। কিন্তু জান না বোধ হয়, যে আলোর জন্য ওর এত হাঁক-ডাক তা মোটেই ওর নিজের নয়,—সব ধার করা। রাতের বেলা সূর্যের আলো ঠিক্‌রে গিয়ে খানিকটা চাঁদে পড়ে,—আর তাকেই আমরা বলি—চাঁদের আলো। আবার চাঁদে যদি যাও, দেখবে পৃথিবীটাও ঠিক চাঁদের মত আলোয় আলোয় ঝলমল করছে।

চাঁদের গায়ে একটা কালো দাগ আমরা দেখতে পাই। কত গল্প লেখা হয়েছে ও নিয়ে,—কত ছেলে-ভুলানো ছড়া। একটা খরগোশ বসে আছে ওখানে, একটা বুড়ী চরকা কাটছে,—এমনি কত কী। কিন্তু ব্যাপার তা নয়। চাঁদের গায়ে ঠিক পৃথিবীর মত বড়



কিন্তু রয়ে গেছে ভীষণ বড় বড় গর্তগুলো

বড় সব পাহাড়-পর্বত আছে। ওই সব পাহাড়-পর্বতের খাদের মধ্যে যেখানে আলো পৌঁছয় না সেখানটা থাকে অন্ধকার হয়ে,—সেইগুলিই ওই সব কালো দাগ।

চাঁদের গায়ে আগ্নেয়গিরিও আছে। তার ভেতর থেকে এক সময় ভীষণ আগুন আর তার সাথে গলানো সব ধাতু বেরুত, যেমনি বেরয় পৃথিবীর আগ্নেয়গিরি থেকে। সেই পাহাড়গুলি এখন ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। কিন্তু রয়ে গেছে তাদের গায়ের সেই সব ভীষণ বড় বড় গর্তগুলি। তাদের মধ্যেও আলো পৌঁছয় না বলে তাদেরও কালো দেখা যায়।

প্রায় পঞ্চাশটা চাঁদ একত্র করলে আমাদের পৃথিবীর সমান হবে। কিন্তু আকাশে সূর্য ও চাঁদকে আমরা প্রায় একই আকারের দেখি। কারণ? কারণ খুব সোজা। চাঁদ আমাদের খুব কাছে যে! দেহের তুলনায় চাঁদের ওজন কম। বিজ্ঞানীরা এ হিসেবও খুঁজে বের করেছেন। পৃথিবী পঞ্চাশটা চাঁদের সমান হলেও ওজনে প্রায় বিরাশিটা চাঁদের মত। এ-থেকেই বোঝা যায় যে চাঁদ যে পাথর মাটি দিয়ে তৈরি তা পৃথিবীর পাথর মাটি থেকে অনেক হাল্‌কা। চাঁদ যে পৃথিবী থেকে কত বেশী হাল্‌কা তা আর একভাবে প্রমাণ করা যেতে পারে। জিনিস মাত্রই একে অন্যকে টানছে, এটাই হল সৃষ্টির নিয়ম। যার দেহে বস্তু যত বেশী, তার টান তত বেশী। যেমন পৃথিবী যত জোরে টানছে সূর্যকে, সূর্য তার চাইতে ঢের ঢের বেশী জোরে টানছে পৃথিবীকে,—কারণ সূর্যের বস্তুর পরিমাণ পৃথিবীর চাইতে অনেক বেশী। তাই চাঁদ হালকা বলে তার টানের জোর-ও কম। তুমি যদি এখানে এক মণ বোঝা বইতে পার, চাঁদে পারবে ছ'মণ। এখানে যদি লাফাতে পার চব্বিশ ফুট, চাঁদে পারবে একশ চুয়াল্লিশ

ফুট। যাবে নাকি চাঁদে? কিন্তু মুস্কিল হল, লাফানো দূরের কথা, হাঁটতে পারবে তো? কারণ চাঁদে গেলে তোমার ওজন ছ'গুণ কমে যাবে যে। কাজেই পৃথিবীর টান-খাওয়া—অভ্যস্ত তোমার পা চাঁদের মাটিতে তুলতে গেলেই মুখ থুবড়ে পড়ে যাবে। চাঁদে যারা হেঁটে এসেছে, তারা স্পেস স্যুট [Space Suit] পরে হেঁটেছে। ঐ জামা পরলে দেহের ওজন ছ'গুণ বেড়ে যায়।

এই চাঁদ-ও সৌরজগতের নিয়ম মেনে পশ্চিম হতে পুবে ঘোরে, আর পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে। আবার পৃথিবীর সাথে সূর্য-ও প্রদক্ষিণ করে।

চাঁদ সম্বন্ধে আরও অনেক মজার খবর আছে। অমাবস্যা, পূর্ণিমা, জোয়ার-ভাটা, গ্রহণ, এসব ব্যাপারেও চাঁদের কারচুপি অনেক। বিষয়গুলি কিছু গোলমেলে বলে এখানে আর বলা হল না। আর একটু বড় হলে বুঝবে ভাল।

পাঁচ

সূর্যের কথা

সূর্যের অনেক খবরই তোমরা এর আগে পেয়েছ। ওযে কী ভীষণ ব্যাপার তাও বোধ হয় কিছুটা বুঝেছ। নয় কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল দূর থেকে সূর্য আমাদের আলো দিচ্ছে। ক্রমাগত চলেছে তার তাপের বৃষ্টি। কিন্তু ওর মোট তাপের কতটুকু আমরা পাই—জান? কুড়ি কোটি ভাগের এক ভাগ মাত্র! তাও ভাগ্যিস সেই তাপ এক জায়গায় না জমে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। যদি তা না হয়ে এই কুড়ি কোটির একভাগ

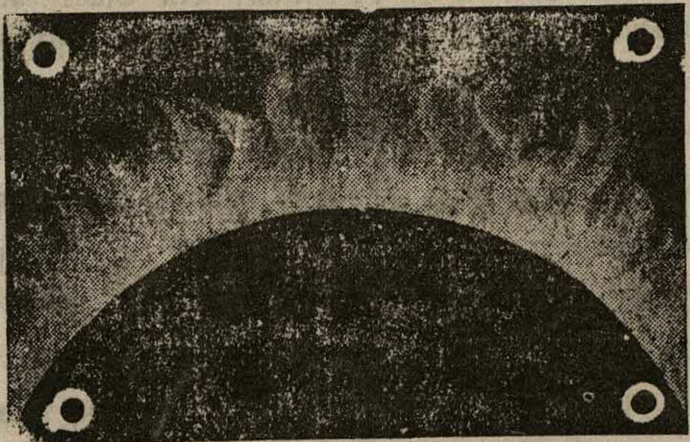
মাত্র তাপ জমত এসে এক জায়গায়, তবে তা দিয়ে দশ লক্ষ মণ জলকে টগ বগ করে ফুটিয়ে নেয়া যেত এক মিনিটে। এই সামান্য এতটুকু তাপ গোটা পৃথিবীর গায়ে ছড়িয়ে পড়ছে,—তার উপরে মেঘ আর বাতাস অনবরত আমাদের ঠাণ্ডা করে রাখছে, তবুও দেখ বৈশাখ জ্যৈষ্ঠের দিনে গরমে আমাদের প্রাণ কেমন আইঢাই করে উঠে! তবেই বোঝ ওটা কেমন গরম।

কিন্তু এত তেজ সূর্য পাচ্ছে কোথায়? পাবেনা! ওর পেটের মধ্যে দিনে ৩৬০ লক্ষ টন জ্বালানী পুড়ছে যে! ২৭ মণে হল এক টন। এবারে ভাল করে হিসেবটা কষে বুঝে নাও ব্যাপারটা, আর মার কাছে জেনে নাও রান্না বান্না করতে দিনে তোমাদের কয়লা লাগে কতটুকু। সূর্যের জ্বালানী কিন্তু কয়লা নয়, গ্যাস, নানা রকমের গ্যাস। তার মধ্যে হাইড্রোজেন নামে গ্যাসটাই হল বেশী। এই গ্যাস যেমন পুড়ছে, তেমনি আবার আপনাতেই তৈরি হচ্ছে। একটা বিশেষ অবস্থায় এই হাইড্রোজেন গ্যাস হিলিয়ামে পরিণত হচ্ছে, আর তার থেকেই জন্মাচ্ছে এই অফুরন্ত শক্তি। যে উপায়ে হাইড্রোজেন হিলিয়ামে রূপ পাচ্ছে বিজ্ঞানী ভাষায় তার নাম ফিউসন্ [Fussion]। এই রহস্য জানবার ফলেই মানুষ আজ মহাশক্তিশালী হাইড্রোজেন বোমা বানাতে পেরেছে।

দূরবীন দিয়ে সূর্যের দিকে একবার তাকিয়ে দেখ। যে ভীষণ কাণ্ড দেখবে তাতে গায়ের রক্ত হিম হয়ে যাবে। দেখবে, খালি চোখে দেখা আমাদের শান্ত সূর্যের

মধ্যে কি প্রলয় কাণ্ডই না ঘটছে। যত ভয়ের, যত ভীষণ, যত ভয়ঙ্কর, যা কিছু কল্পনা করা যায়, সব কিছুই ছাড়িয়ে যায় সূর্যের রূপ। লক্‌লকে আগুনের হল্‌কা ঘণ্টায় ষাট হাজার মাইল বেগে মহাশূন্যে পাঁচ লক্ষ মাইল পর্যন্ত লাফিয়ে উঠছে, আর জ্বলন্ত গ্যাসের তুমুল ঝড় সূর্যের পেটের মধ্যে অসম্ভব বেগে ঘুর-পাক খেতে খেতে আগুনের হল্‌কাগুলিকে কেবলই উপরে ঠেলে দিচ্ছে। এই গ্যাসের পর্দার ঘনত্ব পাঁচ হাজার থেকে দশ হাজার মাইল।

এই তোলপাড়ের ফলে সূর্যের আলোক মণ্ডলে মাঝে মাঝে ফাঁক হয়ে যায়। তখন সেখানে কিছুকালের মত আর আলো দেখা যায় না, তাই জায়গাটা



মহাশূন্যে পাঁচ লক্ষ মাইল পর্যন্ত লাফিয়ে উঠছে

কালো দেখায়। একে সৌরকলঙ্ক বলে, ইংরাজীতে Sunspot। দেখা গেছে প্রতি এগারো বছর পরে পরে এই কলঙ্কগুলির আয়তন বাড়ে, কমে। এবং

তার সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীতে অনেক বিচিত্র ব্যাপার ঘটে যায়। পৃথিবীর একেবারে উত্তর ও দক্ষিণ এই দিক দুটোকে মেরুদেশ বলে। সেখানে বছরে ছয়মাস রাত্রি আর ছয়মাস দিন। কিন্তু রাত্রির সেই ছয় মাস এক অপূর্ব্ব গোধূলি আলোকে মেরুদেশ ছেয়ে থাকে। একে বলে মেরুজ্যোতি। সৌরকলঙ্কের সঙ্গে এর সম্পর্কটা খুব নিবিড়। সৌরকলঙ্ক বড় বড় গাছের ভেতরে তার ছাপ রেখে যায়। পুরোণ বড় বড় গাছ কাটলে তার গুঁড়িতে চাকা চাকা কালো দাগ দেখতে পাবে। বছরে বছরে ঐ দাগগুলি পড়ে। ঐ দাগ দিয়ে গাছের বয়স হিসেব করা যায়। কিন্তু সৌরকলঙ্ক যখন খুব বড় হয়ে দেখা দেয় দাগগুলি তখন বেশ মোটা হয়ে ওঠে। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে বিরাট একটা সৌরকলঙ্ক দেখা গিয়েছিল। তার এপাড় থেকে ওপারের মাপ ছিল এক লক্ষ চল্লিশ হাজার মাইল। সৌরকলঙ্কের সঙ্গে পৃথিবীতে ঝড়বৃষ্টির সম্পর্কও বড় কম নয়। সৌর-কলঙ্কের ফলে রেড়িও, টেলিভিশন ও টেলিগ্রাফে বিভ্রাট ঘটে যায়, বিদ্যুৎ চলাচল পর্যন্ত বন্ধ হয়ে যায়।

কিন্তু মনে কর না সূর্য এত ভীষণ বলে নিশ্চয়ই আমাদের শত্রু। মোটেই নয়, বরঞ্চ ওর দৌলতেই আমরা বেঁচে আছি। শুধু আমরা কেন। এই পৃথিবীতে যা কিছু দেখছ—যাদের প্রাণ আছে সবাই টিকে আছে সূর্যের দয়ায়।

সে কি করে হল? বলছি।

কোটি কোটি বছর ধরে সূর্য আমাদের আলো দিচ্ছে। আরও যে কতকাল দেবে তার ঠিক নেই। এই যে সূর্যের তাপ, তাই হল আমাদের জীবন। সূর্যের তাপ না পেলে পৃথিবীতে প্রাণের বিকাশ হত না, ফুল ফুটত না, ফল হত না, পাখী ডাকত না, রংয়ের খেলা দেখা যেত না, আর আমরা তো থাকতামই না! অফুরন্ত শক্তির প্রাণকেন্দ্র সূর্য তার অফুরন্ত তেজ আর তাপের বর্ষণ দিয়ে পৃথিবীকে বাঁচিয়ে রাখছে। পৃথিবী কি তা স্বীকার করবে না?

তারপরে সূর্য আমাদের আরও কত উপকার করে দেখ। পৃথিবীর জল সূর্যের তাপে তেতে-ওঠা বাতাসের টানে বাষ্প হয়ে উপরে উঠে যায়। সেই বাষ্প আবার ঠাণ্ডা হাওয়ার ছোঁয়া লেগে নীচে নেমে আসে, মেঘের চেহারা নিয়ে। তারপরে ভেসে-যাওয়া সেই ভারী মেঘ পাহাড় বা বড় বনের গায়ে লেগে বৃষ্টি হয়ে ঝরে ঝরে গলে গলে পড়ে। দারুণ গ্রীষ্মের দিনে মাটি যখন ফেটে-ফুটে চৌচির হয়ে যায়—খাল, বিল, নদী-নালা যখন শুকিয়ে হা-হা করে ওঠে, এক ফোঁটা জলের জন্য যখন হা-হুতাশ করতে থাকি, তখন আকাশের কোণে জলভরা একখানা কাজল মেঘ দেখলে কতই না আনন্দ হয়! মন নেচে ওঠে —বলে, 'কই গো, কই গো মেঘ, উদয় হও।' তারপরে সেই মেঘ যখন মুক্তোর দানার মত ঝর ঝর করে ঝরে ঝরে পড়ে, আর ভিজা মাটির মিঠে গন্ধ আকাশ বাতাস আকুল করে তোলে, তখনকার প্রাণের আনন্দ ভাষায় বুঝিয়ে বলা যায় না। শান্ত

মনে বর্ষা-ক্লান্ত নিঝুম দিনে তোমরাই অনুভব করবার চেষ্টা কর। ভারতের যত কবির যত শ্রেষ্ঠ গান, যত শ্রেষ্ঠ কবিতা, তা রচনা হয়েছে এই বর্ষা নিয়ে, কালিদাস থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত। এ সব তোমরা বড় হয়ে পড়বে।

বারো মাসে ছ'টা ঋতু, তা নিশ্চয়ই জান। সবকটা মাসে পৃথিবীর চেহারা এক রকম থাকে না—তাও নিশ্চয়ই দেখেছ। কিন্তু কেন থাকে না? কেন ঋতু ছটা ছ' রকম চেহারা নিয়ে প্রতি বছর ঠিক সময়ে নাচতে নাচতে আমাদের সামনে এসে দাঁড়ায়—তা ভেবেছ কখনও?

ব্যাপার কি জান? এখানেও সূর্যের সেই খেলা।

আমে-জামে কাঠালে, মাছি আর ঘামাচীতে সুরু হল বৎসর। গ্রীষ্মের আগুন-ঝরা দিন।

তারপরে সাঁই-সাঁই—সোঁ-সোঁ—টুপ্-টাপ্—ঝর্-ঝর,—ঝম্-ঝম্,—রিম্-ঝিম্,—রিম্-ঝিম্, বর্ষা এলো ঝেঁপে। জলে জলে থৈ থৈ।

শরৎ এলো হাসিমুখে—ঝল্‌মলিয়ে। আকাশে নীল, আর রোদে সোনা। সাদা মেঘ, আর সাদা কাশ, শালুক আর পদ্ম, শিশির আর শিউলিঝরা দিন।

সোনার ধানে আঁচল ভরে, হিমের ওড়নায় মুখ ঢেকে, চোখ ছল্-ছল্, কে আসে ঐ? হেমন্ত না?

তারপরে শীত,—দাঁতে দাঁত ঠক্-ঠক্,—হু-হু—হি-হি,—লেপ কাঁথা কম্বল,—ফাঁটা ঠোঁট আর ফাঁটা গাল,—মিঠে রোদ আর লম্বা ছায়া।

বনে বনে আগুন লাগায় কে রে—পলাশে শিমূলে কৃষ্ণচূড়ায়? আকাশে বাতাসে এত গান কিসের? ভোমরা, মৌমাছি, একটু দাঁড়াও না ভাই? এত ব্যস্ত কেন? বলোনা, কে আসবে? কে আসবে জান না বুঝি? কোথাকার কে গা তুমি? ঋতুরাজ আসবেন, ঋতুরাজ বসন্ত। তাই তো এত আয়োজন।

বারোমাস পৃথিবী সমান ভাবে সূর্যের আলো পায় না, তাই এই ঋতুর খেলা।

কিন্তু পায় না কেন?

আগেই বলেছি, পৃথিবী যে পথে ঘোরে তা গোল নয়, ডিমের মত। আর পৃথিবী তার মেরুদণ্ডের উপর ঠিক সোজা ভাবে দাঁড়িয়ে নেই, আছে একটু হেলে। এখন, এই কাৎ-ঘাড় নিয়ে ডিমের মত পথে সূর্যের চারদিকে ঘোরার ফলে পথিবীর উপর সূর্যের আলো কখনো বেশী পড়ে, কখনো কম, কখনো সোজাসুজি, কখনো বা তেরছা হয়ে। আর ওদিকে সূর্যও সব সময় এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে না,—সেও খানিকটা পায়চারি করে। তার এই চলাফেরাকে অয়ন বলে। এই সব কারণেই হয় ঋতুর খেলা। পৃথিবী যদি তার মেরুদণ্ডের উপর সোজাঘাড়ে দাঁড়িয়ে থাকত, আর তার চলার পথ হত ঠিক গোল, ডিমের মত না হয়ে, তবে ঋতুর পরিবর্তন ঘটতই না। তাহলে বারোটা মাস ঠা-ঠা রোদে জ্বলে পুড়ে মরতাম। ভাগ্যিস তা হয় নি!

লক্ষ্য করেছ বোধ হয়, গাছপালা সূর্যের আলো

কত না ভালবাসে। একটা ছায়া জায়গায় একটা গাছ পুঁতে দাও। কিছুদিন বাদে দেখবে, হয় সে মরে গেছে, নয় তো কাছাকাছি যেখানে সূর্যের আলো পেয়েছে সেইদিকে বাঁকিয়ে উঠেছে। পুঁই লতা, কুমড়ো লতা, এসব তোমরা নিশ্চয়ই চেন। এদের একটা ডগা আজ তুমি ছায়ার দিকে ঘুরিয়ে দাও, দু'-এক দিনের মধ্যেই দেখবে সে রোদ্দুরের দিকে মুখ ফিরিয়ে রয়েছে। ঘাসের উপর একখানা ইট ফেলে রাখ, বা একটা হাঁড়ি উপুর করে রাখ। তারপরে কয়েকদিন বাদে তা তুলে দেখ,—দেখবে ওখানকার ঘাস সূর্যের আলো পায়নি বলে কেমন হল্‌দে হয়ে, ফ্যাকাসে হয়ে গেছে।

মাঠের মাঝে বা খোলা জায়গায় বট-অশথ, আম-জাম, কাঁঠাল-লিচু গাছগুলি কেমন সুন্দর গোল হয়ে বেড়ে ওঠে—দেখেছ তো? এর কারণ, ওদের ডাল-পালাগুলি চারদিক থেকে রোদ পেয়েছে বলে এক সঙ্গে সমান তালে বেড়ে উঠেছে। দেখে মনে হয় কেউ বুঝি বা কাঁচি দিয়ে সুন্দর গোল করে ছেঁটে দিয়েছে।

তাহলে দেখতে পাচ্ছ—মানুষ, পশু, গাছপালা সবাই সূর্যের আলো চাইছে। কারণ, সবাইকে বাঁচিয়ে রাখছে যে প্রাণশক্তি তাই লুকিয়ে আছে সূর্যের আলোর মধ্যে। গাছের পাতার মধ্যে একটা জিনিস আছে, বিজ্ঞানী তার নাম দিয়েছেন ক্লোরোফিল—নামটা বাংলা নয়, তবুও মনে রেখ। এই ক্লোরোফিল দিয়েই গাছ সূর্য হতে প্রাণ-শক্তি টেনে নেয়, আর জমিয়ে

রাখে তার দেহে। তারপরে মাটি থেকে, বাতাস থেকে আর যেটুকু দরকার সেটুকু খাবার টেনে নিয়ে পাতায় পাতায় চলে তার রান্না। রান্নার পরে খাবারগুলিকে চালিয়ে দেয় সারা দেহে,—ফুলে, ফলে, গুঁড়িতে, পাতায়। ক্লোরোফিল সূর্যের আলো থেকে যে খাবার লুফে নেয়, বেঁচে থাকতে তা আমাদেরও দরকার। কিন্তু আমরা তো পারি না তাকে আকাশ থেকে সোজা টেনে নিতে। তাই আমাদের নির্ভর করতে হয় গাছের উপরে। তাই যখন ভাত, ডাল, তরি-তরকারী খাই—তখন আমরা ওদের দেহের ভেতরে জমানো সূর্যের শক্তিটা খেয়ে দেহ পুষ্ট করি। আবার যখন দুধ, ঘি, মাংস, এইসব খাই, তখন গাছপাতা খেয়ে পুষ্ট পশুদের কৃপায় আমরা তুষ্ট হই!

শুধু এই নয়। সূর্যের বাহাদুরী আরও অনেক। তোমরা রেল, ষ্টিমার, মোটর, এরোপ্লেন, এসব নিশ্চয়ই দেখেছ। শুনে অবাক হবে যে এরাও চলছে সূর্যের দয়ায়। রেল, ষ্টিমার, এসব চলে কিসে? কয়লায়। আর মোটর, এরোপ্লেন? পেট্রোলে। এই কয়লা এবং পেট্রোল, এদের মধ্যে লুকোনো শক্তিটাও আসলে সূর্যের শক্তি। এক সময়ে পৃথিবী বন-জঙ্গলে ছেয়ে ছিল,—বড় বড় গাছ,—প্রকাণ্ড তাদের দেহ। ক্রমে কেউ তারা মরে গিয়ে, কেউ বা ভূমিকম্প বা অন্য কারণে মাটির নীচে আস্তে আস্তে বসে গেল। এইভাবে তারা প্রাণ হারাল বটে, কিন্তু সূর্যের আলোর গুণ নষ্ট হল না। তারা মাটির নীচে ঢুকে দিনের পর দিন মাটির চাপে ও তাপে

ধীরে ধীরে কঠিন কালো কয়লা বনে গেল। আমাদের দেশে অনেক বড় বড় কয়লার খনি আছে, অনেক সময়ে মাটি খুঁড়ে মাইলের পরে মাইল শুধু কয়লাই বেরিয়েছে। একদিন ওরা ছিল বড় বড় সব বন। তারপরে পৃথিবীতে কত মানুষ, কত পশু মরেছে। পোড়ানো যাদের হয় না, তাদের হাড় মাংস তো মাটির তলায় চলে যায়। সেই সব হাড় মাংসের মধ্যেও তো লুকোনো থাকে সূর্যের তেজ। মাটির চাপে, তাপে এবং বিশেষ অবস্থায় তারাই সৃষ্টি করে কেরোসিন বা পেট্রোল। কাজেই ট্রেন যে ছুটছে, মোটর যে দৌড়াচ্ছে, এরোপ্লেন যে উড়ছে—এতো সবই সূর্যের জন্য।

আরও অবাক খবর আছে। পৃথিবীতে যত রংয়ের খেলা দেখছ,—তাও আসছে ওই সূর্য থেকে। সূর্যের আলো তো সাদা—তবে এ কি করে হয়? শোন তবে।

ঝাড়লণ্ঠনের তিন-পিঠ-ওয়ালা একখানা কাঁচ যোগাড় করে তার ভেতর দিয়ে তাকাও সূর্যের দিকে। দেখবে রোদ্দুরের সাদা রং আর সাদা নেই। চোখের সামনে ভেসে বেড়াচ্ছে সাতটা রং। এই সাতটা রং-ই হল পৃথিবীর সব রং-এর গোড়া। এদের পাঁচ-মিশালিতেই অপর রংগুলির জন্ম। সাতটা রং কি কি? বেগ্নী (Violet), নীল (Indigo), আসমানী (Blue), সবুজ (Green), হলদে (Yellow), কমলা (Orange), এবং লাল (Red)। ইংরাজী নামগুলির প্রত্যেকটার প্রথম অক্ষর নিয়ে

একটি কথা তৈরী হয়েছে,—Vibgyor—'ভিব্‌জিয়র', বিজ্ঞানীদের ভাষায় এই একটি কথাতেই সূর্যের সাত-রং বোঝায়। বাংলাতেও এই ধরণের একটা কথা আছে, শিখে রাখ—'বেণী আসহ কলা' [খাও]।

এখন কি ভাবে এই রংগুলি আমরা দেখতে পাই ?

মনে রেখ, যে জিনিস যে রংটাকে ফিরিয়ে দেয়, সেই এসে দাঁড়ায় আমাদের চোখের সামনে। গাছের সবুজ পাতা সবুজ-ই নয়। তার মানে, পাতা সবুজ ছাড়া আর ছ'টা রংকেই হজম করেছে,—ফিরিয়ে দিয়েছে সবুজকে। আর সে এসে নালিশ জানাচ্ছে আমাদের কাছে। লাল গোলাপ লালকে দিয়েছে বিদায় করে, আর টেনে নিয়েছে বাকী গুলোকে। কাজেই পাতা যা ত্যাগ করল, গোলাপ যা ফিরিয়ে দিল,—তা স্থান পেল আমাদের চোখে, আর চোখের ভেতর দিয়ে মনে। চোখ বললে শান্তি পেলাম, মন বললে ধন্য হলাম !

সাদার বাহাদুরী কিন্তু সর্বস্ব ত্যাগে। আর কালোর নিন্দা তার কৃপণতায়। সাদা যাকে বলো, সে বলে,—চাই না আমি কিছু,—ফিরিয়ে দিলাম তোমার সব। তাই সাত-রং তার সমস্ত ঝলমল্ নিয়ে মুখ ভার করে ফিরে যায়,—আর তাই না সাদা !

কালো বলে,—ছাড়ব না আমি কাউকে,—নেব আমি সব। তাই কৃপণের কারাগারে বন্দী হল সাত-রং। মানুষের চোখ ফিরে পেল না কিছুই,—

দুনিয়া হল কালো। রং-দুনিয়ার মহা-কৃপণ, মহা-লোভী এই কালো! কাজেই দেখ, কি রহস্য লুকিয়ে আছে সূর্যের আলোতে।

তোমরা যদি রোজ ভোরে উঠে সূর্যোদয় দেখ এবং নতুন সূর্যের আলোতে খানিকটা বেড়িয়ে নেও, দেখবে কেমন আনন্দ লাগে,—শরীর কত ভাল থাকে। আজকাল সূর্যের আলো দিয়ে নানারকম রোগের চিকিৎসা হচ্ছে।

পিতা যেমন সন্তানকে পালন করেন স্নেহ দিয়ে, ভালবাসা দিয়ে, শাসন দিয়ে, আহার দিয়ে—পিতা-সূর্যও তেমনি আমাদের পালন করছেন প্রাণশক্তির অফুরন্ত বর্ষণ দিয়ে, তাপ দিয়ে, তেজ দিয়ে, আলো দিয়ে, জল দিয়ে, বাতাস দিয়ে, রং-এর খেলা আর বনবনানী, পাখপাখালী, আর ফুল-ফল-শস্যের মহোৎসব দিয়ে।

সূর্য আমাদের এত উপকার করে বলেই হিন্দু ও পার্শীরা সূর্যের পূজা করে। তারা বলে, সূর্য যখন সমস্ত শক্তির আধার, তখন সূর্যই ভগবান। মহাভারতের মহাবীর কর্ণ রোজ সূর্যের উপাসনা করতেন।

হিন্দু শাস্ত্রে সূর্য উপাসনার সুন্দর একটি মন্ত্র আছে, তোমরা তা মুখস্থ করে রাখতে পার :

জবাকুসুম সঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্।
ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্॥

———

ছয়

রাত্রি দিন কি করে হয়

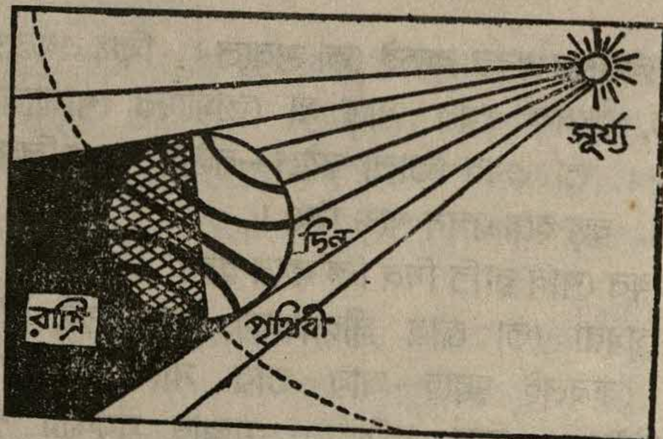
আকাশের খবর কতই তো শুনলে। কিন্তু এখনও অনেক, অনেক খবর আছে যা তোমাদের শোনানো হয় নি। তা এখন তোলা রইল—নইলে সব গুলিয়ে যাবে। বড় হয়ে ওসব পড়ে নিও।

এখন শোন রাত্রি দিন কি করে হয়।

তোমরা তো জান নীহারিকা, নক্ষত্র, সূর্য, চাঁদ এরা কেবলই ঘুরছে—আর তার সাথে আমাদের পৃথিবীটাও। তবে পৃথিবীর ঘোরার রকমটা সূর্য প্রভৃতির চাইতে একটু আলাদা। অর্থাৎ সূর্যের গতি এক রকম—পৃথিবীর দু'রকম। কিন্তু কেমন তরো? আচ্ছা, তোমরা তো সবাই লাটিম খেলা জান। মনে কর, তোমাদের কেউ একটা লাটিম ছুঁড়ল। সেটা এক জায়গায় দাঁড়িয়ে তার আলের উপর বোঁ বোঁ করে ঘুরতে লাগল। আর কেউ ছুঁড়লে আর একটা। সেটা শুধু এক জায়গায় দাঁড়িয়ে না ঘুরে, প্রথমটাকে ঠিক মধ্যে রেখে তার চারদিকে ঘুরে বেড়াতে লাগল। এখন প্রথমটা শুধু এক জায়গায় দাঁড়িয়ে ঘুরছে আর অন্যটা যেমন নিজের আলের উপর ঘুরছে, তেমন প্রথমটাকে মধ্যে রেখে তার চারদিকেও ঘুরছে।

এও ঠিক তেমনি। সূর্যটা এক জায়গায় দাঁড়িয়ে পাক খাচ্ছে একটা কেন্দ্র নিয়ে, আর পৃথিবীটা ডিগ্‌বাজী খেতে খেতে তার চারদিকে ঘুরে মরছে।

এই ডিগবাজী খাওয়াতে পৃথিবীর একটা না একটা পিঠ সব সময়েই, সূর্যের দিকে ফেরানো থাকে।



তাতে যে পিঠে আলো পড়ে, তাকেই বলি দিন। অন্য পিঠটায় আলো পড়ে না, ডুবে থাকে অন্ধকারে, তাকে বলি রাত্রি। কাজেই যখন দিন ফুরালো, রাত্রি এলো, আবার রাত্রি ফুরিয়ে দিন এলো,—তখন জানবে পৃথিবী একবার ডিগবাজী খেয়ে উঠল। এই একটিবার ডিগ্‌বাজী খেতে পৃথিবীর সময় লাগে চব্বিশ ঘণ্টা,—মানে একদিন।

পৃথিবীর এক ডিগ্‌বাজীতে তো একটা দিন হল। কিন্তু সে যে ঘুরে এলো সূর্যের চারদিক—তাতে কি হল? তাতে হল একটা বছর,—মানে তিনশো পয়ষট্টি দিন।

পৃথিবীর এই যে ডিগ্‌বাজী-খাওয়া আর সূর্য-ঘোরা—এতে সে কি বেগে ছোটে জান? সেকেণ্ডে উনিশ মাইল। আর সূর্য যে ঘুরছে, তার বেগ হল

সেকেণ্ডে দু'শো মাইল। আমাদের ছাব্বিশ দিনে সূর্য একবার ডিগ্‌বাজী খেয়ে ওঠে। মানে, যে কাজ করে পৃথিবী একদিনে সেকেণ্ডে উনিশ মাইল বেগে, সে কাজ করতে সূর্যের লাগে ছাব্বিশ দিন, সেকেণ্ডে দু'শো মাইল বেগে। এ না হলে সূর্য!

এখন কথা হল, পৃথিবী তো কেবলই ডিগ্‌বাজী খাচ্ছে আর ছুটছে। কিন্তু আমরা এই ঘূর্ণিপাকে ছিটকে যাচ্ছি না কেন?

তোমরা আগেই শুনেছ যে মহাশূন্যে যত নীহারিকা, নক্ষত্র, সূর্যগ্রহ, উপগ্রহ আছে তারা সবাই সবাইকে টানছে। এর মধ্যে যার বস্তু যত বেশী, তার টানের জোর তত বেশী। আবার দূরত্বের কম বেশীতেও টানের জোর বেশী কম হয়। এই টানাটানির ব্যবস্থা এমন নিখুঁত, যে তার ফলে কেউ কারুর পথ ছেড়ে এক চুলও নড়তে পারে না; তাই-না, এই বিশ্ব সংসার এক নিয়মে বাঁধা। কোথাও বেসুরো নেই, তাল কেটে যাওয়া নেই। ঠিক এই নিয়মেই পৃথিবী টানছে আমাদের,—আমরাও টানছি পৃথিবীকে। কাঠবিড়ালীটা ল্যাজ উচিয়ে ওই যে গাছের ডালে নাচ্‌ছে—ও-ও টানছে গাছকে, গাছও ওকে—আবার দুই-ই পৃথিবীকে,—পৃথিবী-ও দুইকে। পৃথিবীর ওজন বেশী, সে অনেক বড়, আর আমাদের সব-কাছে। কাজেই আমাদের উপর তার টানের জোর সবচেয়ে বেশী। তাই, সে টানতেই লেগে আছি আমরা তার গায়ে,—ছিট্‌কে যাওয়ার পথ কই? একখানা পা তুল্‌লেই লাগল অমনি টান,—নেমে এলো

মাটিতে। লাফ্ দিলাম শূন্যে,—অমনি পড়লাম ধপাস্ করে, মাটি দিল টান্,—হেঁই-ও! যাবে কোথায়? ওই যে চিলটা উড়ছে অনেক উপরে,—এরোপ্লেন ছুটছে মেঘের গায়ে, ওরা-ও কি চিরদিন শূন্যে ভেসে থাকতে পারে? পৃথিবীর টানের জোরের চাইতে খানিকটা বেশী জোর তারা যোগাড় করে শূন্যে উঠল বটে; কিন্তু চিলের ডানা দুটি যখন ক্লান্ত হয়ে আসে, আর এরোপ্লেনের তেল যখন ফুরিয়ে যায়,—ফিরতে হয় আবার পৃথিবীরই কোলে।

এমনি করেই পৃথিবী আমাদের বুকে আঁকড়ে রাখছে আর কানে কানে বলছে—'যেতে নাহি দিব'।

এই টানাটানি, বিজ্ঞানীর ভাষায় যাকে বলে মহাকর্ষ, তার খবর যিনি আমাদের প্রথম দিলেন, নাম তাঁর—কেপ্লার। তারপরে এলেন আর একজন, নাম ন্যুটন। ভাবুক লোক। চুপচাপ থাকেন, আর কি যেন ভাবেন। লোকে বলত ক্ষ্যাপাটে, আরও কত কী! একদিন দেখলেন, একটা ফল পড়ল গাছ থেকে। অমনি ভাবনা ঢুকলো মাথায়। ফলটা নীচে-ই বা পড়ল কেন, উপরদিকেই বা উঠে গেল না কেন? রাজ্যের ভাবনা! সে ভাবনার কি শেষ আছে? অবশেষে তিনি আমাদের শোনালেন, বস্তু যার যত বেশী, টান তার তত বেশী। তাই সূর্যের টানে গ্রহেরা ঘুরছে, আর পৃথিবীর টানে ফল পড়ছে। আর তাই-না এই সৃষ্টি চলছে নিয়ম বাঁধা পথে; আর তার পথ-চলার পায়ে পায়ে বেজে উঠছে কত সুর, কত ছন্দ,—গ্রীষ্ম-বর্ষায়, শরৎ-হেমন্তে, শীত-বসন্তে, ফুলে-ফলে,

পাখীর গানে, সূর্যের উদয়-অস্তের পথে, চাঁদের আলোয়, আর লাখো-তারার অনাদিকালের রাত-জাগায় !

কিন্তু এই টান যদি থেমে যায় ? নক্ষত্র যায় স্থির হয়ে ? গ্রহেরা ঘুরতে ঘরতে থমকে দাঁড়ায় ? পৃথিবী আর আঁকড়ে রাখে না বুকের শিশুকে ? তবে ? তবে তুমি, আমি, বাতাস, জল, সব নিমেষের মধ্যে মহাশূন্যে উড়ে যেতাম। কে আমি, কে তুমি ? কোথায় ফুল, ফল, নদী, জল ? কোথায় কে ? পৃথিবী ভেঙ্গে যেত খান্ খান্ হয়ে। চাঁদ উড়ে যেত কোথায় ? আর মহাশূন্যে নীহারিকা-নক্ষত্রের বুকে কী প্রলয় ঘটত কে জানে ?

সাত

পৃথিবীর কথা

এই তো আমাদের পৃথিবী। মায়ের স্নেহে কোলে আগলে-রাখা, ফুল-ফলে, লতায়-পাতায় ঢাকা, পাখীর গানে মুখর-করা, আলোর ঝর্ণায় স্নান-করা আমাদের সুন্দরী পৃথিবী।

কিন্তু কি করে এ সম্ভব হল ? জ্বলন্ত বাষ্পীয় সূর্যের গা থেকে ছুটে-পড়া সামান্য একটা টুক্‌রো থেকে পৃথিবী যে দিন জন্ম নিল, সে দিন সে-ও তো ছিল পিতা-সূর্যের মত দুরন্ত আগুনের গোলা। কোন্ যাদু বলে সেই আগুনের গোলা আজিকার এই রূপ-রস-গন্ধে-ভরা পৃথিবী হয়ে দাঁড়াল, সেই রহস্যের কথাই বলব এখন।

ঘুরপাক-খাওয়া জ্বলন্ত সূর্যের গা থেকে ছোট্ট একটা টুকরো তো একদিন গেল ছুটে। মহাকর্ষের নিয়মে সে কিন্তু বেশী দূরে ছুটে পালাতে পারল না। খানিকটা গিয়েই থামতে হল। তারপরে সূর্যের টান থেকে বাঁচতে গিয়ে আরম্ভ হল তার ডিগ্‌বাজী খাওয়া আর সূর্যের চারদিকে ঘোরা। সেই ঘুরে-মরা আজও তার থামেনি। থামবেও না বোধ হয়।

সেদিনকার সেই আগুনে-পৃথিবী ছিল সূর্যের মতই বাষ্পীয় আর গরম। তারপরে যতই দিন যেতে লাগল, ততই তার ভিতরের বস্তু জমাট বাঁধতে লাগল,—আর ততই সে ঘন হতে লাগল,—আর তাপ উঠল আর-ও বেড়ে। যতই ঘন হতে লাগল ততই তার চেহারা চল্‌ল ছোট হয়ে। তারপরে একদিন সে পৌঁছল গরম হবার শেষ সীমায়। তারপর থেকে আরম্ভ হল তার জুড়োবার পালা। সে পালা আজও চলছে। এমনি একদিনে সূর্যের টানে তার গা থেকে খানিকটা গেল খসে। তোমরা জান, পৃথিবীর দেহ-খসা ছোট্ট সেই টুকরোটাই পরে চাঁদ হয়ে দাঁড়াল।

বহু, বহু-বছর কেটে গেল। জ্বলন্ত পৃথিবী দিনের পর দিন ঠাণ্ডা হতে লাগল। তখন ধীরে ধীরে ওর গায়ে একটা সর পড়তে লাগল, দুধে যেমন সর পড়ে। কিন্তু ভেতর তার তখনও ভীষণ গরম আর পাতলা। সেই সময় চারদিক ছিল ভীষণ অন্ধকার,—আর উপরে শুধু কালো কালো মেঘ। সেই ঘন কালো মেঘের ফাঁক দিয়ে সূর্যের আলো পৃথিবীতে পৌঁছতে পারত

না। তারপরে নামল একদিন বৃষ্টি। কিন্তু বৃষ্টির জল পৃথিবীতে পৌঁছবার আগেই পৃথিবীর তাপে বাষ্প হয়ে আবার উপরে উঠে গেল।

কেটে গেল আরও বহু বছর। এত দিনে পৃথিবীর সরটা অনেকটা পুরু হয়ে উঠেছে, আর তাপও কমেছে অনেকটা। তখন বৃষ্টির জল পৃথিবীর গায়ে দাঁড়াতে লাগল। বছরের পর বছর ধরে তখন চলেছিল বৃষ্টি,—অঝোরে একটানা বৃষ্টি। গোটা পৃথিবী জলে জলে থৈ থৈ করে উঠল। এতে পৃথিবী তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা হতে লাগল। কিন্তু খানিক নীচে তখনও আগুনের তোলপাড়। সেই তোলপাড় মাঝে মাঝে পিঠের সরটাকে ঝেড়ে ফেলে ঠেলে বেরুতে চেষ্টা করত। স্বভাবতই যেখানকার সরটা একটু পাতলা, সেখান দিয়েই ঠেলে বেরুত আগুন। এ যেন একটা বেলুনকে ফুঁ দিয়ে ফোলাতে ফোলাতে হঠাৎ একটা জায়গা উঁচু হয়ে ফট করে ফেটে যাওয়া। এতে পৃথিবীর কোন কোন জায়গা গেল বসে, আবার কোন কোন জায়গা উঠল উঁচু হয়ে। এমনি ধারা ভাঙ্গা গড়ার পালা চল্‌ল বহু, বহু কাল।

এমনি করেই যত সমুদ্র, পাহাড় ও ডাঙ্গার সৃষ্টি হল।

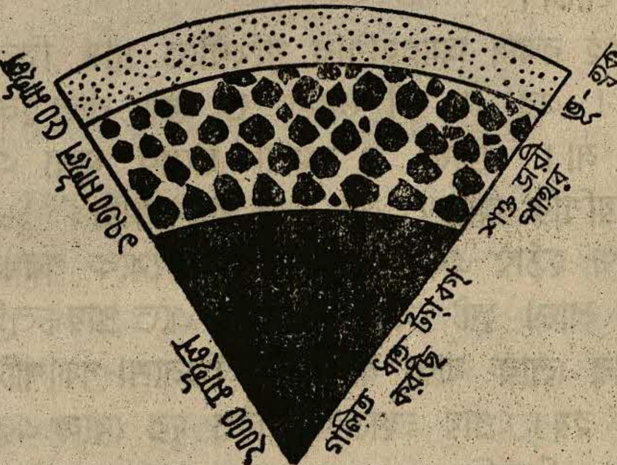
কিন্তু মনে রেখ, সূর্যের আলো তখনও মেঘ ঠেলে পৃথিবীর গায়ে পৌঁছতে পারেনি। ঠিক এমনি একদিনে হয়তো পৃথিবীতে প্রথম প্রাণের জন্ম হয়েছিল, —প্রোটোপ্লাজম্ যার নাম দিয়েছেন বিজ্ঞানীরা,— ঘন লালার মত,—আকারহীন, জলে ভেসে বেড়াত।

এরাই হল পৃথিবীর বুকে প্রাণের নীহারিকা। এরা বেঁচে থাকত আমাদের মত সূর্যের আলোর তাপে নয়, নীচ থেকে পৃথিবীর গরমে।

হঠাৎ একদিন এক আশ্চর্য ব্যাপার ঘটে গেল। আকাশের মেঘগুলি হাল্‌কা হয়ে উঠল,—আর তার ফাঁক দিয়ে চিরে বেরুল সূর্যের আলো। পৃথিবীতে প্রথম সূর্যের আলো পড়ল। পৃথিবীর তপস্যা শেষ হল, পিতা-সূর্য তাঁর আশীর্বাদের আলো বুলিয়ে দিলেন শিশু পৃথিবীর মাথায়। সব যেন পাল্‌টে গেল এক পলকে। আলোয় আলোয় চারদিক ঝল্‌মল্‌ করে উঠল। আরম্ভ হল রাত্রি দিন, আরম্ভ হল ঋতুর খেলা, হেসে উঠল চাঁদ, ঝক্‌মক্‌ করে উঠল তারায় ভরা রাতের আকাশ। আর সেই দিন প্রকৃত প্রাণের সূচনা হল এই পৃথিবীতে। পৃথিবীর জয়-যাত্রা হল সুরু।

আরও লক্ষ বছর কেটে গেল। পৃথিবী চল্‌ল আরও ঠাণ্ডা হয়ে। আর তার সরটা হতে লাগল আরও পুরু। এমনি করে ওই সরটা আজ পর্যন্ত আমাদের পায়ের নীচে পঞ্চাশ মাইল অবধি জমাট বেঁধেছে। এই পঞ্চাশ মাইল ব্যাপী সরটাকে বিজ্ঞানী ভাষায় বলে ভূ-ত্বক্‌। ভূ মানে পৃথিবী, আর ত্বক্‌ মানে চামড়া! এই ভূ-ত্বক্‌, মাটি ও নানা রকমের কাঁকর-পাথরে তৈরী। এর পরে এক হাজার সাতশো ত্রিশ মাইল ঢেকে আছে শক্ত ভারী পাথরে, আর তার সাথে মেশানো আছে লোহা প্রভৃতি অনেক রকম ধাতু। তারপরে প্রায় দুহাজার মাইল বেড়ে আছে

লোহা, নিকেল প্রভৃতি ধাতু, গলানো অবস্থায়। পৃথিবীর পেটের ঠিক মধ্যস্থল বা কেন্দ্র আমাদের পায়ের চার হাজার মাইল নীচে। কাজেই দেখতে পাচ্ছ, পৃথিবীর পেটের মধ্যে এখনও আগুনের তোলপাড় চলছে।



পৃথিবীর পেটের খবর

কিন্তু কি করে আমরা পৃথিবীর পেটের আগুনের এই দুরন্তপনার খবর জানতে পারি?

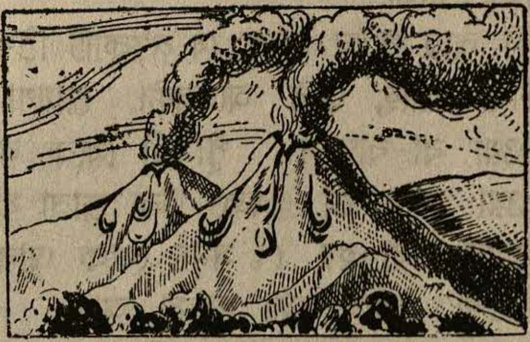
চাঁদের গায়ে আগ্নেয়গিরির কথা আগেই তোমাদের বলেছি। বিভিন্ন কারণে ভূ-ত্বকে ক্রমাগত ফাটল সৃষ্টি হচ্ছে। এই ফাটল দিয়ে ঠাণ্ডা জল পৃথিবীর পেটের মধ্যে ঢুকে পড়ে। সেই জল চোঁয়াতে চোঁয়াতে যখন পৃথিবীর পেটের আগুনের কাছাকাছি আসে, তখন গরম কড়াইতে জল পড়লে যেমন হয়, ঠিক তেমনি, এক মুহূর্তে জল আর জল থাকে না, ছ্যাক্ করে বাষ্প হয়ে উবে যায়। আর তক্ষুণি সেই বাষ্প নিজ ধর্ম অনুসারে ঠেলে উঠতে চায় উপরদিকে। ভূ-ত্বকের

যে অংশ দুর্বল সেই অংশ দিয়ে সে হু-হু করে ঠেলে বার হয়। কিন্তু সে তো একা বার হয় না, বিরাট তোলপাড় সৃষ্টি করে কাছাকাছি যত ধাতু সব গলিয়ে দারুণ বেগে ফেটে বেরিয়ে আসে। এইভাবে আগ্নেয়-গিরির সৃষ্টি হয়। আর এই গলানো ধাতুর স্রোতকে বলে লাভা।

এই রকম আগ্নেয়গিরি পৃথিবীতে প্রায় তিনশো' আছে। এরা যে কী ভয়ঙ্কর তা শুধু বলে বুঝানো যায় না। জাভা ও সুমাত্রা দ্বীপের মধ্যে একটা আগ্নেয়গিরি আছে। নাম তার ক্রাকাতোয়া। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে হঠাৎ একদিন ওর ভেতর থেকে গরম বাষ্প আর লাভা ছুটে বেরুতে থাকে। এতে প্রায় চল্লিশ-হাজার লোক মারা যায় এবং তিনশো-পঞ্চাশটি গ্রাম ধ্বংস হয়। প্রায় দুহাজার মাইল দূর থেকে এর শব্দ শোনা গিয়েছিল। কোথায় লাগে এ্যাটম্ বা হাইড্রোজেন বোমা!

ইটালী দেশে আর একটি ভয়ঙ্কর আগ্নেয়গিরি আছে। নাম তার ভিসুভিয়াস। এই ভিসুভিয়াসের কাছে দেশের লোকেরা সুন্দর একটি নগর গড়ে তুলে-ছিল,—নাম তার পম্পাই। লোকজনে-ভরা পম্পাই,—দেশ জোড়া তার নাম। কি একটা উৎসবে সেদিন সহরের লোকেরা মেতে আছে। এমন সময় ভীষণ শব্দ হল। হাজার বোমা এক-দমকে ফাটার চাইতে-ও বড় শব্দ। সমস্ত সহরটা থর্‌থর্‌ করে কেঁপে উঠল। লোকজন সব ঘর ছেড়ে বাইরে ছুটে এলো। তাকিয়ে দেখে কি, তাদের অমন সুন্দর পাহাড়, ভিসুভিয়াসের

মাথা দিয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠছে কেবল ধোঁয়া



কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠছে কেবল ধোঁয়া আর ধোঁয়া

আর ধোঁয়া। বেশীক্ষণ আর দেখতে হল না। হঠাৎ পাহাড়ের মাথাটা তার গা থেকে ছিঁড়ে আকাশের দিকে উড়ে গেল। আর সাথে সাথে ছুটে নামল গলানো ধাতুর স্রোত,—জলের মতন পাত্‌লা আর আগুনের মত টক্‌টকে লাল। তারপর দেখতে দেখতে পম্পাই পুড়ে ছাই হয়ে চাপা পড়ে গেল লাভা স্রোতের তলায়। আজ দু'হাজার বছর পরে খুঁড়ে খুঁড়ে সেই পোড়া সহর বার করা হয়েছে।

তারপরে, তোমরা গরম ফোয়ারার কথা শুনেছ। কোন কোন পাহাড়ের গা দিয়ে অবিশ্রান্ত ধারায় জল বেরুচ্ছে,—শুধু গরম জল,—যেন এই মাত্র কেৎলি করে কেউ ফুটিয়ে এনেছে। বাড়ীর কাছে বীরভূম জেলায় বক্রেশ্বরে, আর বাংলাদেশের চট্টগ্রামে এমনি সব ফোয়ারা আছে। সুবিধা হলে দেখে এসো। পণ্ডিতগণ মনে করেন, এই সব জলের উষ্ণতার কারণ-ও পৃথিবীর পেটের মধ্যকার আগুন।

এই তো হলো পৃথিবীর পেটের খবর। এবার তার পিঠের খবর শোনো।

পৃথিবী আর সূর্যের মাঝে যে ন'কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল ফাঁক আছে, তার অনেকটা জায়গা জুড়ে আছে হাওয়া বা বাতাস। পৃথিবী থেকে কত-দূর পর্যন্ত হাওয়া আছে তা এখনও ঠিক জানা যায়নি। তবে অনুমান করা হয় যে সমুদ্র থেকে আকাশের দিকে চারশো' মাইল পর্যন্ত হাওয়া আছে। উল্কা-পাতের কথা তোমাদের আগেই বলেছি। ঠাণ্ডা একটা ধাতুপিণ্ড পৃথিবীর টানে সাঁই করে নেমে আসে, আর বাতাসের ধাক্কা লেগে জ্বলে ওঠে। বিজ্ঞানীরা হিসেব করে দেখেছেন, এই জ্বলুনি সুরু হয় একশো' কুড়ি মাইল উপরে। কাজেই এটা অনুমান করা যায় যে একশো' কুড়ি মাইলের অনেক উপরেও হাওয়া আছে। কারণ, অনেকক্ষণ ধরে হাওয়ার সঙ্গে ধস্তাধস্তি না হলে সে তো আর জ্বলবে না। যেমন নাকি দুটো পঁ্যাকাঠি অনেকক্ষণ না ঘষলে জ্বলে না।

এখন, এই যে হাওয়া, এ কি ভাবে সৃষ্টি হল দেখ।

জন্ম-সময়ে পথিবী তো ছিল শুধু গ্যাসে ভরা। নানা রকমের গ্যাস। সেই গ্যাসের পৃথিবী আস্তে আস্তে হল তরল, তারপরে তরল থেকে শক্ত। এর মধ্যে কতগুলি গ্যাস ঠাণ্ডা হয়েও কঠিন হতে পারল না,—কখনও দুটো, কখনও তারও বেশী মিশে গিয়ে কতগুলি তরল পদার্থের সৃষ্টি করল। যেমন জল। আর কতগুলি—কোনটা একা, কোনটা আবার দু-একটার সাথে হাত মিলিয়ে গ্যাসই রয়ে গেল। এমনি

একটা মিশ্রিত গ্যাসই হল বাতাস।

কিন্তু বাতাসের খবর জানবার আগে আর একটা ভারী জরুরী খবর আছে, যা জেনে রাখলে ব্যাপারটা বুঝতে সুবিধা হবে।

বিজ্ঞানীরা খবর দিয়েছেন যে পৃথিবীতে যত জিনিসই আমরা দেখি বা অনুভব করি তার গোড়ায় বা মূলে রয়েছে মাত্র ৯৭টি পদার্থ। এদের বলা হয় মৌলিক পদার্থ। অর্থাৎ এই ৯৭টার যোগ-বিয়োগেই দুনিয়ার সব কিছু। প্রথমে এই সংখ্যা স্থির হয়েছিল ৩৬। তারপরে খোঁজখবর নিয়ে জানা গেল ৯২। এখন আরও ৫টির খবর পাওয়া গেছে।

কি ভাবে শোনো!

সূর্য থেকে গ্রহের জন্ম, বিজ্ঞানী মহলে এ কথাটা চালু হওয়ার পর থেকেই নানা রকম প্রশ্ন, নানা রকম সন্দেহ জেগে উঠল চারদিকে। কথাটা কেউ মানলেন, কেউ মানলেন না; বল্‌লেন, প্রমাণ চাই, চোখে দেখতে চাই, যেমন দেখিয়ে ছিলেন গ্যালিলিও। বিজ্ঞানীদের মুশকিলই হল এই। চোখে না দেখলে তাঁরা সহজে কিছুই মানতে চান না। বল্‌লেন, তাই যদি হবে, তবে সূর্য যে সব উপাদানে তৈরী, মানে, সূর্যের মধ্যে যে সব জিনিস আছে, পৃথিবীতেও তার খোঁজ চাই। দিতে পার ভাল, নইলে রইল তোমার কথা, বিশ্বাস-ই করিনে!

প্রমাণের চেষ্টা চল্‌ল,—অক্লান্ত চেষ্টা। তারপরে আবিষ্কার হল এক অদ্ভুত যন্ত্র, নাম দেয়া হল তার স্পেক্‌ট্রোস্কোপ [Spectroscope]। এই যন্ত্র দিয়ে

সূর্যের আলো ভেঙ্গে পরীক্ষা আরম্ভ হল। একে বলে বর্ণালী পরীক্ষা। প্রতিটি মৌলিক দ্রব্য গ্যাসীয় অবস্থায় এক একটা বিশেষ বর্ণ বা রং ধারণ করে। কোন দুটি মৌলিক দ্রব্যের বর্ণালী কখনও এক রকম হয় না। কাজেই জ্বলন্ত গ্যাস পিণ্ড, সূর্য থেকে ছুটে-আসা আলো নিয়ে চল্‌ল পরীক্ষা। পরীক্ষা করতে করতে প্রথমে ৩৬, তারপরে ৯২, আরও পরে ৯৭টা মৌলিক দ্রব্যের খোঁজ মিলল, যা নাকি পৃথিবীতেও আছে।

প্রমাণ-চাওয়ার-দল চুপ করে গেল।

এই বর্ণালী পরীক্ষা যে কত জটিল, কত দুরূহ, এই পরীক্ষায় যে কত মনীষা, কত ধৈর্য ও মনঃ-সংযোগ দরকার, তা তোমরা যতই বড় হবে ততই বুঝবে। বড় বড় পণ্ডিতেরা যখন এই পরীক্ষা নিয়ে হিম্‌সিম্ খাচ্ছেন, যা খুঁজছেন তা পাচ্ছেন না, অথচ পাওয়া চাই, তখন দুনিয়াকে অবাক্ করে দিলেন বাংলার এক ছেলে—ডক্টর মেঘনাদ সাহা। বহু নতুন ও জটিল প্রশ্নের জবাব তিনি এনে দিলেন সূর্যের বুক চিরে। গ্যালিলিওর আবিষ্কারের পরে এত বড় আবিষ্কার বিজ্ঞান-জগতে আজ পর্যন্ত নাকি মাত্র গুটিকয়েকই হয়েছে। তাই বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীদের আসরে ডক্টর সাহার আসন এত বড়।

এখন, এই যে মৌলিক পদার্থ, এর রূপ কখনও বদলায় না। যেমন সোনা একটা মৌলিক পদার্থ। তাকে যতই ভাঙ্গ, শেষ পর্যন্ত সে সোনা-ই থেকে যাবে। ভাঙ্গতে, ভাঙ্গতে, ভাঙ্গতে এমন এক অবস্থায় এসে দাঁড়াবে যখন তাকে আর ভাঙ্গতে গেলে 'পদার্থ'

বলে কিছুই থাকবে না। অর্থাৎ পদার্থ নামে তাকে যদি ডাকতে চাও, তবে আর এতটুকু ছোটও দিও না তাকে। পদার্থের এই অবস্থাকে বলে মলিকিউল বা অণু। এখন এই মলিকিউলকেও যদি ভাঙ্গতে চাও, তো সুরু কর ভাঙ্গতে। ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে এবার এমন জায়গায় এসে পৌঁছবে যাকে আর ভাঙ্গা যাবে না, অর্থাৎ সৃষ্টির শেষ বিন্দুতে তুমি পৌঁছে গেছ। একে ইংরেজ বলে এ্যাটম্, আমরা বলি পরমাণু, যার কতগুলির জটলায় গড়ে উঠে একটি মলিকিউল বা অণু। তবে মনে করনা যে, মৌলিক পদার্থ হলেই তাকে সোনার মত কঠিন পদার্থ হতে হবে। ওটা একটা উদাহরণ মাত্র। তরল বা গ্যাসীয় পদার্থও মৌলিক পদার্থ হতে পারে,—যাকে যতই ভাঙ্গ বা মার, **স্বভাব তার বদলাবে না।**

কিন্তু এই ৯৭টাই যদি দুনিয়ার সবকিছু হয় তবে এত জিনিস এলো কি করে ?

আগেই বলছি, এদের যোগ-বিয়োগেই বাকিগুলির জন্ম। তাদের বলা হয় যৌগিক পদার্থ। দুটো বা তারও বেশী মৌলিক পদার্থ একত্র হয়ে তৈরী হয় একটা যৌগিক পদার্থ। আর এমনি মজা যে, মিশে গিয়ে এরা এমনি চেহারা ও স্বভাব পেয়ে বসে যে কে বলবে এটা দুটো মৌলিক পদার্থের সমষ্টি ? কিন্তু জাত এদের ধরা পড়ে তখনই, যখনই আমরা এদের ভাঙ্গতে সুরু করি। ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে দেখা যায় এদের যা বলে জানতাম, তা-তো নয়! জাত ভাঁড়িয়ে চেয়েছিল সমাজে মিশতে। যেমন হাইড্রোজেন

ও অক্‌সিজেন নামে দুটো গ্যাস আছে। তারা দুজনেই মৌলিক। স্বভাব তাদের দুজনের একেবারে আলাদা। হাইড্রোজেন খুব হালকা গ্যাস। তাকে ধরে রাখা দায়। ফাঁক পেলেই উপরে উঠে যায়। আর একটু তাপ পেলেই দপ্‌ করে জ্বলে ওঠে। আর অক্‌সিজেন বড় মিশুক গ্যাস। লোহার গায়ে লেগে মরচে ধরায়, কয়লার সাথে মিশে আগুন জ্বালায়। হঠাৎ কি-করে একদিন এদের হয়ে গেল ভাব। এমনি ভাবে মিশে গেল, চেনে কার সাধ্য। কিন্তু ওদের এই জাত ভাঁড়ানোতে পৃথিবী গেল বেঁচে,—পেল সে জল। জলের মধ্যে আছে দুই ভাগ হাইড্রোজেন ও এক ভাগ অক্‌সিজেন, বিজ্ঞানীর ভাষায় H_2O। এই হল যৌগিক পদার্থ। মনে রেখ, এই যে মৌলিক পদার্থের যৌগিক রূপ-পরিবর্তন, এ কিন্তু খেয়াল-খুসী মত মিশালেই চলবে না। এর একটা বাঁধাধরা নিয়ম আছে, যার কম হলে মৌলিক পদার্থ যৌগিক রূপ নেবে না, আর যার বেশী হলে বেশীটুকু থাকবে পড়ে। তুমি যদি তিন ভাগ হাইড্রোজেন আর এক ভাগ অক্‌সিজেন মিশাও, তবে দেখবে, দুই ভাগ হাইড্রোজেন ও এক ভাগ অক্‌সিজেন মিলে জল তৈরী হয়েছে, আর এক ভাগ হাইড্রোজেন পড়ে আছে। আবার ওই হাইড্রোজেন-অক্‌সিজেনকেই একটু এদিক ওদিক করে মিশাও,—দুই ভাগ হাইড্রোজেন আর দুই ভাগ অক্‌সিজেন। এবার দেখবে, আর জল নয়। দাঁড়িয়েছে আলাদা একটা তরল পদার্থ, মাটিতে পড়লে ফস্‌ ফস্‌ করে ওঠে,

ডাক্তাররা ঘা-পাঁচড়া ধুতে তাকে কাজে লাগান—হাইড্রোজেন-প্যারক্সাইড্—বিজ্ঞানের ভাষায় H_2O_2।

এই যে যৌগিক মিশ্রণ, এর থেকে কিন্তু মৌলিক পদার্থকে সহজে আলাদা করা যায় না। বিদ্যুতের সাহায্যে বিশেষ তাপে তাদের আলাদা করতে হয়। খানিকটা জলকে ঐ ভাবে বিদ্যুতের তাপ দিলে দেখবে, জল আর জল নেই,—দুটো গ্যাস আলাদা হয়ে উবে গেছে,—পাত্র তোমার খালি। এ যেন এক ভেল্‌কিবাজী।

এই যৌগিক মিশ্রণ ছাড়াও মৌলিক পদার্থের আর এক রকম মিশ্রণ আছে। তাকে বলে সাধারণ মিশ্রণ। যৌগিক মিশ্রণের মত সাধারণ মিশ্রণে মৌলিক পদার্থ তার নিজের স্বভাব হারিয়ে ফেলে না, —এবং মূল-পদার্থগুলিকে আলাদা করতেও বেশী কষ্ট হয় না।

ধর, যেমন বালি আর চিনি মিশে গেল। মুখে দিলে বালিও টের পাবে, চিনিও। যদি ওদের আলাদা করতে চাও, গুলে ফেল জলে। চিনি যাবে গলে, আর বালি থাকবে পড়ে। তার পরে ছেঁকে নেও। ছাকনীতে বালি আট্‌কে থাকবে, আর জলেগোলা চিনি ছাকনী বেয়ে নীচে পড়বে। তার পরে সেই জল ফুটোলেই জল যাবে উবে, আর পেয়ে যাবে চিনি! এই হ'ল সাধারণ মিশ্রণ।

বায়ু-ও এমনি একটি সাধারণ মিশ্রণ।

কাজেই জল ও বায়ু এ দু'টো এক জাতের নয়। দু'ভাগ অক্সিজেন ও চার ভাগ নাইট্রোজেন দিয়ে

বায়ু তৈরী। এটা সকলের আগে প্রমাণ করেন ফরাসী বিজ্ঞানী অ্যান্তয়েঁ লরেন্ত ল্যাভয়সিঁয়ে। এ ছাড়া কার্বন-ডাই-অক্সাইড, জলীয় বাষ্প এবং আরও কতগুলি গ্যাস বায়ুর মধ্যে আছে। এদের অতি সহজেই আলাদা করা যায়। বায়ুর মধ্যে যে অক্সিজেন আছে তাতেই আগুন জ্বালায়। একটা মোমবাতি জ্বেলে একটা কৌটো দিয়ে ঢেকে দাও, দেখবে ওটা নিভে গেছে। কারণ, বাতির সঙ্গে অক্সিজেন মিশবার পথ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। জলে যেমন তার মূল-পদার্থগুলির অংশ সব সময়েই ঠিক সমান থাকে, বায়ুতে তা থাকে না। নদীর পাড়ে বা খোলা জায়গায় হাওয়াতে অক্সিজেন থাকে বেশী। আবার পৃথিবী ছেড়ে যতই উপরে উঠবে অক্সিজেন ততই কমে আসবে। কাজেই বায়ু জলের মত একটা যৌগিক পদার্থ নয়, এটাই প্রামাণ হল।

এই বায়ু সমুদ্র হতে আকাশে চারশো মাইলেরও উপর পর্যন্ত জুড়ে আছে, এ কথা আগেই জেনেছ। কিন্তু এতে এই বুঝায় না যে, এই সমস্ত জায়গা জুড়েই বায়ু এক অবস্থায় আছে। অর্থাৎ চারশো মাইল উপরের বাতাস আর তোমার ঘরের বাতাস একই রকম, এ কথা বুঝলে ভুল বুঝা হবে। দালানের যেমন একতলা, দুতলা, তিনতলা থাকে, বাতাসেরও তেমনি কতগুলি তলা বা স্তর আছে।

বাতাস পৃথিবীর যত কাছে ততই ঘন, আর যত দূরে ততই হালকা। পৃথিবীর পিঠ হতে আট-দশ

মাইল পর্যন্ত বাতাসের প্রথম স্তর। এরই মধ্যে তার যত ছুটোছুটি দাপাদাপি, আর ঝড়-ঝাপটার তাণ্ডব। একে বলে ক্ষুব্ধস্তর। এর পরে চল্লিশ-পঞ্চাশ মাইল পর্যন্ত শান্ত স্তর। সেখানকার বাতাসে ছুটোছুটি নেই। ঠাণ্ডা হিম হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এর উপরে হাইড্রোজেন ও অন্যান্য প্রকার গ্যাসের স্তর। সেখানকার খবর এখনও ভাল ভাবে পৌঁছয়নি আমাদের কাছে।

যাঁরা বাতাসের এই স্তরগুলি পরীক্ষা করছেন, তাঁরা দেখেছেন যে, যতই ওপরে ওঠা যায়, বাতাস ততই ঠাণ্ডা, এবং ততই দম আটকে আসে। পৃথিবীর কাছাকাছি বাতাসে ধূলিকণা মেশানো থাকে, আর সেগুলিই সূর্যের তাপে তেতে ওঠে। এই কণাগুলি ভারী বলে বেশী উপরে উঠতে পারে না। তাই উপরের বাতাসে গরম নেই। আর দম আট্‌কে আসে এই জন্য যে—বাতাস থেকে অক্সিজেন টুকুই শুধু আমরা টেনে নেই, আর বাকীটা ছেড়ে দেই। সেই অক্সিজেন পৃথিবীর কাছাকাছিই থাকে বেশী। যত উপরে ওঠা যায়, ততই সে কমে আসে। সেই জন্যই দেখছ উঁচু পাহাড়ে যারা ওঠে, পিঠে তারা বয়ে নেয় অক্সিজেনের থলে। দরকার হলে ওরা নল লাগিয়ে নেয় নাকে। এভারেষ্ট-জয়ী তেনজিং ও হিলারীর ছবি তো তোমরা দেখেছ, কি রকম অক্সিজেনের মুখোস-পড়া। তাও-তো এভারেষ্ট মাত্র পাঁচ মাইলের মত উঁচু।

কিছু আগে বলেছি যে, কোন মৌলিক পদার্থকে,

ভাঙ্গতে, ভাঙ্গতে, ভাঙ্গতে, ভাঙ্গতে এমন এক বস্তুতে এসে পৌঁছয় যাকে আর ভাঙ্গা যায় না, যার নাম দেয়া হয়েছে অ্যাটম্ বা পরমাণু। কথাটায় কিছু ভুল আছে।

এই পরমাণু-নামধারী পদার্থ বিন্দু এত ছোট যে মানুষ অনেক কাল ভাবতেও পারেনি যে একেও আবার ভাঙ্গা যেতে পারে। যার দশ কোটি একত্র করলে মাত্র এক ইঞ্চি জায়গা জুড়ে থাকে, তাকে আবার ভাঙ্গা কি? আর এর পরেও আরও ক্ষুদ্র বস্তু থাকতে পারে সে আবার কি কথা? কিন্তু মানুষ বড় বেয়াড়া জীব। কোথাও সে থামতে চায় না,—কোন কথাকেই শেষ কথা বলে মানতে চায় না। 'চরৈবেতি, চরৈবেতি'—এগিয়ে চল, এগিয়ে চল, এই হল মানুষের চিরকালের কথা।

তাই চল্‌ল পরমাণু নিয়ে পরীক্ষা। সে কী দারুন তপস্যা! যে ক্ষুদ্রকে কল্পনাও করা যায় না,—তারও ক্ষুদ্রতম অংশ খুঁজে বার করতে হবে।

অবশেষে তপস্যা শেষ হল,—আবিষ্কার হল এক যন্ত্র, নাম তার সাইক্লোট্রোন। বড় জটিল তার গঠন,—তার চাইতেও অদ্ভুত তার কাজ। এমনি একটি যন্ত্র কলকাতায় আমাদের বিজ্ঞান কলেজে আছে। বড় হয়ে যখন বিজ্ঞান পড়বে তখন ওর কাজ-কারবার দেখে নিও।

আরম্ভ হল মানুষের পরমাণু ভাঙ্গব্যর সাধনা। তারপরে একদিন অবাক বিস্ময়ে বিজ্ঞানী দেখলেন, যা দেখলেন তা বিশ্বাস করে উঠতে পারলেন না। এ কি যাদু, ভেলকি না আর কিছু! তিনি দেখলেন, ঐ

যে পরমাণু, যার দশ কোটির ঠাসাঠাসিতে এক ইঞ্চি পরিমাপ, তার প্রতিটির ভিতরে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র বিন্দুর এ কী নাচন। একটা কেন্দ্রকে ঘিরে কতগুলি বিন্দুর সে কী তাথৈ-নাচন! ঠিক যেন কতগুলি ক্ষুদে সৌরজগৎ জুড়ে আছে একটা পরমাণুতে। কোথাও বেতাল নেই,—কোথাও তালকেটে-যাওয়া নেই,—কারুর সাথে কারুর ধাক্কা-ধাক্কি নেই—নাচছে, কেবলই নাচছে। বিজয়ী বিজ্ঞানী তখন সবাইকে ডেকে জানিয়ে দিলেন,—শোনো, শোনো যা জেনেছিলে এতদিন তা ঠিক নয়, সৃষ্টির শেষ কথা এ্যাটম্ নয়,—আরও ছোট, আরও ক্ষুদের খোঁজ আমরা পেয়েছি,—যার বহুর একত্রে একটি এ্যাটম্।

এরা হল অতি পরমাণু, প্রোটোন, ইলেকট্রন যাদের নাম। এ যে কি বস্তু তা বলে বুঝাবার চেষ্টা বৃথা। তবুও বলছি শোনো।

প্রত্যেকটি পরমাণুর একটা করে কেন্দ্র আছে,—যাকে বলে, ন্যুক্লিয়স্,—ফলের যেমন শাঁস। এখানে থাকে প্রোটোন কণিকা। আর তার চারদিকে ডিমের মত পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে যারা, তারা হল ইলেকট্রন কণিকা। এ যেন সূর্যের সংসার—ঘিরে আছে সব গ্রহের দল। আবার এখানেও সেই ধরবার আর পালাবার খেলা। প্রোটোন বলছে—ধর-ধর-ধর, ইলেকট্রন বলছে—পালা পালা-পালা। পালাতে গিয়ে ইলেকট্রন কণিকা কি বেগে ছোটে জান? সেকেণ্ডে প্রায় হাজার মাইলেরও বেশী। কাজেই এই টানাটানি আর ছুটোছুটির ফলে প্রোটোন

পারেনা ইলেকট্রনকে টেনে নিতে, আবার ইলেকট্রনও পারেনা ছুটে বেরিয়ে যেতে। ফলে সৌরজগতের মত খুদে-জগৎ গড়ে উঠেছে প্রতিটি পরমাণুর অন্তরে।

এই প্রোটোন ও ইলেকট্রনের অনেকগুলির জটলায় গড়ে ওঠে একটি এ্যাটম্। আবার বহুতর এ্যাটমের জটলায় একটি মলিকিউল। আবার অসংখ্য মলিকিউলের সমাবেশে একটি মৌলিক দ্রব্য।

কাজেই এই দুনিয়ায় যা কিছু দেখছ তার শেষ কথা হল ঐ প্রোটোন আর ইলেকট্রন। তবে ভেব না, প্রত্যেক বস্তুরই প্রোটোন-ইলেকট্রনের সংখ্যা এক। বস্তুর জাত ভেদে এই সংখ্যার প্রভেদ হয়।

মনে রেখ, একটি প্রোটোন কণা একটি মাত্র ইলেকট্রন কণাকেই বশে রাখতে পারে। পরমাণু কেন্দ্রে প্রোটোন কণা যত বেশী হয় তত বেশী ইলেকট্রনকে তারা শাসনে রাখে। পরমাণু-কেন্দ্রের প্রোটোন-ইলেকট্রনের সংখ্যা দিয়ে পরমাণুর "এ্যাটমিক্ নম্বর' স্থির হয়।

'এ্যাটমিক নম্বর' আবার কি?

তুমি, আমি, আমরা, মানুষ তো সবাই। কিন্তু আমাদের ব্যক্তিগত পরিচয় কি? তুমি যে আমি নও, আর আমি যে তুমি নই, সেটা বোঝানো কি করে? সেটা বোঝাবার জন্যই তো জন্মের পরে বাপ-মা আমাদের নাম রাখেন,—আর এই জন্যই তো পরীক্ষার খাতায় রোল নম্বরের ব্যবস্থা। বলছি তো 'এ্যাটম্'। কিন্তু সব এ্যাটম্ই কি এক? যেমন সব বস্তু এক নয়। তবে তাদের চিনব কি করে? চিনব,

হয় নাম দিয়ে, না হয় নম্বর দিয়ে। নাম দিয়ে সব সময় চিনবার সুবিধে হয় না। কত নাম আর মনে রাখা যায় বল? আর একই নামের তো কত লোকই থাকে। তাই এ্যাটম্‌দের চিনবার জন্য কতকগুলি নম্বর ঠিক করা হয়েছে। যেমন হাইড্রোজেন গ্যাসের পরমাণু কেন্দ্রে আছে একটি প্রোটোন আর একটি ইলেকট্রন। তাই ওর নম্বর হয়েছে এক। হিলিয়ামে আছে দু'টি করে, তাই ওর নম্বর দুই। এই করে ৯২ এ্যাটমিক্‌ নম্বর দাঁড়িয়েছে ইউরিনিয়ামের।

ওদিকে আর একটি খবর পাওয়া গেছে। পরমাণু কেন্দ্রকেও নাকি ভাঙ্গা যায়। তাকে ভেঙ্গে পাওয়া গেল প্রোটোন ছাড়া আরও দু'রকম কণিকার সংবাদ। তাদের নাম রাখা হল ন্যুট্রন আর পজিট্রন। পজিট্রন ওজনে ইলেকট্রনের সমান, কিন্তু পালিয়ে বেড়ায় না তার মত, প্রোটোনের মত আকর্ষণ করে। আবার ন্যুট্রনের কোন ধর্ম-ই নেই। সে হাঁ-ও নয়, না-ও নয়, ওই একরকম! সে না পারে প্রোটোনের মত টানতে, না পারে ইলেকট্রনের মত ঠেলতে। সে কেবল প্রোটোনের সাথী—আছে—এই পর্যন্ত। ওজন কিন্তু তার প্রোটোনেরই মত।

প্রোটোন-ইলেকট্রনের এই যে খুদে সৌরজগৎ, এখানে প্রতিটি কণিকার মধ্যে ফাঁক কত জান?

সূর্যের সাথে গ্রহদের, আবার গ্রহে গ্রহে যে দূরত্বের কথা তোমরা আগেই শুনেছ, প্রোটোনে ইলেকট্রনে, আর ইলেকট্রনে ইলেকট্রনে দূরত্ব তার চাইতে বেশী ছাড়া কম নয়। এটা অবশ্য তাদের আয়তনের অনুপাত

অনুসারে। এই সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা দিতে গিয়ে একজন বিখ্যাত বিজ্ঞানী বলেছেন –হাওড়ার মত মস্ত বড় ষ্টেশন থেকে অন্য সব কিছু সরিয়ে নিয়ে কেবল গোটা পাঁচ ছয় বোলতা ছেড়ে দিলে যে অবস্থা হয়, পরমাণুর অন্তরে অতি-পরমাণুদের অবস্থাও ঠিক তেমনি। এদের পরস্পরের দূরত্ব এত বেশী বলেই সৃষ্টি টিকে আছে। তা না হলে পরমাণু জগৎ বিলুপ্ত হয়ে যেত, –আর পরমাণু দিয়ে গড়া এই বিশ্ব-জগতের চিহ্ন-ই খুঁজে পাওয়া যেত না।

একবার চোখ বুজে ভাল করে তাকিয়ে দেখতো—

৯৭টা মৌলিক পদার্থে গড়া এই বিশ্বজগৎ। যে কোন একটা বেছে নাও। ভাঙ্গতে সুরু কর। ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে প্রথমে এলো অণু—মলিকিউল। তাকে ভাঙ্গলে, পেলে পরমাণু—এ্যাটম্। তাকেও আবার ভাঙ্গলে—পেলে এবার অতি-পরমাণু—প্রোটোন, ইলেকট্রন ইত্যাদি।

কী বিরাট বিস্ময়! কি বিপুল রহস্য! কে সেই কবি, যাঁর কল্পনায় রূপ পেয়েছিল এই সৃষ্টি? কে সেই শিল্পী, যাঁর যাদুস্পর্শে গড়ে উঠল এই বিশ্ব?

ওই যে শেয়ালটা ডাকল, যে উঁইপোকা তোমার বই কাটল, যে মশাটা তোমার গাল কামড়ে দিল, যে ঢিলটা তুমি আকাশে ছুঁড়লে, যে ফুলের পাঁপড়িটি ঝরে পড়ল, ঐ যে দু'ফোটা বৃষ্টি পড়ল, আর হু-হু করে বাতাস ছুটে এলো, এর সব কিছুরই শেষ কথা হল প্রোটোন আর ইলেকট্রন। যতক্ষণ এদের নাচের

তালে কেউ বাধা দেয় না,—ততক্ষণ সব কিছুই ঠিক আছে বলে মনে হয়। আর যখনই কোথাও গোলমাল বেঁধেছে দেখবে,—খাপছাড়া ভাব,—ঠিক যেমনটি হওয়া উচিত তেমনটি নয়,—তখনই বুঝবে এদের নাচের তাল কেটেছে,—কেউ খুঁচিয়ে এদের রাগিয়ে দিয়েছে। ইলেকট্রনদের নিয়ম হল, আঘাত পেলেই চঞ্চল হয়ে ওঠে, আর চঞ্চল হলেই তাপ বিকিরণ করতে করতে ছুটে পালাতে চায়। আর ইলেকট্রনের কমতি পড়লেই প্রোটোনের আকর্ষণ ওঠে বেড়ে,—তার মেজাজ যায় বিগড়ে।

প্রমাণ চাও?

এক টুক্রো রেশমের কাপড় দিয়ে একখানা কাঁচকে আচ্ছা করে ঘষে দাও। তারপরে সেই রেশমের টুকরোকে কাঁচের কাছে এগিয়ে নাও। দেখবে চুম্বকের ধর্ম জেগেছে কাঁচের বুকে। অর্থাৎ কাঁচ টেনে নিচ্ছে রেশমের টুকরোকে।

এটা হল কেন?

ঘষাঘষির ফলে খানিকটা ইলেকট্রন এসে লেগে গেল রেশমে। কাঁচের অন্তরে ইলেকট্রনের পড়ল কমতি। সঙ্গে সঙ্গে প্রোটোনের তেজ উঠল বেড়ে। তারা চঞ্চল হয়ে উঠল—বল্‌লে,—ঘর ভাঙ্গে কেরে? ফিরে দে আমার ইলেকট্রন কণাকে। ওদিকে পালিয়ে-আসা ইলেকট্রনের মনেও শান্তি নেই। সে ফিরে যেতে চায় ঘরে,—ফিরে চায় শান্তি। তাই দুজনকে যেই কাছে নেয়া, প্রোটোন দিল টান, আর ইলেকট্রন দিল ঝাঁপ। ইলেকট্রন ফিরে গেল নিজ

ঘরে। প্রোটোনের মেজাজ হল শান্ত। এই যে এত বড় ব্যাপারটা ঘটে গেল, তা আমরা দেখলাম শুধু কাঁচ আর রেশমের শাঁটাশাঁটিতে।

একটু আগেই বলেছিলাম যে হুনিয়ার শেষ কথা হল প্রোটোন আর ইলেকট্রন [পজিট্রন ও ন্যুট্রন সহ]। এদেরই জটলায় গড়ে উঠেছে যত মৌলিক দ্রব্য, রূপ যার কখনো বদলায় না।

একদিন কিন্তু জানা গেল, এদের-ও রূপ পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব। প্রতিটি মৌলিক দ্রব্যের এ্যাটমের অন্তরের প্রোটোন সংখ্যা এক নয়; এবং এক নয় বলেই তারাও এক নয়, চেহারা ও স্বভাবে। ঐ প্রোটোন সংখ্যাই ঠিক করে দেয়, কোনটা সোনা, কোনটা পারা বা অন্য কিছু। একদিন বেয়াড়া-মানুষের খেয়াল চাপলো মৌলিকের বুকে ঘা মেরে প্রোটোন সংখ্যা কম-বেশী করে দিয়ে দেখা যাক না কি হয়! দেখা গেল অবাক কাণ্ড! মৌলিক আর মৌলিক নেই, সে চেহারা পালটাচ্ছে। সেইদিন থেকে মৌলিকের জাত গেল মারা!

কিন্তু এখানে শেষ হলেও মৌলিকের মান হয়-তো কিছুটা বাঁচতো!

আর এক দিন আর-ও আশ্চর্য খবর পাওয়া গেল যাতে 'মৌলিক' পদবীটা এখন প্রায় মিছে হয়ে দাঁড়িয়েছে! খবর পাওয়া গেল, এদের এই রূপ-পরিবর্তন মানুষের চেষ্টার অপেক্ষা রাখে না। আপনাতেই হয়ে চলে, অতি ধীরে, অতি গোপনে। তখনকার হুনিয়ায় এটা একটা জবর খবর।

বিজ্ঞানী মহলে হুলস্থূল পড়ে গেল। ফরাসী বিজ্ঞানী হাঁরী বেকরেলের গবেষণায় জানা গেল কিছু খবর। তারপরে তাঁর ছাত্রী ম্যাডাম কুরী ও তাঁর বিজ্ঞানী স্বামী পিচ্‌ব্লেণ্ড নামে একরকম খনিজ পদার্থ নিয়ে অনেক গবেষণা করলেন। তার ফলে আমরা জানতে পেলাম যে পৃথিবীতে ৪০টি এমনি জাত-খোয়ানো মৌলিক দ্রব্য আছে,—ইউরিনিয়াম, রেডিয়াম, পলোনিয়াম, থোরিয়াম প্রভৃতি। আর এরা জাত খোয়াচ্ছে ইচ্ছা করে নয়, বড় দায়ে পড়ে। এদের পরমাণু-কেন্দ্রের প্রোটোনগুলি সাধারণের চাইতেও বেশী ভারী। আর সেখানে ভীড় জমিয়েছে কতগুলো নুট্রন কণিকা। তাই ভার সামলাতে না পেরে ক্রমাগত তেজ বিকিরণ করছে, আর ইলেকট্রনের মূলধন খোয়াচ্ছে। আর তারই ফলে এই রূপ-পরিবর্ত্তন। এই ধাতুগুলিকে বলে তেজস্ক্রিয় বা রেডিও-এ্যাক্‌টিভ দ্রব্য। [এ্যাটম্‌ আর হাইড্রোজেন বোমার কল্যাণে আজকাল Radio Active কথাটা খুবই শোনা যাচ্ছে, তাই জেনে রাখা ভাল]।

এই রেডিও-এ্যাক্‌টিভ পদার্থের আবিষ্কারে আমরা আরেক ভাবে অশেষ উপকৃত হয়েছি।

দেখা গেছে, এদের রূপান্তর ঘটে একটা বাঁধা গতিতে। সেই গতির হিসাবে এক টুক্‌রো ইউরিনিয়াম ৫০০ কোটি বৎসরে অর্ধেক সীসায় রূপান্তরিত হয়। এই হিসাবে দেখা গেছে পৃথিবীর বয়স এখন দাঁড়িয়েছে প্রায় ৩৪০ কোটি বৎসর। হিসাবটা সঠিক না হলেও সঠিকের প্রায় কাছে বলা চলে! তবে মোটামুটি ভাবে

পৃথিবীর বয়স ধরা হয় ২০০ কোটি বৎসর।

এখন বাতাসের মধ্যে এদের কাজ কি রকম দেখ।

কোথাও কিছু নেই হঠাৎ মার মার কাট্‌কাট্‌। ঝড় এলো ছুটে। বাড়ী ঘর উড়ে গেল,—বড় বড় গাছ ভেঙে পড়ল, মানুষ মরল, পশু মরল, পাখী মরল,—তারপরে আবার সব চুপ।

এটা হলো কেন ?

সূর্যের তাপে মাটি গরম হয়ে মাটির প্রোটোন ইলেকট্রনদের দিল খেপিয়ে। মাটি তার তাপ ছেড়ে দিল বাতাসে। ফলে বাতাসের ইলেকট্রন-প্রোটন দল গেল চটে। লেগে গেল তাদের রাজ্যে হুলস্থূল। গরম হয়ে তারা ছুটে চল্‌লে উপর দিকে। বাতাসে হয়ে গেল একটা গর্ত। কিন্তু এ দুনিয়ায় কোন জায়গাই ফাঁকা থাকতে পারে না। বাতাসের হেড অফিসে খবর গেল। কি সর্বনাশ, বাতাসে গর্ত! হুকুম হল, গর্ত বোজাও। এখুণি বোজাও। হু হু করে নেমে এলো ঠাণ্ডা বাতাস, উপর থেকে,—আবার তার জায়গায় অন্য বাতাস, আরও উপরের, তারপরে আর-ও, তারপরে আর-ও। এদিকে প্রথম-আসা ঠাণ্ডা বাতাস পৃথিবী ছুঁয়েই দে ছুট আকাশে। এমনি করে চল্‌লে আকাশ-পৃথিবী মাঝে বায়ুর একটা চড়কি স্রোত। এই তোলপাড়ে বায়ুর ক্ষুব্ধস্তর চঞ্চল হয়ে উঠল। আরম্ভ হল ঝড়। চৈত্র-বৈশাখ মাসেই এরকম ঝড় বেশী দেখা যায়। এই ঝড়কে কালবৈশাখী বলে।

কাজেই দেখছ, সূর্যের তাপে বাতাসের প্রোটোন ইলেকট্রনের দল তেতে না উঠলে ঝড় হত-ই না!

এখন এই বাতাস, যার কথা বলতে বলতে পরমাণু, অতি-পরমাণুর গভীর অরণ্যে ঢুকে পড়েছিলাম, সে কত কাজ করে দেখ।

আগেই জেনেছ বাতাস না হলে আগুন জ্বলত না। কারণ বাতাসের অক্সিজেন পৃথিবীর কার্বন বা অঙ্গারের সঙ্গে যোগ হয়ে আগুন জ্বালায়। তাছাড়া বাতাস বাঁচিয়ে রেখেছে পৃথিবীতে জীব উদ্ভিদ্, সব কিছুকে। জীব বা উদ্ভিদ্ সবাইর দেহে অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে কার্বন নামে একটা পদার্থ থাকে। জীব যখন শ্বাস টানে তখন বাতাস থেকে কেবল মাত্র অক্সিজেনটুকুই গ্রহণ করে। এই অক্সিজেন দেহের কার্বনের সঙ্গে মিশে কার্বন-ডাই-অক্সাইড নামে একটা গ্যাস তৈরী হয়ে নাক দিয়ে বেরিয়ে আসে। এইভাবে ধীরে ধীরে বাতাসের অক্সিজেন যায় কমে, আর কার্বন-ডাই-অক্সাইডে বাতাস ওঠে ভারী হয়ে। প্রাণীদের পক্ষে এটা বড় মারাত্মক। শীতের দিনে ঘরের দরজা জানালা সব বন্ধ করে লেপ মুড়ি দিয়ে শুলে কিরকম একটা দম-আটকা ভাব মনে হয় না? ওটা হয়, কারণ বন্ধ ঘরের অক্সিজেনের পুঁজিটুকু টেনে টেনে প্রায় শুষে নিয়েছ,—আর ঘর ভরে উঠেছে তোমার ছেড়ে দেওয়া কার্বন ডাই-অক্সাইডে। বেশীক্ষণ এভাবে থাকলে মারা যাওয়াও অসম্ভব নয়।

কিন্তু বাতাসের অক্সিজেন তো এই ভাবে ফুরিয়ে যাওয়ার কথা! তবে আমরা বেঁচে আছি কি করে? —বলি।

অক্সিজেন নিয়ে তো কার্বন-ডাই-অক্সাইড

দিলাম ছেড়ে। আমাদের কাছে তা বিষ হলেও গাছ-গাছালির কাছে তা কিন্তু অমৃত। অর্থাৎ, তারা তক্ষুণি টেনে নেয় কার্বন-ডাই-অক্সাইডকে, আর ফিরিয়ে দেয় অক্সিজেন। এই ভাবেই বাতাসে অক্সিজেন ও কার্বন-ডাই অক্সাইডের কমতি পড়েনা কখনও। আমরা যা ছেড়ে দেই, গাছ তা টেনে নেয়, আবার গাছ যা ছেড়ে দেয়, আমরা তা টেনে নেই। গাছপালা আমাদের যে সব উপকার করে তার মধ্যে এই একটি প্রধান। এই জন্যই বাড়ীর কাছে-পিঠে গাছপালা জন্মানো ভাল।

তারপরে বাতাসের আরও অনেক কাজ। দুনিয়ার খবর চালাচালি কাজের সেই হল পিয়ন। বাতাসের মধ্যে বিদ্যুতের ঢেউ বইছে সব সময়, ছোট বড়, নানা রকমের। এই ঢেউগুলিই যত শব্দ সব পিঠে বয়ে তোমার আমার কাছে পৌঁছে দেয়। তুমি বলছ, আমি শুনছি। এ সম্ভব হত না যদি না বাতাস থাকত। আরও অবাক হয়ে যাই, যখন দেখি হাজার হাজার মাইল দূরের কথা ভেসে এসে ধরা পড়ছে আমার রেডিও-যন্ত্রে। তখন পরম বিস্ময়ে বাতাসকে নমস্কার জানাই। বায়ু-তরঙ্গে শব্দ চলাচলের এই সংবাদ যিনি আমাদের প্রথম দিলেন, তিনি আমাদেরই ঘরের ছেলে—আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু। আজিকার রেডিও যন্ত্র আবিষ্কারের গোড়ায় তাঁর দান অসামান্য। তারপর ইটালী দেশের বিজ্ঞানী মার্কনীর হাতে এই যন্ত্র আজিকার পূর্ণতা পেলো। জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার যখন প্রথম প্রচারিত হল, তখন ফরাসী

বিজ্ঞান পরিষদের সভাপতি এক পত্রে তাঁকে লিখেছিলেন—

"আপনার অপূর্ব আবিষ্কার বিজ্ঞানের জ্ঞানকে বহুদূরে এগিয়ে নিয়েছে। আপনার প্রাচীন পূর্বপুরুষরা ছিলেন সেই সময়কার মানব-সভ্যতার অগ্রণী। বিজ্ঞান ও কলাবিদ্যার উজ্জ্বল আলোকে তাঁরা জগতকে আলোকিত করেছিলেন। আপনি তাঁদের গৌরব কীর্তি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করুন।"

এ-যে আমাদের কত বড় গৌরবের কথা তা বলে শেষ করা যায় না। আমাদের প্রাচীন পূর্বপুরুষদের জ্ঞানের আলোকে একদিন পৃথিবী আলোকিত হয়েছিল। আমাদের অশেষ দুর্ভাগ্য যে তা নিয়ে আজ আমরা কোন আলোচনা করি না, বিদেশীরা তো না-ই। তাঁদের বংশধর হিসেবে সেই সব লুপ্ত-কীর্তি উদ্ধার করার মহান কর্তব্য আমাদেরই, একথা মনে রেখ!

বাতাসের আর এক কাজ আলো বিছিয়ে দেয়া। তোমরা দেখছ রোদ যেখানে নেই, সেখানে ছায়াতেও আলো আছে। এ কাজটি-ও করছে বাতাস। বাতাস না থাকলে শুধু রোদ-পড়া জায়গাটাই হত আলো,—আর বাকী-সব অন্ধকার,—ছাদের' পরে তালু-ফাটা রোদ, আর ঘরের মধ্যে ঘুট্‌ঘুটে অন্ধকার। তাছাড়া এই রোদ বিছাতে গিয়ে বাতাস রোদের তাপকেও ছড়িয়ে দেয়। তা না হলে যে জায়গায় রোদ পড়ত, সে জায়গা পুড়ে ছারখার হয়ে যেত।

বাতাসের মধ্যে জলীয় বাষ্প, অক্‌সিজেন, কারবলিক এ্যাসিড প্রভৃতি গ্যাস ছাড়াও নাইট্রোজেন

নামে একটা গ্যাস আছে। এটা গাছপালার একটা প্রধান খাদ্য। বায়ুমণ্ডলের এই নাইট্রোজেন জমিকে উর্বর করে এবং উদ্ভিদ জগতকে বেঁচে থাকতে সাহায্য করে। বজ্র বা বাজ বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেনকে অন্যান্য গ্যাস থেকে পৃথক করে দেয়, আর বৃষ্টি এসে সেই নাইট্রোজেনকে মাটিতে নামিয়ে আনে। এইভাবে আকাশের নাইট্রোজেন পৃথিবীকে উর্বর করে।

আরও দুটো কাজ করছে বাতাস, সেও বড় কম নয়। পৃথিবীর যত তাপ, সব পাঠিয়ে দিচ্ছে উপরে। আবার উপরের ঠাণ্ডা বাতাসকে ঠেলে রাখছে নীচ থেকে, যাতে সে ঝপ্ করে নীচে নেমে আসতে না পারে। যে গ্রহে বাতাস নেই, সে গ্রহে প্রাণও নেই। অবস্থা তার বড়ই কাহিল। যেমন চাঁদ। চাঁদে বাতাস নেই, তাই সূর্যের তাপে সে তেতে পুড়ে ওঠে, আবার গ্রহণের ছায়া পড়লেই ঠাণ্ডা হিম হয়ে যায়। বাতাস নেই বলে চাঁদে টুঁ শব্দটি পর্যন্ত নেই।

বাতাস যে কেবল একটা কম্বলের মত আমাদের পৃথিবীকে জড়িয়ে রেখেছে, তাই নয়। পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবাইর সঙ্গে বাতাস প্রাণের বন্ধনে বাঁধা। বাতাস না থাকলে বৃষ্টি হত না, শিশির পড়ত না, কুয়াসা হত না। আর এসব না হলে বাতাস পরিষ্কার হত না, ময়লা বাতাসে শ্বাস টেনে আমাদের অসুখ হত; পৃথিবী সুজলা হত না, মাটি সরস হত না, উদ্ভিদ জন্মাত না, আমরা বাঁচতাম কি করে?

এই আমাদের পৃথিবী। জন্মের পরে আজ তার বয়স দুশো কোটি বছর হতে চল্ল। তবু আজও

তার যৌবনে পেঁছয়নি। ভাঙ্গাগড়া শেষ হয় নি। পঞ্চাশ কোটি বছর আগে যে জীব পথিবীতে প্রথম এসেছিল, আজ তিন লক্ষ বছর মাত্র আগে সে প্রথম মানুষের রূপ পেল। এই তিন লক্ষ বছরের সাধনার ফল আজিকার মানুষ,—তুমি, আমি, আরও কতো। কী করে, কীভাবে, কোন্ রহস্যময় পথের কিনারা বেয়ে পৃথিবীর বুকে প্রাণের জয়-যাত্রা সুরু হল,—সেই কথাই বলব এখন।

আট

প্রাণ

যে শান্ত, সুন্দর পৃথিবী অগণিত সন্তান বুকে নিয়ে আপন মনে সূর্য প্রদক্ষিণ করছে, তার জন্ম-ক্ষণের রূপ তো আমরা দেখেছি। কী দাপাদাপি, কী মাথা-কোটাকুটি, কী ভয়ঙ্কর ফুঁসে-ফেঁপে ফুলে ফেটে পড়া, তেজের কী দুর্দান্ত দুরন্তপনায় মেতে ছিল সেই শিশু পৃথিবী! একদিন নয়, মাস-বছর নয়, প্রায় দেড়শো' কোটি বছর ধরে চলেছিল এই মাতামাতি। তারপরে, দুরন্তপনা যখন কিছুটা থেমে এলো, আলোহীন কালো এক আঁধার রাতে সমুদ্রের গরম বুকে শোনা গেল প্রাণের প্রথম স্পন্দন,—প্রোটোপ্লাজম্ তার নাম। আদি জ্যোতি নীহারিকাকে কেন্দ্র করে আকাশে যেমনি ফুটে উঠেছিল তারার মেলা, আদি-প্রাণ প্রোটো-প্লাজম্কে কেন্দ্র করে পৃথিবীতে-ও সুরু হল প্রাণের খেলা। সেই যে সুরু হল, আজও তা বয়ে চলেছে—

প্রাণ হতে প্রাণে, গাছ থেকে ফুল, ফুল থেকে ফল ফল থেকে আবার গাছ, পিতা হতে সন্তানে; এক থেকে বহু, বহু থেকে বহুতরো,—প্রাণের চাকা ঘুরছে, ঘুরছে আর ঘুরছে।

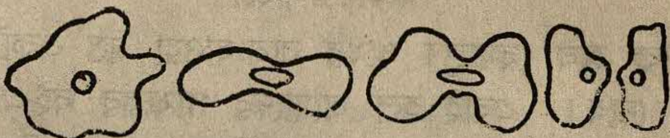
কিন্তু কোথা হতে এলো এই প্রাণ, যার এতটুকু আভাস-ও পাইনি সেই শিশু পৃথিবীর বুকে? প্রাণহীন জড় পৃথিবীর বুকে ছোট্ট একটি ভীরু প্রাণ কি করে এসে দানা বাঁধল, সে জিজ্ঞাসার আজ-ও কোন উত্তর মেলেনি। সে পরম-বিস্ময়ের মতই রয়ে গেল।

প্রাণ কি করে এলো তা আমরা না জানলেও কোথায় প্রথম প্রাণ এসেছিল তা জেনেছি।

প্রোটোপ্লাজমের দেহের ঠিক মাঝখানটায় ফুট্‌কিমত একটি মাত্র বিন্দু থাকত। ওটা-ই ওর প্রাণকেন্দ্র। দেহে ঐ একটি মাত্র কোষ সম্বল করে, কত ভয়ে, কত সাবধানে সেদিনের দুরন্ত পৃথিবীর বুকে সে যাত্রা শুরু করেছিল। আকারহীন, লালাময় সেই প্রথম প্রাণী মাঝে মাঝে ঠিক মাঝখান দিয়ে সরু হতে হতে দুই ভাগে ভাগ হয়ে যেত, আর মাঝের সেই বিন্দুটাও খানিকটা এদিক খানিকটা ওদিকে কেটে যেত। এইভাবেই চলত তার বংশ বৃদ্ধি।

এদের সম্বন্ধে এর চাইতে আর বেশী খবর যোগাড় করা যায়নি। কারণ গায়ে হাড়গোড় ছিল না বলে পৃথিবীর বুকে এরা কোন চিহ্ন রেখে যেতে পারেনি।

তারপরে সূর্যের আলো পড়ল পৃথিবীতে এবং সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর চেহারা গেল বদলে। এই সময় থেকেই পৃথিবীতে জীবনের ক্রমবিকাশের মোটামুটি একটা



হিসেব পাওয়া গেছে।

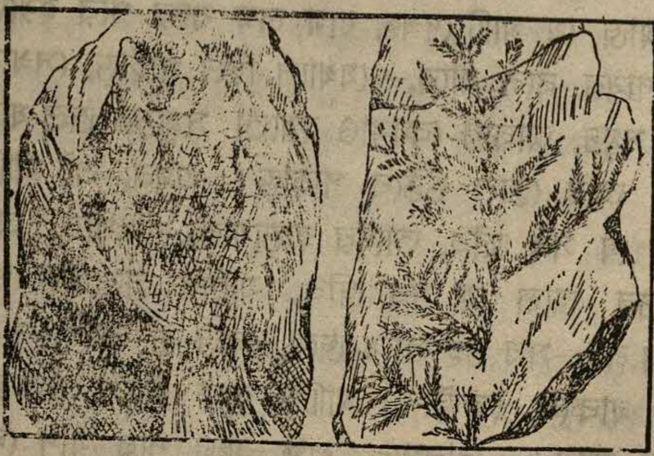
কি করে, শোনো—

আজ যে মাটি দেখছ, লক্ষ লক্ষ বছর পরে হয়তো তা পাথর বনে যাবে,—যেখানে ছিল পাহাড়, সেখানে হবে সমুদ্র, আবার কোথাও হয়তো সমুদ্রের জল যাবে শুষে, আর ঠেলে উঠবে পাহাড়। এখন, এই মাটির মধ্যে যে সব জীব, তাদের হাড়গোড়, গাছপালা আর সমুদ্রের জলে যে সব জীব, যাদের হাড়গোড় পচা সম্ভব নয়—সব ওই সাথে জমে, কেউ-বা কঠিন পাথর হয়ে থাকবে, কেউ বা মাটির বুকে ছাঁচের মত ছাপ রেখে যাবে। তারপরে, লক্ষ বছর পরে যদি কেউ জানতে চায়, লক্ষ বছর আগে পৃথিবীতে কি রকম সব প্রাণী ছিল, তা হলে ওর থেকেই তার উত্তর মিলবে।

সুতরাং পৃথিবীর পাহাড়-পর্বতগুলিকে আমরা একখানা বই বলতে পারি।

যাদুঘরে যদি যাও,—বেশী দূর নয়,—এই কলকাতার যাদুঘরেই একবার ঘুরে এসোনা,—দেখবে কত বড় বড় ভীষণ চেহারা-ওলা জন্তু জানোয়ারের হাড়গোড় সব সাজানো আছে। তারা এত প্রাচীনকালে জন্মেছিল যে তাদের হাড়গোড় আমরা কিছুতেই পেতাম না যদি প্রকৃতির নিয়মে তারা পাথর বনে না যেত। আবার দেখবে, কত পোকা, গাছের পাতা, যেমনটি ছিল ঠিক তেমনটি পাথর বনে গেছে। সব চাইতে

অবাক হবে বেমালুম পাথর বনে-যাওয়া মস্ত একটা গাছ দেখে। এরাই হল আমাদের পাথরের বই-এর এক একটি ছেঁড়া পাতা। ইংরাজীতে এদের ফসিল [Fossil] বলে।



ছাঁচের মত ছাপ রেখে যাবে

এমনি ধারা এখানে ওখানে খুঁজে-পাওয়া টুক্‌রো পাতা কুড়িয়ে বিজ্ঞানীরা পৃথিবীতে জীবনের ক্রম-বিকাশের একটা ইতিহাস লিখেছেন। সে লেখা এখনও শেষ হয়নি। নতুন নতুন ফসিল রোজই পাওয়া যাচ্ছে। তাই তার পাতায় পাতায় কাটাকুটি চলছে ক্রমাগত। কিন্তু এ পর্যন্ত যেটুকু লেখা হয়েছে, তাতে দেখতে পাবে, কি করে পৃথিবীর বুকের অতি নগণ্য প্রাণী ধাপে ধাপে উন্নীত হয়ে শ্রেষ্ঠ জীব, মানুষ হয়ে দাঁড়াল।

———

নয়

যাত্রা হল সুরু

ধাপে ধাপে প্রাণ এগিয়ে চল্‌ল, ধাপে ধাপে আমরা যেমন সিঁড়ি বেয়ে উঠি। প্রাণের যাত্রা হল সুরু !

প্রথম ধাপের খবর তোমরা জেনেছ। দেহে হাড় ছিল না বলে পৃথিবীর বুকে তারা কোন খবর রেখে যেতে পারেনি।

এর পরের ধাপে যারা, তারা এলো পৃথিবীতে সূর্যের আলো পড়বার পরে। পাহাড়ের গায়ে, পাথরে বা শক্ত মাটিতে আমরা এদের খোঁজ পাই। সূর্যের আলো, আর পৃথিবীর জল, এই ছিল এদের সম্বল। গুগ্‌লি গোছের ছোট ছোট পোকা, কাঁকড়া, আর এক রকম জলজ উদ্ভিদ,—এরাই ছিল তখনকার শ্রেষ্ঠ প্রাণী। তাদের দেহের শক্ত খোলগুলিই মাটির বুকে সাক্ষী রেখে গেছে। এরা-ও কিন্তু জল ছেড়ে উপরে উঠতে পারত না।

তৃতীয় ধাপ—এখানে এলে দেখা যায় যে আগের ধাপের প্রাণীদের অনেক উন্নতি হয়েছে। চেহারা হয়েছে অনেক বড়, আর দেহের খোলও হয়েছে অনেক শক্ত ও পুরু। প্রকাণ্ড বড় বড় কাঁকড়া, ইয়া-ইয়া গুগ্‌লি, আর আট দশ হাত লম্বা মাছ আর বিছা। তারাই ছিল তখনকার শ্রেষ্ঠ জীব।

হাজার হাজার বছর কেটে গেল, জলের মধ্যে আরও অনেক প্রাণী দেখা দিল। কিন্তু মজা হল, জল ছেড়ে এরা কেউ উঠতে পারত না ডাঙ্গায়। আর যদিও বা কখনও উঠে পড়ত, অমনি দম আট্‌কে মরে যেত।



জলের মধ্যে আরও অনেক প্রাণী দেখা দিল

আজও এমন অনেক জলের প্রাণী দেখা যায় যাদের ডাঙ্গায় তুল্‌লেই মারা যায়।

আমরাও কি জল ছাড়া বাঁচতে পরি? গাছপালা পশু-পাখীও কি পারে? তবে তফাৎ এই, মাঝে মাঝে জল খেলেই স্বচ্ছন্দে আমরা বেঁচে থাকি,—ওদের মত রাত-দিন জলে ডুবে থাকতে হয় না। এই যে জলের দাসত্ব ছাড়িয়ে জীব ডাঙ্গায় উঠল, এটাই হল জীবনের ক্রমবিকাশের সব চাইতে বড় কথা। এটা যদি না ঘটত তবে পৃথিবীতে আজ যা কিছু দেখছ—মানুষ, পশু-পাখী, পোকা মাকড়, গাছপালা, এ কিছুই থাকত না। এই পরিবর্তনটা যে কিভাবে ঘটল তা বলা কঠিন, তবে মনে হয়, এমনি হয়নি, হয়েছে দায়ে পড়ে। তাই বলছি।

চতুর্থ ধাপ—এ ধাপে প্রথম যারা উঠল, তারা হচ্ছে কচুরীপানা জাতীয় এক প্রকার জলজ উদ্ভিদ্। সমুদ্রের জোয়ার ভাটার সাথে এরা ওঠ-নামা করত। ভাঁটার

টানে জল যখন নেমে যেত,—এরা ডাঙ্গায় আট্‌কে শুকিয়ে মরত। এমনি করে কিন্তু বেশী দিন গেল না। বাঁচতে তো সবারই ইচ্ছে করে,—এদেরও করত। তাই জল যখন নেমে যেত, এরা থাকত মাটি কামড়ে। এই করে জল জমিয়ে রাখার মত ব্যবস্থা এদের দেহে আপনি গড়ে উঠল। তখন এদের আর কেবলই জলে ভেসে বেড়াতে হত না। ভিজে মাটি থেকে শিকড় দিয়ে জল শুষে নিত। এই করেই প্রাণী জল ছেড়ে ডাঙ্গায় উঠতে আরম্ভ করল। এ যেন মায়ের কোল ছেড়ে শিশুর প্রথম পদ-চারণা—হাঁটি-হাঁটি পা-পা। দেখতে দেখতে জলের কোল ঘেঁষে ডাঙ্গা গাছে গাছে ছেয়ে গেল। পোকা-মাকড়ও জল ছেড়ে ডাঙ্গা-মুখো হল। দেহে তাদের ফুস্‌ফুস্‌ জন্মাল, জলের চাইতে বাতাসের উপর বেশী নির্ভর করতে লাগল।

ব্যাঙের জীবনে এ জিনিসটা বেশ ভাল করে দেখতে পাবে।

ব্যাঙ ডিম পাড়ে জলে, ডাঙ্গায় ডিম শুকিয়ে যায় বলে। ঘন লালার মত একটা পদার্থের মধ্যে ডিমগুলি লুকোনো থাকে। কিছু দিন বাদে ডিম ফুটে বাচ্চা বার হয়,—সবাইর এক একটা লেজ। দেখতে ঠিক মাছের বাচ্চাদের মত। ওরা তখন ডাঙ্গায় উঠতে পারে না। মাছের মত জলে সাঁতার কেটে বেড়ায়,—ডাঙ্গায় তুল্‌লে আর বাঁচে না। কিছুদিন পরে দেখবে ব্যাঙের বাচ্চা ব্যাঙাচীর সেই লেজ-ও নেই, আর সে জলে-ও নেই। লেজ-কাটা ব্যাঙাচী তিড়িং-বিড়িং লাফিয়ে বেড়াচ্ছে ডাঙ্গায়। আর চেহারাও এমন পাল্‌টে গেছে

যে তাকে চেনাই দায়। এখন একে ধরে বেশ করে জলের মধ্যে চুবিয়ে রাখতো,—দেখবে সে মরে গেছে। দুদিন আগেও যে জল ছেড়ে উঠতে পারত না, আজ সে জলে ডুবে মরল!

তখনকার পৃথিবীতে যদি জন্মাতে, তবে দেখতে চারদিকে কেবল বন, বন আর বন। সেই বনের মধ্যে মস্ত মস্ত গাছগুলি সব ভূতের মত দাঁড়িয়ে। কোন সাড়া নেই, শব্দ নেই। সেই চুপ্-নিঃসাড় বনে রাক্ষুসে পোকাগুলি, কোনটা পত্ পত্ করে উড়ছে, কোনটা থপ্ থপ্ করে লাফাচ্ছে। হঠাৎ সাঁ সাঁ করে ঝড় ছুটে এলো, ভূতুড়ে গাছগুলি ভয়ে কেঁপে-কেঁপে উঠল,—তারপরে মড়মড় করে ভেঙ্গে-চুড়ে পড়ল। সমুদ্রের জল ফুঁসে-ফেঁপে, দারুন গর্জনে ডাঙ্গার গায়ে মাথা খুঁড়তে লাগল,—যেন ডাঙ্গাকে আর আস্ত রাখবে না-ভেঙ্গে খান্ খান্ করে গিলে নেবে! ভাবতে পার?

পঞ্চম ধাপ—প্রাণী তো জল ছেড়ে ডাঙ্গায় উঠল। কিন্তু ভরসা করে তখনও বেশী দূর এগুতে পারেনি, থাকত জলের কোল ঘেঁষে। কোন রকম বেকায়দা দেখলেই জলের মধ্যে দিত ঝাঁপ। এ যেন সদ্য-হাঁটতে-শেখা শিশুর দু'পা হেঁটেই মায়ের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়া। এ সময়টা কিন্তু বেশী দিন থাকে না, শিশুরও না, প্রাণীরও না। মাথা খাড়া করে শক্ত পায়ে শিশু যেমন ক্রমেই এগিয়ে চলে, তখনকার প্রাণীরাও তেমনি এগিয়ে চল্‌ল-একটা নতুন যুগ দেখা দিল,—সরীসৃপ যুগ।

সরীসৃপ তাদেরই বলে, যারা জলেও থাকে, ডাঙ্গায়ও থাকে। কিন্তু জলের চাইতে ডাঙ্গার দিকেই টান বেশী।

আগেকার প্রাণীদের মত এরাও ডিম পাড়ে, তবে জলে নয়, ডাঙ্গায়। এই ডিমের ব্যাপারেই একটা মস্তবড় তফাৎ দেখা দিল এ যুগে,—এদের ডিমের খোলসটা হল বেজায় শক্ত। কাজেই মাছ বা ব্যাঙের ডিমের মত এদের ডিমগুলির ডাঙ্গায় শুকিয়ে মরবার ভয় থাকল না। এক কথায় সরীসৃপ জাতটা সেই পর্যন্ত পৃথিবীর জীবদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হয়ে দাঁড়াল। জল ছেড়ে ডাঙ্গায় বেঁচে থাকতে হত বলে সেই মত হয়ে উঠল ওদের দেহের গড়ন। তারপরে যতই দিন গেল, ততই তারা উঁচু ডাঙ্গার দিকে এগুতে লাগল।

সাপ, গো সাপ, টিক্‌টিকি, গিরগিটি, কুমীর এরাই ঐ সরীসৃপ জাতের। তবে এখনকার জাত-ভাইদের দেখে তখনকার ওদের যদি আন্দাজ করতে যাও তো বিষম ঠকবে কিন্তু। বিরাট ছিল তাদের দেহ, একশো-দেড়শো ফুট, বা তারও বেশী। তাদের মাথা ছিল খুব ছোট। কারণ, এতটুকু মগজের জন্য বেশী বড় মাথার তো দরকার নেই! পেট ছিল খুব বড়,—কারণ একমাত্র কাজ যাদের শুধু খাওয়া আর খাওয়া, তাদের পেট বড় হবে বৈকি! আর লেজ ছিল যেমনি লম্বা, ঠ্যাং ছিল তেমনি ছোট। কিন্তু এই লেজ ও ঠ্যাং-এ জোর ছিল দারুণ। কতগুলি আবার লেজ আর পেছনের ঠ্যাং এ ভর করে সোজা খাড়া হয়ে দাঁড়াত। এটা শিখল কিন্তু ওরা দায়ে পড়ে। কারণ, রাত-দিন তো কেবলই খাই, খাই আর খাই। কিন্তু এত খাবার পাবে কোথায়? কাছে পিঠে যা ছিল, সব তো খেয়ে ফর্সা। হঠাৎ চোখে পড়ল, যা খেতে চাইছে তা রয়েছে

সেই উঁচু গাছের মগডালে। চলল চেষ্টা। চেষ্টা করতে করতে তারপরে একদিন সে শিখে গেল দাঁড়াতে। ঐ দেখ, ল্যাজ আর পেছনের ঠ্যাং-এ ভর করে সে সত্তর-আশি হাত উঁচু গাছের ডগা কেমন আরামে চিবুচ্ছে!



ঐ দেখ কেমন আরামে চিবুচ্ছে

আর একটা দল, তারা ছিল খানিকটা নীচু জাতের। দাঁড়িয়ে গাছের ডাল নাগাল পেত না, তাই

চেষ্টা চল্‌ল গাছে উঠবার। শিখেও গেল। তারা এ-গাছ থেকে ও-গাছে লাফিয়ে বেড়াত, আজকালকার কাঠবেড়ালীর মত। এই করে চেষ্টা চল্‌ল উড়তে। আস্তে আস্তে তাদের ডানা গজাল, তারা উড়তেও শিখল। কিন্তু তাদের ডানা ঠিক পাখীদের ডানার মত ছিল না; ছিল বাদুড়ের মত, পাতলা চামড়া দিয়ে আঙ্গুলের মত কয়েকটা হাড় জোড়া দেয়া। দেখতে ছোট হলেও এরা নেহাৎ ছোট ছিল না। একটা শকুনের চাইতেও দশ বিশ গুণ কিম্বা আরও বেশী বড়। গায়ে এদের পালক ছিল না, ঠোঁট ছিল খুব লম্বা, আর তার মধ্যে ছিল বড় বড় দাঁত। আর ছিল এদের বড় বড় লেজ, গোরুর লেজের চাইতেও লম্বা। এরই একটা দল শেষ পর্যন্ত পাখী হয়ে দাঁড়াল।

ষষ্ঠ ধাপ—শ্বাপদ যুগ। তারপরে আমরা এক নতুন যুগে এসে পড়লাম,—শ্বাপদ যুগ। এই যুগের জন্তু-জানোয়ারগুলি সরীসৃপদের চাইতে এতই আলাদা যে কিছুতেই বুঝে উঠতে পারি না, কি করে সরীসৃপদের পরেই এরা এলো! এই দুই যুগের প্রাণীদের মধ্যে স্বভাবে ও চেহারায় এতই তফাৎ, যে মনে হয় নিশ্চয়ই দুই যুগের মধ্যে অন্য কোন প্রাণী পৃথিবীতে এসে গেছে। পাথরের বই-এর সেই ছেঁড়া পাতাগুলি সন্ধান করে বেড়াচ্ছেন বিজ্ঞানীরা,—আজও তাদের খোঁজ মেলেনি। সেই ভীষণ-চেহারা সরীসৃপগুলি,—চার হাত লম্বা মাটির পোকা, আড়াই হাত টিকটিকি, সাড়ে তিন মণ ওজনের কচ্ছপ, আর আট ইঞ্চি ঠ্যাং-ওলা মাকড়, এরা কিভাবে যে পৃথিবীর বুক থেকে ধুয়ে মুছে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল,

বংশে বাতি দিতেও কাউকে রেখে গেল না, তা ভাবলে অবাক হতে হয়।

বাঘ, ভালুক, হাতী, ঘোড়া, শেয়াল, কুকুর প্রভৃতি জন্তুদের শ্বাপদ বলে। কিন্তু যে যুগের কথা বলছি, সে যুগের শ্বাপদদের চেহারা ছিল আজকের শ্বাপদদের চাইতে ঢের-ঢের বড়। এদের সাথে সরীসৃপদের চেহারা ও স্বভাব যে কতই-না তফাৎ, তা একটু নজর করলেই বুঝতে পারবে।

প্রথমতঃ– এরা পাক্কা ডাঙ্গার জানোয়ার। জলের সাথে এদের সম্পর্ক খুব কম।

দ্বিতীয়তঃ—এরা ডিম পাড়ে না। পাড়ে বাচ্ছা। আর তারা জন্মেই মায়ের দুধ খায়।

তৃতীয়তঃ– এরা জন্মাল গায়ে লোম নিয়ে। মনে রেখো, জীবদের গায়ে এই প্রথম লোম দেখা দিল, এবং জীবন-ক্রম-বিকাশের ইতিহাসে এটা বড় বড় করে লিখে রাখবার মত কথা। এটা যদি না ঘটত, তবে এরাও হয়তো সরীসৃপদের মত পৃথিবী থেকে লোপ পেয়ে যেত। কারণ, পৃথিবীর মেজাজ তখনও ঠাণ্ডা হয়নি। কখনও হঠাৎ ভীষণ গরম, কখনও বা এমন হাড়মজানো শীত পড়ত যাতে কম্বলের মত মোটা একটা কিছু গায়ে জড়ানো না থাকলে বেঁচে থাকা অসম্ভব হয়ে উঠত। শ্বাপদদের এই লোমের আবরণ তাদের বাঁচিয়ে রাখল, তাই তারা আবরণহীন সরীসৃপদের মত লুপ্ত হয়ে গেল না।

তারপরে শ্বাপদরা তাদের স্বভাবে একটা বৈশিষ্ট্য নিয়ে এলো, যা পৃথিবীর বুকে একেবারেই নতুন—

একেবারেই হঠাৎ,—বাৎসল্য। বাৎসল্য মানে, সন্তানের প্রতি স্নেহ-মমতা। টিক্‌টিকি তার বাচ্ছাদের দিকে ফিরেও চায় না, সাপ-ও না, সরীসৃপরা কেউ না। কিন্ত দেখ, গোরু তার বাচ্ছার জন্য কেমন করে। একটু দূরে সরে গেলে হাম্বা-হাম্বা করে ডাকে। কুকুরের কোল থেকে ছানা কেড়ে নিলে সে কেমন কেঁদে মরে। বেড়াল তার বাচ্ছা মুখে নিয়ে কেমন লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়ায়, পাছে তার বাচ্ছা কেউ নিয়ে নেয়! এ থেকে এই বোঝা যায়, ছেলে পুলে নিয়ে ঘর-কন্না গুছিয়ে বসবার ইচ্ছার অঙ্কুর জেগেছে জীব জগতে। যদিও এই ইচ্ছাটা খুব বেশীদিন টেঁকে না, বাচ্ছা বড় হলেই কেউ আর কারুর কথা ভাবে না, হয়তো ভুলে যায়, তবুও জীবনের ক্রম-বিকাশের ইতিহাসে এটা মস্ত বড় কথা। এই থেকেই বুঝতে পারি, জীবদের বুদ্ধিবিকাশ সুরু হয়েছে।

কী করে এই বুদ্ধি, যার আধার হল মন, কোথা থেকে এসে প্রাণের সাথে হাত মেলাল, সে রহস্য আজও অজানা রয়ে গেল।

এর পরের ইতিহাস, প্রাণ-মনের যুগল যাত্রার ইতিহাস। প্রাণ চলেছে, বুদ্ধি চালিয়ে নিচ্ছে। সে এক সুদীর্ঘ যাত্রার চমকপ্রদ কাহিনী। দেহের অন্তরে মন, আর মনের অন্তরে বুদ্ধি। সাগরের অতল-তলে মুক্তা, আর তার অন্তরে মুক্তা যেন! অতি ধীরে, অতি সন্তর্পণে এগিয়ে নিয়ে চলেছে দেহধারী প্রাণকে। যেন কানে কানে বলছে,—ধীরে চলো,—চলো সাবধানে,—পথ এখনও অনেক,—বিপদ রয়েছে ওৎ পেতে পথের কিনারে কিনারে। ভুল করলে চলবে না,—ক্লান্ত হলে চলবে

কেন? পথের শেষ তো ওই দেখা যায়—জয় তোমার অনিবার্য,—ভয় কী? আমি তো আছি!

এই দুস্তর যাত্রা শেষে একদিন প্রাণ এসে দাঁড়াল দেহের হাত ধরে পৃথিবীর বুকে। কী তার রূপ, কী তার ঐশ্বর্য্য, বুদ্ধিতে ঝলোমলো,—মানুষ, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সন্তান।

দশ

মানুষের কথা

পৃথিবীতে মানুষ-জন্মের সূচনা হয়েছিল মাত্র তিন লক্ষ বৎসর আগে। মাত্র তিন লক্ষ! মাত্র বৈকি! পৃথিবীর বয়স তো হল প্রায় দুশো' কোটি বৎসর, আর প্রথম প্রাণ এসেছিল প্রায় পঞ্চাশ কোটি বৎসর আগে। কাজেই 'মাত্র' বলব বৈকি!

শ্বাপদ-যুগ আর মানব-যুগের মধ্যে তফাৎ অনেক। পণ্ডিতগণ মনে করেন এই দুই যুগের ইতিহাসের মাঝের দু'-একটা পাতা হয়তো হারিয়ে গেছে। তাই খোঁজ চলেছে সেই হারানো পাতার। অবশ্য ডারউইন নামে মস্তবড় একজন পণ্ডিত বলেছেন যে, মানুষ এসেছে বানর জাতীয় প্রাণী থেকে! অর্থাৎ বানরের ক্রমবিকাশের পরিণতি নাকি মানুষ। এই অনুমানের পেছনে যুক্তিও রয়েছে অনেক। বানরের স্বভাব, চালচলন, হাবভাব যে মানুষের মতো এ কথা অস্বীকার করা যায় না। তবে ওদের সঙ্গে আমাদের মিল থাকলেও গরমিলও কম নয়। কাজেই ডারউইনের মতবাদ বিনা তর্কে গ্রহণ করা

চলে না। তবে এ কথা বলা যায়—শ্বপদ যুগের ধারা বয়েই মানুষ উঠে এসেছে। বুদ্ধি-বিকাশ ও বাৎসল্য, যে দুটি অতি ক্ষীণ ভাবে দেখা দিয়েছিল শ্বাপদদের মধ্যে, তারই চরম পরিণতি ঘটেছে মানুষে।

ডারউইন তাঁর মতবাদ প্রচার করলেন ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে, 'The Descent of Man' নামক বইতে। তাঁর মতবাদ প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীময় হৈচৈ পড়ে গেল। কেউ বিশ্বাস করলেন তাঁর কথা, কেউ করলেন না। আলোর পূজারীদের ভাগ্যে যা জোটে,—তাঁর ভাগ্যেও জুটল তাই,—অপমান আর নিন্দা। পুরোহিতরা তাঁকে তো একঘরেই করে রাখলেন। যাহোক, ইউরোপের অনেক বিজ্ঞানী লেগে গেলেন ডারউইনের সূত্র ধরে মানুষের পূর্ব-পুরুষদের সন্ধানে।

সে কি কম কথা? প্রথমতঃ, মাটির তলায় ছাড়া তো তাদের আর খোঁজ পাওয়া যাবে না! দ্বিতীয়তঃ, কোন্ দেশের কোন্ মাটির তলায়, কোথায় তারা ঘুমিয়ে আছে, তাও বা জানে কে? তৃতীয়তঃ, সেই পূর্ব-পুরুষরা একে তো সংখ্যায় ছিল খুব কম, তাতে সব মৃতদেহই তো আর ফসিল হয় না, হাজারে, বা তারো বেশীতে মাত্র দু-একটা হয়। কাজেই নানা রকম সমস্যা দেখা দিল। কিন্তু মানুষ তো দমবার নয়! এগিয়ে চল্‌লে তার চেষ্টা।

সেই চেষ্টার ফলে আজ পর্যন্ত বহু ফসিল পাওয়া গেছে পৃথিবীময় নানা দেশে,—নগরে, শহরে, গভীর অরণ্যে, দুর্গম পর্বতে,—জার্মানীতে, ইংলণ্ডে, চীনে, মালয়ে, জাভায়, ভারতেও। আরও কত বেরুবে কে জানে?

কিন্তু এত যে পাওয়া গেল, তাতে একখানা পুরো ইতিহাস লেখা আজও সম্ভব হল না। এ যেন বইএর কতগুলি ছেঁড়া পাতা, এলোমেলো ছড়িয়ে আছে। কোনটা আগে, কোনটা পরে, কে বা মধ্যে, তাই নিয়ে লেগেছে মহা ভাবনা। জোড়াতালি দিয়ে হয়তো দাঁড়াল এক রকম। পরেই যে খবর পাওয়া গেল, তাতে উল্‌টে গেল সব। হয়তো পাওয়া গেল একখানা চোয়াল। তারপরে অন্য জায়গায় দুটো দাঁত। আবার অনেক দূরে মাথার একটা খুলি। এখন চোয়াল যার, দাঁত তার কিনা, আবার চোয়াল আর দাঁত যার, খুলির মালিক সে কিনা, তাও-তো দেখতে হবে? কাজেই এই নিয়ে যাঁরা কাজ করছেন তাদের জ্ঞান, ধৈর্য্য ও শ্রমশীলতা যে কত অসীম, তা ভেবে দেখো। এখন বিজ্ঞানীরা লেগেছেন দু-রকম কাজে,—প্রথম হল, যা পাওয়া গেছে তাকে সাজিয়ে গুছিয়ে তোলা। তারপরে নতুন নতুন ফসিল খুঁজে গরমিল পূরণ করা। এইভাবে চলেছে তাঁদের কাজ। তবে আজ পর্যন্ত যতটুকু জানা গেছে তাতে ডারউইনের মতবাদ যে ঠিক, তা প্রায় প্রমাণ হতে চলেছে; অর্থাৎ পৃথিবীতে মানুষ হঠাৎ আসেনি, এসেছে বানর জাতীয় জীবের ধারা বেয়ে।

আগেই বলেছি যে পৃথিবীর নানা জায়গায় নানা রকম ফসিল পাওয়া গেছে। যা পাওয়া গেছে, তা থেকে এই বোঝা যায় যে তখনকার পথিবীর বিভিন্ন জায়গায় এরা ছড়িয়ে ছিল, এবং সেই সব জায়গার জল-বায়ুর দরুন তাদের চেহারাও হয়েছিল বিভিন্ন। কিন্তু তা সত্বেও বিজ্ঞানীরা সময় অনুসারে এই সব

মানুষের শ্রেণী বিভাগ করতে সমর্থ হয়েছেন। সেই কথাই বলছি।

পরীক্ষা করে দেখা গেছে বানর ও মানুষের মধ্যে আর একটা ধাপ ছিল, যাদের নাম দেওয়া হয়েছে হিডেল্‌বুর্গ মানুষ। চল্‌তি কথায় এদের বলতে পারি 'আধ-মানুষ'। 'হিডেল্‌বুর্গ মানুষ' কিন্তু কোনো বিশেষ জাতের মানুষের নাম নয়। হিডেল্‌বুর্গ হল জার্মাণীর একটা জায়গার নাম। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে সেখানে একটা খনি খুঁড়বার সময় চোয়ালের একখানা ফসিল পাওয়া যায়। অনেক রকম বিচার করে বিজ্ঞানীরা স্থির করলেন সে এই চোয়ালের মালিক ছিল বনমানুষ আর মানুষের মাঝামাঝি এক রকম জীব; এবং এরাই হল মানুষের সর্ব-পুরাতন পূর্বপুরুষ। হিডেল্‌বুর্গে চোয়ালটি পাওয়া গিয়েছিল বলে এর নাম দেওয়া হল 'হিডেল্‌বুর্গ মানুষ।'

এরা সংখ্যায় এত কম ছিল, আর শ্বাপদদের ভয়ে এত গভীর অরণ্যে ঘুরে বেড়াত, যে আমাদের জন্য পাথরের গায়ে খুব কম চিহ্নই রেখে গেছে। তবে যে দু'একটা ফসিল পাওয়া গেছে, তা থেকে এদের চেহারা খানিকটা অনুমান করা যেতে পারে।

এই মানুষেরা ঠিক মানুষও ছিল না, ঠিক বানর-ও ছিল না,—ছিল মাঝামাঝি এক রকম। এরা দেখতে ছিল প্রকাণ্ড বড় বানরের মত, তবে লেজ ছিল না, এই যা! এরা গাছে উঠতে পারত না। গায়ে ছিল

বড় বড় লোম, আর মুখের মধ্যে ছিল মূলোর মত দাঁত। এদের কপাল ছিল খুব ছোট, পেছন দিকে চাপা, আর মুখের নীচের দিকটা ছিল ঝুলোনো, কিন্তু থুত্‌নি ছিল না একদম। এরা



কিন্তু আমাদেরই মত পায়ে চলে বেড়াত। তবে ঘাড় তুলে মুখ সোজা করে চলতে পারত না। কারণ, এদের ঘাড় ছিল খুব বেঁটে আর মোটা। এরা কথা বলতে পারত না। এরা গভীর জঙ্গলে ঘুরে বেড়াত। জঙ্গলে যে সব জায়গায় ভীষণ-চেহারাওলা শ্বাপদরা থাকত, তার ধারও এরা মাড়াত না। কারণ, এরাই ছিল সেই দুনিয়ার সব চাইতে দুর্বল প্রাণী। কতকাল এরা পৃথিবীতে ছিল বলা যায় না। একদিন দেখা গেল এরা সব নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

যাবে ছাড়া কী? তখনকার পৃথিবীর অবস্থা তো ছিল অতি ভয়ংকর। শুধু বরফ, বরফ, আর বরফ। এই বরফ-ঢাকা পৃথিবীর দারুণ শীতের মধ্যে বেচারাদের বেঁচে থাকতে হত। এখনকার পৃথিবীর মানচিত্র দেখে তখনকার পৃথিবীর চেহারা যে কি ছিল তার কোন ধারণাই করতে পারবে না। ক্রমাগত ভেঙেচুড়ে ফেটে-ফুটে আজ পৃথিবীর চেহারা এমন হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং জলবায়ুর এত পরিবর্তন ঘটেছে, যে আমরা যারা আজ পৃথিবীতে বাস করছি, তাদের পক্ষে সেদিনের পৃথিবীর অবস্থা বুঝে ওঠা বড়ই দায়। তবুও বিজ্ঞানীরা অনেক খেটে খুটে তখনকার একটা মোটামুটি ছবি আমাদের জন্য

এঁকেছেন।

তাঁরা মনে করেন, আজ যেখানে হিমালয় মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে, সেখানে এক বিশাল সমুদ্র ছিল। টেথিস তার নাম। হিমালয়ের গায়ে কতগুলি সামুদ্রিক জীবের ফসিল পাওয়া গেছে কিনা, তাই থেকে তাঁরা এই অনুমান করেছেন। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে কানসাস নামে একটা জায়গা আছে। সেখানে ১৪ ফুট লম্বা একটা মাছের ফসিল পাওয়া গেছে। তার পেটের মধ্যে আবার ছ'ফুট একটা মাছের ফসিল। বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন যে এই মাছটার বয়স প্রায় ন' কোটি বছর। কাজেই প্রমাণ হয় যে ন'কোটি বছরেরও আগে থেকে এখানে প্রকাণ্ড একটা সমুদ্র ছিল। সেই সমুদ্র আবার সাত কোটি বছর আগে শুকিয়ে গিয়ে ডাঙ্গা হয়ে গেছে। সেই জায়গাটাই আজকের কানসাস্। আবার দেখ, গ্রীষ্ম-প্রধান দেশে এমন সব গাছপালার ফসিল পাওয়া গেছে, যা নাকি শীতের দেশ ছাড়া জন্মাতেই পারে না। কাজেই মনে হয় একদিন ওইসব দেশ বরফে ঢাকা ছিল। এখন জল-বায়ু পাল্‌টে গেছে। আবার সাইবেরিয়ার বরফ-ঢাকা অঞ্চলে বিরাট-দেহ এমন সব জন্তুর ফসিল পাওয়া গেছে,—যার মাংস, চামড়া, লোম, রক্ত এমন কি মুখের কচি ঘাস-কটিও নষ্ট হয়নি। কিন্তু বরফের মধ্যে তো ঘাস জন্মায় না। তবে ঘাস এলো কোথা থেকে? মনে হয়, একসময় ঐসব দেশ মোটেই বরফ-ঢাকা ছিল না, কাজেই ঘাসও জন্মাত। তারপরে কোনো দিন, কোনো এক সময়, কিভাবে হঠাৎ নেমে এলো বরফ। আজও

রয়েছে· সেই বরফ। যে সব জন্তু মাঠে ঘুরে বেড়াচ্ছিল সে সময়, পড়ল তারা চাপা এবং বরফের ঠাণ্ডায় তাদের মৃতদেহ যেমনটি ছিল, বহু-বহু কাল পরে ঠিক তেমনটিই রয়ে গেল। পচেনি বা নষ্টও হয়নি এতটুকু।

আর একটি ঘটনা বলি।

বহু কাল আগে মধ্য-এশিয়ার কোন এক জায়গায় নল-খাগড়া ঘেরা প্রকাণ্ড এক জলাভূমি ছিল। 'ম্যাষ্টডন্' [Mastodon] নামে বড় বড় লোমওলা হাতীর দল সেখানে চরে বেড়াত। তারপরে হঠাৎ তার জল শুকোতে লাগল। আর তার ফলে নল-খাগড়া চল্‌ল মরে। হাতীরা করে কি? জল যতই পিছোয়, তারা ততই এগোয়। এই করে দল বেঁধে তারা এসে পড়ল কাদার মধ্যে! একে তো কাদা, তায় আবার হাতী! দল বেঁধে তারা ডুবে গেল কাদার মধ্যে। রয়ে গেল চিরদিনের মত সেখানে। এ রকম বহু ম্যাষ্টডনের ফসিল বিজ্ঞানীরা খুঁজে পেয়েছেন সেখানে। পাথরের বই-এর আর একটা পাতা বেড়ে গেল।

কাজেই দেখতে পাচ্ছ, সেদিনের সেই ভীষণ খাম-খেয়ালী পৃথিবীর বুকে কত না কষ্টে বেঁচে ছিল আমাদের সেই প্রথম পূর্বপুরুষ। যেখানটায় শীত ছিল কম, আর ভয় ছিল না বেশী, সেখানেই তারা দল বেঁধে থাকত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত টিঁকতে পারল না। সম্ভবতঃ কোনো বিরাট দুর্ঘটনায় একদিন তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। পৃথিবীর এই সময়টাকে বলে তুষার যুগ।



প্রায়-মানুষ (Neanderthal Man)—হাজার হাজার বছর কেটে গেল। পৃথিবীতে একদল নতুন মানুষ দেখা দিল। এদের আমরা 'প্রায়-মানুষ' বলব। বিজ্ঞানীর ভাষায় নিয়ান্‌ডারথাল্ ম্যান্। নিয়ান্‌ডারথাল্ ম্যান্ বলতেও কিন্তু কোন একটা বিশেষ জাতির মানুষ বুঝায় না। জার্মানীর নিয়ান্‌ডারথাল্ নামে একটা জায়গায় সর্বপ্রথম এদের কঙ্কাল পাওয়া গিয়েছিল বলেই এই নাম,— যেমন হিডেল্‌বুর্গ ম্যান্। এদের ফসিল পরীক্ষা করে বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন যে হিডেল্‌বুর্গ মানুষদের পরেই এরা পৃথিবীতে এসেছিল। দেখতে শুনতে এরা আধ-মানুষদের চাইতে খানিকটা ভাল হলেও, আমাদের চাইতে ছিল ঢের খারাপ। এদের গায়েও বড় বড় লোম ছিল। কপাল ও থুত্‌নি আধ-মানুষদের চাইতে একটু উঁচু হলেও আমাদের তুলনায় ঢের থ্যাবড়া! এরা কথা বলতে পারত কিনা জানা যায়নি। কিন্তু বুদ্ধিতে এরা অনেক এগিয়ে গিয়েছিল। এরা মৃতদেহ কবর দিত। জন্তু-জানোয়ারদের ভয়ে এরা লুকিয়ে বেড়াত না। পাথর ঘষে অস্ত্র বানিয়ে লড়াই করত তাদের সঙ্গে। এরা থাকত পাহাড়ের গুহায়, জঙ্গলে নয়। এরাই প্রথম আগুন জ্বালাতে শিখল—পাথরে পাথর ঠুকে। আর দিনের পর দিন সেই আগুন জিইয়ে রাখত গুহার মধ্যে। আগুন দেখলে জন্তুরা ভয় পায় কিনা, তাই। যে সব জন্তু জানোয়ার এরা শিকার

করত, তাদের চামড়া শুকিয়ে কাপড়ের কাজ চালাত। আর মাংসগুলি খেত। শুধু মাংস নয়, পোকা-মাকড়, ফল-মূল যা পেত হাতের কাছে, তাই খেত। রান্না করে খেতে তখনও শেখেনি। খেত সব কাঁচা।

তারপরে, এরা ঘর-সংসার গুছিয়ে বসতে সুরু করল। সংসারে থাকত একজন পুরুষ আর জনকয়েক নারী। আর থাকত ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা। ঘরে পুরুষই ছিল সর্বেসর্বা, সবাইর দণ্ড-মুণ্ডের বিধাতা! সে যাকে খুশি মারত, যাকে খুশি তাড়িয়ে দিত, আবার যাকে খুশি রাখত। ছেলে বড় হয়ে উঠে হয়তো আলাদা হয়ে যেত, নয়তো বাপকে তাড়িয়ে বা মেরে সংসারের কর্তা হয়ে বসত! দয়া-মায়া, ভক্তি-ভালবাসা কিছুই এদের ছিল না। জোর যার মল্লুক তার, এই ছিল তাদের নীতি! কিন্তু এমনি মারামারি হানাহানি করে তো দিন চলে না। চল্লোওনা। ক্রমেই সংখ্যায় কমতে কমতে একদিন এরাও পৃথিবী থেকে লোপ পেয়ে গেল। প্রায় লক্ষাধিক বৎসর এরা পৃথিবীতে টিঁকে ছিল। এরাই সবাইর প্রথমে পাথরের ব্যবহার সুরু করল বলে এই সময়টাকে প্রস্তর-যুগ বলা হয়।

আদি-মানুষ (Palæolithic Man)—এর পরে যারা এলো তাদের বলা হয় প্যালিওলিথিক্ ম্যান। এরাও প্রস্তর-যুগের মানুষ। এদের বলা যাক 'আদি-মানুষ'। আধ-মানুষ আর প্রায়-মানুষদের চেহারাতে যে বানর-ভাব, আর বুদ্ধিতে

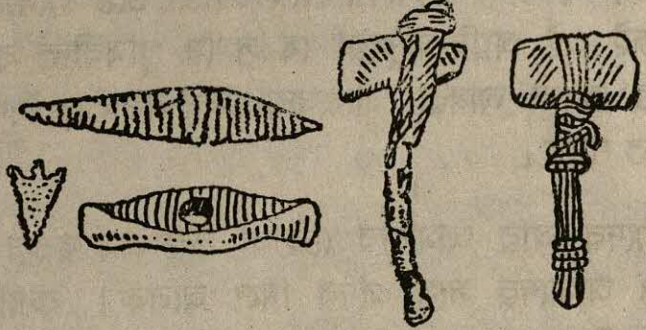


যে মোটা-ভাবটা ছিল, এরা তা একদম কাটিয়ে উঠল। চেহারা ও বুদ্ধিতে এরা আধ বা প্রায়-মানুষদের অনেক উপরে উঠে গিয়েছিল। আজকালকার মানুষ আমরা, এই আদি-মানুষদের থেকে সোজা উঠে এসেছি। কাজেই এই আদি-মানুষরা যে সময়ে পৃথিবীতে বাস করত তাকে আমরা আজকের মানব-সভ্যতার শৈশব বলতে পারি।

এদের আর আমাদের চেহারা ঠিক এক রকম না হলেও আমাদের সঙ্গে এদের মিল অনেক। কপাল, যত্‌নি ঠিক আমাদের মত না হলেও, অনেকটা উঁচু হয়ে উঠেছিল, আর ঘাড়ও হয়ে উঠেছিল সরু আর লম্বা। এরা মাথায় ছিল প্রায়-মানুষদের চাইতে ঢের উঁচু, আর মুখের ঢং প্রায় মানুষদের মত গোল না হয়ে হয়েছিল লম্বা গোছের। পাথর দিয়ে খুব সুন্দর অস্ত্র এরা বানাতে পারত। বড় বড় জন্তু-জানোয়ারদের সঙ্গে লড়াই করে এরা তাদের মেরে ফেলত। আধ বা প্রায়-মানুষদের মত জন্তুদের আর ভয় করত না। এদের আরও অনেক গুণ ছিল। এরা খব সুন্দর ছবি আঁকতে আর খোদাই করতে পারত। গুহার গায়ে যে সমস্ত ছবি এরা এঁকে রেখে গিয়েছে, এবং হরিণের শিং এর উপরে ও পাথরের গায়ে যেসব সুন্দর মূর্তি খোদাই করে রেখে গিয়েছে তা দেখে প্রশ্ন জাগে,—এরা এ সব শিখল কোথায়? ছুঁচের ব্যবহারও এরা জানত, এবং হাড়ের ছুঁচ দিয়ে কাপড়-চোপড় শেলাই করত।

তবে এও ঠিক, যে অনেক কিছুই এরা তখনও

শিখে উঠতে পারেনি। তার মধ্যে প্রধান হল ঘর-বাড়ি তৈরী। বাসন তৈরী ও রান্নার কাজও এরা জানত না। কাজেই আমাদের তুলনায় এরা অনেক অসভ্য ছিল।



পাথর দিয়ে সুন্দর অস্ত্র বানাতে পারত

এই মানুষের দল পঁচিশ হাজার বছর পৃথিবীতে প্রভুত্ব করে গিয়েছে। কিন্তু একদিন কোথা থেকে এক দল নতুন মানুষ এসে জুটলো, এবং এদের হটিয়ে দিয়ে প্রভুত্ব কেড়ে নিল। এই নতুন মানুষদের আগমনের সঙ্গে পৃথিবীতে যে যুগ সুরু হল, তাকে বলা হয় নতুন প্রস্তর যুগ। এটা ঘটে ছিল আজ থেকে প্রায় দশ হাজার বছর আগে। লক্ষ্য রেখ, ক্রমশঃই আমরা লাখ লাখ বছরের হিসেব পেছনে রেখে হাজারের কোঠায় এসে পৌঁছচ্ছি। ক্রমশঃই আমাদের হারিয়ে-যাওয়া বহু দূরের পূর্বপুরুষরা আমাদের কাছের মানুষ হয়ে উঠ্ছে।



খাঁটি-মানুষ—(Neolithic Man —এই নতুনের দলকে 'খাঁটি-মানুষ' বা নেওলেথিক্ ম্যান্ বলব। বুদ্ধি ও চেহারায় এরা আদি-মানুষদের অনেক পেছনে ফেলে এসেছিল। এদের ও আমাদের মধ্যে শুধু সময়ের তফাৎ ছাড়া আর

বিশেষ কোন তফাৎ নেই। ইতিমধ্যে পৃথিবীর অবস্থার অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। পৃথিবী অনেক উষ্ণ হয়ে উঠেছে, এবং তার ফলে বরফ গলতে সুরু করেছে। কাজেই এই নতুন মানুষরা আর এক জায়গায় বসে রইল না,—নানা দিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল, পৃথিবীর নানা দেশে। বেঁচে থাকবার জন্য চলল তাদের প্রাণপণ চেষ্টা। এইভাবে সভ্যতার যাত্রা সুরু হল পৃথিবীতে। নানাদেশে নানারকম জলবায়ুতে তারা বাস করতে লাগল,—নানা অবস্থার মধ্যে। ফলে এক এক দেশের লোকদের চেহারা, স্বভাব, চালচলন এক এক রকম হয়ে উঠল। এইভাবে এক বহু হল, এক জাতির মানুষ বহু জাতিতে পরিণত হল।

এই মানুষদের চেহারা ছিল সুন্দর, কপাল উঁচু, উঁচু থুত্‌নি, পাতলা উঁচু নাক, লম্বা সরু ঘাড়। এ ছাড়া, এদের গায়ের লোমও অনেক কমে এসেছিল। এক কথায়, দেহের যে গড়নকে আমরা সুন্দর গড়ন বলি, এদের তা ছিল। অস্ত্র তৈরীর ব্যাপারেও এরা এগিয়ে গিয়েছিল অনেক, আর এরাই প্রথম গুহা-ছেড়ে ঘর-বাড়ি তৈরী করে বসবাস সুরু করল। কখনো কখনো এরা জলা জায়গায় বা হ্রদের উপরে ঘর বানিয়ে বাস করত—বোধ হয় জানোয়ারদের আক্রমণ থেকে বাঁচবার জন্য। এ রকম অনেক ঘর-বাড়ির খোঁজ



পাওয়া গেছে। শুক্‌নো হ্রদ'বা শুক্‌নো জলার তলায় এদের তৈরী অনেক সুন্দর সুন্দর বাসন-পত্র ও অস্ত্র-শস্ত্র পাওয়া গেছে। এক সময় এইসব জায়গায় এই মানুষেরা থাকত। ভূমধ্যসাগরের কাছাকাছি দেশগুলিতে এবং সুইট্‌জারল্যাণ্ডে এখনও এরকম ঘরদোর দেখা যায়।

যতই দিন যেতে লাগল ততই এঁদের উন্নতি হতে লাগল। এরা শিকার ছেড়ে চাষ-আবাদ ধরল। ক্রমে গোরু, ঘোড়া, কুকুর, এইসব ধরে ধরে পোষ মানিয়ে এরা নিজেদের কাজে লাগাল। লক্ষ্য কর, পশু-নির্বাচন বিষয়েও এরা যথেষ্ট বুদ্ধি-বিবেচনার পরিচয় দিয়েছিল। বাঘ-ভালুক-হাতী এইসব ধরে পোষ মানাবার চেষ্টা না করে, এরা নজর দিল গোরু-ঘোড়া-কুকুর প্রভৃতির দিকে। অবশ্য তখনকার গোরু-ঘোড়া-কুকুর তাদের আজকের জাঁত-ভাইদের মত মোটেই ছিল না। ছিল অনেক বুনো, অনেক হিংস্র এবং চেহারাও ছিল অন্য রকম। তবুও দেখ, কি করে যেন এই মানুষরা বুঝতে পেরেছিল যে, বনে যত জন্তু আছে তার মধ্যে এরাই শেষ পর্যন্ত মানুষের সবচাইতে বেশী কাজে লাগবে। তাদের বিচারে যে ভুল হয়নি, তা বোধ হয় বুঝতে পাচ্ছো।

খেয়াল রেখ, পৃথিবীতে এই কিন্তু প্রথম চাষ-আবাদ সুরু হল। এর আগে যাদের দেখেছ, তারা তো শুধুই শিকার করত। মানুষ আজ পর্যন্ত যত কিছু আবিষ্কার করেছে, তার মধ্যে চাষ-আবাদই হল শ্রেষ্ঠ। এর ফলে কি হল? এই নতুন মানুষদের আর দিন-ভোর শিকারের খোঁজে বনে-বাদাড়ে ঘুরে বেড়াতে হল না;

চাষের ফসল ঘরে তুলে ধীরে সুস্থে নিঃশ্চিন্তে বসে খাবার সুযোগ পেল। জীবনের বিপদ ও ঝুঁকি কমে গেল। কারণ, শিকারে গিয়ে জন্তু-জানোয়ারদের হাতে তো অনেকেরই প্রাণ যেত। এইভাবে তাদের জীবনে অবসর ও বিশ্রাম এলো। দেহের কাজ কমল বটে, কিন্তু মাথার কাজ সুরু হল। তারা নানাদিকে বুদ্ধি ও মাথা খাটাতে লাগল। তারা জীবনকে আরও সহজ, আরও সুন্দর করে গড়ে তুলবার সাধনায় লেগে গেল।

গোরুর দুধও এরা খেত, কাঁচা পচা কিছুই খেত না। এরা রান্না করতে জানত। গাছের ছালে কাপড় বানিয়ে তাই এরা পরত।

ধীরে ধীরে ধাতুর ব্যবহারও এরা শিখে ফেল্‌ল। বন-বাদাড়ে, পাহাড়-পর্বতে ঘুরে ঘুরে হঠাৎ একদিন সোনা আবিষ্কার করে ফেল্‌ল। সোনার রূপ দেখে তারা আমাদের মতোই মুগ্ধ হয়েছিল, হয়তো হয়েছিল আরো বেশী। ক্রমে সোনা গালিয়ে পছন্দসই গয়না বানানোর বিদ্যেটাও এরা শিখে ফেল্‌ল। আবিষ্কারের নেশা এদের আরও এগিয়ে নিয়ে চল্‌ল। একটার পরে একটা নতুন ধাতু এরা খুঁজে বের করতে লাগল। শুধু খুঁজে বের করেই থামল না, তাদের ব্যবহারও শিখে ফেল্‌ল। অবাক্ হয়ে যেতে হয়, যখন দেখি সেই দশ হাজার বছর আগে এরা তামা ও টিন মিশিয়ে কাঁসা বানিয়ে ফেল্‌ল, আর তা দিয়ে তৈরী করল তাদের যুদ্ধের অস্ত্র! এইভাবে মানুষ প্রথম ধাতুর ব্যবহার শিখল। ধাতু আমাদের কি কাজে লাগে তা তোমরা নিশ্চয়ই জান। এমন খুব কম ব্যবহারের

জিনিসই আছে যাতে কোন না-কোন ভাবে ধাতুর দরকার হয় না। এই ধাতুর ব্যবহারই মানব সভ্যতাকে আজ এতদূর এগিয়ে এনেছে।

খাঁটী মানুষেরা পূজা-অর্চনাও করত। যত সব অদ্ভুত ও কিম্ভূত চেহারার পুতুল ছিল এদের উপাস্য। মোট কথা, ভয় আর বিস্ময় থেকেই প্রথম ভক্তি জন্মাল মানুষের মনে। যখন সে দেখল, অস্ত্র দিয়ে জানোয়ার মারা যায়, কিন্তু ঝড় যখন আসে আকাশ ভেঙ্গে, বাজ যখন ফেটে পড়ে পাঁজর কাঁপিয়ে, বান যখন ছুটে আসে দুকূল ছাপিয়ে, তাকে তো ঠেকানো যায় না। পারা যায় না তো সূর্যের আলোকে কমিয়ে দিতে, বা চাঁদের আলোকে বাড়িয়ে দিতে। তখনই তার আদিম মনে জেগে উঠল ভয়। এ ভয় গুহার মুখে হাতী-দেখা ভয় নয়। এই ভয়ের পেছনে সে কল্পনা করল এমন এক শত্রু, যাকে কাবু করা যায় না তার অস্ত্র দিয়ে। কারণ, সে শত্রু তো তার নাগালের বাইরে; দেখা যায় না, ধরা যায় না, ছোঁয়া যায় না। তখনই আদিম-মানুষ এই অদৃশ্য শত্রু বা শক্তির কাছে হার মানল, আর মাথা নোয়াল। নানা রূপে তাকে কল্পনা করে, নানা ভাবে তুষ্ট করতে চাইল। সে চেষ্টার আজও কি শেষ আছে? তাইতো আজও মানুষ বলছে,—'রুদ্র যত্তে দক্ষিণমুখং তেন মাং পাহি নিত্যং'—(হে রুদ্র, তোমার যে প্রসন্ন মুখ তা দিয়ে আমায় রক্ষা করো। এই হল মানুষের ধর্ম-বিশ্বাসের গোড়ার কথা, পূজা-প্রণালীরও বটে। সে অনেক কথা, যত বড় হবে, ততই বুঝবে,—এখন থাক।

এমনি করে কত না আপদ-বিপদ, ঝড়-ঝঞ্ঝা, দুঃখ-সুখ, হাসি-কান্নার ভেতর দিয়ে দিনের পর দিন, বছরের পর বছর কেটে গেলো। মানুষের বুদ্ধি ক্রমেই এগিয়ে চল্‌লো। আজ মানুষের বুদ্ধির কাছে 'অসম্ভব' বলে কিছুই নেই। সে চাঁদের বুকে তার পায়ের ছাপ রেখে এসেছে, সেখানকার নুড়ি কুড়িয়ে এনেছে, শুক্র ও মঙ্গল গ্রহে বেতারযন্ত্র পাঠিয়েছে, সেখান থেকে তারা গ্রহ-নক্ষত্রের নাড়ি-নক্ষত্রের খবর পাঠাচ্ছে পৃথিবীতে অবিরত; ভীষণ সমুদ্রে ডুবে মণি-মুক্তা তুলে আনছে, জ্ঞানের খোঁজে আগ্নেয়গিরির গর্ভে নামছে। আজ সে মৃতকেও প্রাণ দেবে বলে স্পর্ধায় বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়েছে। মানুষের বুদ্ধির জয়যাত্রা আর কত দূর এগুবে, কে জানে?

এই যুগের শেষের দিকে পৃথিবীতে এমন একটা ভয়ংকর ঘটনা ঘটেছিলো যার তুলনা পাওয়া ভার। আজ যেখানে ভূমধ্যসাগর ও লোহিতসাগর দেখছ, সেখানে নাকি আগে কোন সমুদ্রই ছিল না। ওখানটায় ছিল কতগুলো হ্রদ। এবং সেই হ্রদের উপরে বহুলোক বসবাস করত। তারপরে হঠাৎ একদিন পৃথিবী উঠল কেঁপে। ফেটে ফুটে চৌচির হয়ে ইউরোপ আর আফ্রিকার সংযোগ স্থল, যাকে আমরা এখন জিব্রালটার বলি, সেখানটা গেল উড়ে। আর যেই না উড়ে যাওয়া, অমনি আটলান্টিক মহাসমুদ্রের জল এসে হু-হু করে ঢুকে পড়ল তার মধ্যে। কি ভয়ঙ্কর কাণ্ডটাই না ঘটল! কত লোক যে মারা গেল, কত লোক যে ভেসে গেল জলে, ভাবলেও যে গায়ে দেবে কাঁটা! এই ভাবেই নাকি সৃষ্টি হয়েছিল ভূমধ্যসাগর আর লোহিতসাগর। বিস্মৃতযুগের

সেই নিদারুণ বিপর্যয় মানুষের মনকে এমনই নাড়া দিয়েছিল, যে যুগ যুগ ধরে এই কাহিনী মানুষের মুখে মুখে চলে চলে, অবশেষে স্থান পেল হিন্দুশাস্ত্রে, এবং তারও অনেক পরে, য়িহুদি ও খৃষ্টানদের ধর্মগ্রন্থ, বাইবেলে। বাইবেলের নোয়ার নৌকার গল্প তোমরা বোধ হয় অনেকে পড়েছ। সেটা এই মহাপ্রলয়েরই কাহিনী।

এগার

শেষের কথা

আমার কথাটি ফুরোলো, নটে গাছটি তবু মুড়োলো না তো!

আর একটু শোনো,—একটু—কেমন?

লঙ্কার রাজা রাবণের নাকি সাধ হয়েছিল স্বর্গে উঠবার সিঁড়ি বানাবেন। এমন সাধ যে কেন হয়েছিল, জানা যায় নি। তবে সাধ হয়েছিল।

রাজা মানুষ, চট্ করে কি কিছু হয়? কুঁড়েমি, ঢিলেমি, এই নানা সাত-পাঁচ করতে করতে শেষটায় রামের সঙ্গে লেগে গেল যুদ্ধ। আর সেই যুদ্ধেই অকালে তার প্রাণটি গেল। সিঁড়ির মনে সিঁড়ি পড়ে রইল,— তা আর হয়ে উঠল না।

গল্পের রাবণ যা করে উঠতে পারেন নি, তা কিন্তু অবশেষে রূপ পেতে চলেছে একদল মানুষের হাতে। রাবণের সাথে তাঁদের সম্পর্কটা কি জানিনে, কিন্তু কল্পনা জগতে তাঁরা তাঁর সগোত্র। তাঁরা বিজ্ঞানী।

আদিম মানুষের সবচাইতে বেশী ভয় ও বিস্ময়ের বস্তু ছিল আকাশ, তা তোমরা শুনেছ। এই আকাশের

দিকে তাকিয়ে, তার বিচিত্র রূপ দেখে তাদের আদিম মনে কত না কল্পনার ছবি, কত প্রশ্ন, কত না জিজ্ঞাসা জেগে উঠত। সেই দিন থেকে সুরু হয়ে ছিল মানুষের স্বর্গের সিঁড়ি রচনা—আকাশ জয়ের সাধনা। তা আজও চলেছে। আজকের মানুষ বার বার চাঁদে গিয়ে তার খবর জোগাড় করেছে, চাঁদের নুড়ি পাথর কুড়িয়ে থলে ভরে নিয়ে ফিরে এসেছে পৃথিবীতে, শুক্র ও মঙ্গল গ্রহে তার বৈজ্ঞানিক যন্ত্র পাঠিয়েছে। সেখান থেকে অবিরত খবর আসছে পৃথিবীতে। এসব খবর তো তোমরা রাখো। বস্তুতঃ আকাশের দিকে তাকিয়ে মানুষের মনে যে আদিম প্রশ্ন একদিন জেগেছিল, তা থেকেই সুরু হয় মানুষের সকল রকম জ্ঞানের সাধনা। বিজ্ঞান-চর্চ্চার মূলও ওখানে। আকাশ আজ পৃথিবীর বড়ো কাছে এসে পড়েছে। স্বর্গের সিঁড়ি মাথা উঁচিয়েই চলেছে। স্বর্গ প্রায় ধর ধর।

তোমরা দেখেছ, পরমাণুতে গড়া এই বিশ্ব-সংসার কিরকম একটা নিয়ম শৃঙ্খলে বাঁধা; আকাশের নীহারিকা থেকে পৃথিবীর ধূলিকণা পর্যন্ত। এই বাঁধন কেটে ছুটে বেরয় সাধ্য কার? আবার সব জিনিসেরই মূল উপাদান এক। কিন্তু এক হওয়া সত্বেও বিশ্বময় কত না বৈচিত্র, কত না বিভিন্নতা! কোন দু'টি জিনিস ঠিক একই রকম, এ তুমি কিছুতেই দেখাতে পারবে না,—না দু'টি তারা, না দু'টি গ্রহ, না দু'টি গাছ, না একই গাছের দু'টি ফুল বা ফল, না একই পিতা-মাতার দু'টি সন্তান; কিছু না কিছু বিভিন্নতা থাকবেই থাকবে। এটাই হল সৃষ্টির পরম বিস্ময়! অথচ দেখ,

সব কথার শেষ কথা হল, ঐ অতিপরমাণু দিয়ে গড়া গুটি কয়েক পরমাণু, দশ-কোটির ঠাসাঠাসিতে যার এক ইঞ্চির পরিমাপ মাত্র!

সৃষ্টির প্রথম দিকে আমরা দেখেছিলাম বিশ্বময় শুধু একটি মাত্র বস্তুর প্রকাশ। সে হল তেজ বা জ্যোতি। বলা যাক, মহাজ্যোতি বা আদি-জ্যোতি, কারখানার সর্বপ্রথম বস্তু যেমন চুলোর আগুন। সেই মহাজ্যোতিই কালক্রমে রূপ পেল তেজোগর্ভ ঘূর্ণমান নীহারিকায়। কতকাল জানিনে, করণ, সে 'কাল' মানুষের হিসাব মানে না, চলেছিল এই পুঞ্জীভূত জ্যোতির মহাখেলা অনন্ত আকাশে। তারপরে, একদিন কবে ছিট্‌কে বেরুল তার ভেতর থেকে খণ্ড খণ্ড তেজ-স্তূপ নক্ষত্রের রূপ নিয়ে। তেজের কি লেলিহান দাবানল জেগে উঠেছিল সেই দিন আকাশের বুকে।

তারপরে এলো গ্রহ,—নক্ষত্রের দেহ-খসা সন্তানের দল। সেই দিন কে জানত, নক্ষত্রের অতি ক্ষুদ্র একটি ভগ্নাংশ একদা কী এক পরামাশ্চর্য উপায়ে রূপ-রস-গন্ধে ভরা এমন সুন্দর পৃথিবী হয়ে দাঁড়াবে?

আদি-জ্যোতি কি এই পরিণতির প্রতীক্ষায়ই দিন গুণছিল?

আকাশের তপস্যায় জন্ম পেল যে পৃথিবী, এইবার সুরু হল তার নিজের সার্থক হওয়ার যাত্রা।

দিন, মাস, বছর নয়। কোটি কোটি বছর ছিল এই যাত্রা পথের বিস্তৃতি। কী দাপাদাপি, কী মাথা কোটাকুটি, কী নিদারুণ ভাঙ্গা-গড়া সেই যাত্রাপথ আচ্ছন্ন করে রেখেছিল, তাতো দেখেছ। বোবার কান্নার মতোই

ছিল তার অন্তরের আক্ষেপ।

তারপরে, ধীরে ধীরে সে যেন প্রকাশের ভাষা খুঁজে পেলো, স্তব্ধ হয়ে এলো তার দাপাদাপি, শান্ত হয়ে এলো তার মেজাজ ; এলো এক মহাজন্মের লগ্ন,—প্রথম প্রাণ জন্ম নিল পৃথিবীতে। জড় রূপ পেল প্রাণে।

লক্ষ্য কর, সৃষ্টির খেলা-ঘরে এযাবৎ যারা আসর জমিয়েছিল, তারা কিন্তু সবই ছিল প্রাণহীন, জড়। কি করে এই জড় বিশ্বে, লেশ মাত্র আভাষ না দিয়ে ছোট্ট একটি প্রাণ এসে দানা বাঁধল সে জিজ্ঞাসার আজও উত্তর মেলেনি। তবে সৃষ্টির আদিতে জ্যোতির যে মহাখেলা আমরা দেখেছি -সেই জ্যোতিরই রূপান্তর ঘটেছে প্রাণে, এ কথা যদি মেনে নেই, তবে সব প্রশ্নই চুকে যায়।

দেহে একটি মাত্র কোষ সম্বল করে জড়ের এই পরমাশ্চর্য মহাপরিণতি, নবীন প্রাণের প্রথম অঙ্কুর তার যাত্রা সুরু করল পৃথিবীতে। সে কি নিদারুণ নিঃসঙ্গ অভিযান! সেই মহাদুরন্ত পৃথিবীর বুকে মহাক্ষুদ্র একটি প্রাণ, কী করে যে টিকে রইল তা ভাবা যায় না। শুধু কী টেঁকা? বংশ বৃদ্ধির জন্য সে কী তার আকুল চেষ্টা! দেহের মাঝখান দিয়ে সরু হতে হতে দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে বহু-গুণিত হয়ে চল্‌ল সে। এক কোষধারী প্রাণী বহু কোষধারী হয়ে উঠল। যা ছিল সহজ সরল, তা হয়ে উঠল বিচিত্র, জটিল।

প্রাণের জয়-যাত্রা সুরু হল পৃথিবীর বুকে। এ যাত্রা অমরত্বের যাত্রা। সন্তানের মধ্যে অমর হয়ে থাকতে চাইল সে!

সেই যে সুরু হল, আজও তা থামেনি, একটানা বয়ে চলেছে স্রোতের মত। বিচিত্র হতে বিচিত্রতর হয়ে উঠেছে তার রূপ। কত শাখায়, কত প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে, প্রসারিত হয়ে, বিস্তৃত হয়ে সেই ধারা বয়ে চলেছে অভিব্যক্তির পথে, কোন্ মহাসমুদ্রের দিকে, —কে জানে?

কিন্তু প্রাণের এই যে বিকাশ, এ তো এমনি হয়নি, লক্ষ লক্ষ বছর তাকে সাধনা করতে হয়েছে। বেঁচে থাকবার জন্য প্রকৃতির বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্গে এই যে প্রতিমুহূর্তে মরণপণ যুদ্ধ, এতেই সংহত হয়েছে তার শক্তি, ফুটে উঠেছে তার বুদ্ধি, আর এই বুদ্ধির চরম বিকাশেই তো সে আজ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব,—মানুষ।

জলের উদ্ভিদ্ যে দিন ডাঙ্গায় আটকে হাঁস-ফাঁস করে উঠেছিল, সে দিন হয়তো বেঁচে থাকবার ইচ্ছা জেগেছিল তার মধ্যে। তারই ফলে ক্রমে তার দেহের গড়ন ডাঙ্গার উপযোগী হয়ে উঠ্লো।

ক্রমে ডাঙ্গার পথ বেয়ে প্রাণ এগিয়ে চল্লে,—জল রইল পেছনে পড়ে। এইভাবেই জল ছেড়ে সরীসৃপ দল ডাঙ্গায় উঠ্লো।

তারপর এলো শ্বাপদ, মাঝে মাঝে জল খাওয়া ছাড়া জলের উপর নির্ভর তারা মোটেই করে না। ভীষণ গরম আর ভীষণ শীতের মধ্যে তাদের বেঁচে থাকতে হত। তাদের গায়ে বড় বড় লোম জন্মাল। সবাইর প্রথমে তারাই সন্তানের প্রতি ভালবাসা দেখাল, আর সংসার গোছাবার দরকার বোধ করল। এই যে দুটি বৃহৎ ইচ্ছা অতি সামান্য ভাবে শ্বাপদদের মনে জেগেছিল, তাই যুগে

যুগে বিকাশ পেয়ে অতি নিপুণভাবে পূর্ণতা পেলো মানুষের মধ্যে। যে আধ-মানুষ বন্য জন্তুর ভয়ে গভীর বনে লুকিয়ে বেড়াত, গুহায় থাকতেও সাহস পেত না, সেই মানুষই আজকের মানুষে পরিণত হয়ে বুদ্ধির জোরে গোটা পৃথিবী ভোগ করছে।

কিন্তু করলে কি এই মানুষই পায়ে ভর করে, মাথা খাড়া করে চলতে পারেনি বহুকাল। মাথা বুক নত করে, মাটির কাছে কত না মার্জনা ভিক্ষা করে, সর্ব-দুর্বল মানুষ, কত না ভয়ে পৃথিবীর এক কোণে সামান্য একটু স্থান করে নিয়েছিল।

তারপরে, কি করে কি হয়ে গেল। নুয়ে-পড়া তার মাথা সে আকাশের দিকে উঁচিয়ে ধরল,—শিরদাঁড়া তার খাড়া, সোজা হয়ে উঠল,—শুধু পায়ে ভর করে সে চলতে সুরু করল। হাত দুখানা চলার কাজ থেকে মুক্তি পেল। হাতের এই অবসর মানুষের অভিব্যক্তির ইতিহাসে মস্ত বড় একটা ঘটনা। মুক্তি পেয়ে হাত তার কাজ সুরু করল,—ধরতে, ছুঁতে, খেতে, শিকার করতে। একটা আমূল পরিবর্তন এসে গেল মানুষের ইতিহাসে। হাতের সঙ্গে মাথার সম্পর্ক নাকি খুব নিবিড়, এমন কথা বিজ্ঞানীরা বলে থাকেন। ধরা-ছোঁয়ার ভেতর দিয়েই শিশুর বুদ্ধি বিকাশ পায়। দেখনা, শিশু শুধু দেখেই খুশী নয়, সব কিছু ধরতে চায়, ছুঁতে চায়, আকাশের চাঁদ পর্যন্ত! আদিম মানুষেরও হল তাই। এই ধরা ছোঁয়ার ভেতর দিয়েই তার বুদ্ধি বিকাশ পেয়ে চল্‌ল। আত্মরক্ষার কাজে, আহার সংগ্রহের কাজে সে আরো

উপযুক্ত হয়ে উঠতে লাগল,—আর তার সাথে বেড়ে চল্‌ল তার ইচ্ছাশক্তি।

কাজেই দেখ, বুদ্ধি আর ইচ্ছাশক্তির ক্রম-বৃদ্ধিই হল অভিব্যক্তি গল্পের মূল কথা। ইচ্ছাশক্তিই হল সব চাইতে বড় শক্তি। সব কিছু তার কাছে মাথা নোয়াতে বাধ্য। মহাবীর নেপোলিয়ন বলতেন—'অসম্ভব' বলে কোন কথা আছে তা তাঁর জানা নেই। কাজেই মানুষের বুদ্ধি যতই শুভ হবে, ইচ্ছার শক্তি ততই বাড়বে,—মানুষ ততই উন্নতির পথে এগিয়ে চলবে।

কিন্তু যে দিকটায় তুমি ইচ্ছার জোর কমিয়ে দেবে, অবজ্ঞা করবে, হেলা করবে, সে দিকটা আস্তে আস্তে অকেজো হয়ে পড়বে; তারপরে, প্রয়োজন নেই বলে ক্রমে সে লোপ পেয়ে যাবে। ধর, যেমন জলের মাছ, আর ডাঙ্গার প্রাণী। শ্বাস নিতে হয় দুজনকেই। কিন্তু ডাঙ্গায় তুল্‌লে প্রায় মাছই বাঁচে না, আবার জলে চুবোলে আমরা মরি। শ্বাস নেওয়ার যন্ত্র হল ফুস্‌ফুস্‌। মাছের ফুস্‌ফুস্‌ নেই। সে শ্বাস নেয় ফুল্‌কো দিয়ে। জল ছেড়ে প্রাণী যখন প্রথম ডাঙ্গায় উঠতে সুরু করেছিল, ফুল্‌কো দিয়ে তখন কোন কাজ হল না। ডাঙ্গার আবহাওয়ার সঙ্গে খাপ খাওয়াবার চেষ্টা করতে করতে শেষে প্রাণী-দেহে ফুস্‌ফুস্‌ গড়ে উঠলো। ওদিকে দেখ, প্রথম দিকে মানুষের ছিল মূলোর মত দাঁত, আর গা-ভরা লোম। সে সময় সে যা খেত তাতে অতো বড় দাঁত দরকার ছিল,—আর পৃথিবীর পাগলা আবহাওয়ায় বেঁচে থাকবার জন্য প্রয়োজন ছিল ঐ লোমের কম্বল। কিন্তু দুটো প্রয়োজনই এখন মিটে গেছে,—তাই সেই মূলো-

দাঁতও নেই, লোমের কম্বলও নেই।

আরো পেছনে যাও ডারউইনের সূত্র ধরে। আমাদের আদি-পিতার সেই ল্যাজ? সেও ঘুচেছে অনাবশ্যকতার তাগিদে।

মানুষের দেহের মধ্যে এমন অনেক যন্ত্র নাকি এখনো আছে, যার কোন কাজ নেই। বিবর্তনের সাক্ষী বয়ে এখনো তারা টিঁকে আছে।

পায়ের কাজ আজকাল আমাদের বড়ো কমে গেছে—পায়ে পায়ে যান,—পায়ে পায়ে বাহন। হাঁটা চলা নেই একরকম বলা যায়। কিন্তু দিন ছিল, যখন পা-ই ছিল একমাত্র যান, এবং একমাত্র বাহন। দূর-দূরান্ত, দেশ-দেশান্তর মানুষ পায়ে-হেঁটে বেড়াত। এমনি কত প্রসিদ্ধ পরিক্রমণ ও পরিব্রজনের সংবাদ ইতিহাসের পাতায় লেখা আছে। দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের তিব্বত ভ্রমণ, ফাহিয়াণ, হুয়েনচাং-এর ভারত ভ্রমণ, এমনি আরো কতো। কিন্তু আজ মানুষ পা'কে বড় অনাদর করছে। কি জানি, প্রকৃতির নিয়মে সে কোন দিন পা-হারা না হয়ে যায়!

লক্ষ্য কর, ধাপে ধাপে মানুষ যতই এগিয়েছে, ততই তার চেহারাও উন্নত হয়েছে। এটা কিন্তু অমনি হয়নি,





হয়েছে তার বুদ্ধি আর ইচ্ছা-শক্তি বিকাশের সাথে সাথে। যতই তার বুদ্ধি খুলতে লাগল, ততই তার চেহারার বানর ভাবটাও কেটে যেতে লাগল। তার নীচু কপাল ও থুতনি উঁচু হল, চ্যাপ্‌টা, ভোতা নাক টিকালো হল, খাটো-মোটা ঘাড় সরু ও লম্বা হল, হাত-পা ও মাথা দেহের সাথে তাল রেখে গড়ে উঠল।





এক কথায় শিল্পী যেন তাঁর তৈরী পুতুলে অতি নিপুণভাবে শেষ আঁচড়টি দিয়ে ছেড়ে দিলেন।

নটে গাছটি মুড়োল।

পরাভূত প্রকৃতি

কী লড়াই রে বাবা!

সেই যে কবে পঞ্চাশ কোটি বছর আগে শুরু হয়েছে আজও তা শেষ হল না!

প-ঞ্চা-শ কো-টি বছর?

তাছাড়া কি? দশ-শ'তে হল এক হাজার। একশ হাজারে হল এক লক্ষ। আর একশ লক্ষ-এ হল এক কোটি। এরকম পঞ্চাশ কোটি। চলেছে তো চলেইছে। কবে যে এর শেষ কে জানে। আর কে যে জিতবে, কে যে হারবে তাও বা কে বলবে।

তার মানে?

মানে আবার কি? ঢাল নেই, তলোয়ার নেই, কামান নেই, বন্দুক নেই—তবু লড়াই, তুমুল লড়াই। কেউ কাউকে ছেড়ে কথা কইছে না, কেউ পিছু হটছে না। 'মিটিয়ে নাও ভাই, মিটিয়ে নাও', বলে কেউ এগুচ্ছে না।

তবে?

তবে আবার কি? একটা হেস্তনেস্ত হবেই শেষ অবধি। হয় এ জিতবে, নয় তো ও। চলুক, দেখি আরও কতকাল চলে।

কিন্তু—

'কিন্তু' নয়। এর একটা শেষ হওয়া দরকার। জানা চাই, শেষ অবধি কার হুকুমে কে চলবে। হয়তো আরও বহু-বহু হাজার বা বহু লক্ষ বছর লেগে

যাবে নিষ্পত্তি হতে। আবার চট করেও সব শেষ হয়ে যেতে পারে। তা হোক, তবু এর শেষ দেখা চাই—কে জেতে, জড় প্রকৃতি, না জ্যান্ত প্রাণী

এরা আবার কে ?

বাঃ রে, প্রাণী হল প্রাণী, আর প্রকৃতি, প্রকৃতি।

অর্থ কি হল ?

অর্থ ? প্রাণ যার আছে সে হল প্রাণী, যেমন জীবাণু থেকে মানুষ অবধি সব। বাকী সব হল প্রকৃতি—প্রাণ নেই যাদের, এক কণা ধূলো থেকে আকাশের ঐ তারাটা পর্যন্ত। তাই তো প্রাণী জ্যান্ত, আর প্রকৃতি প্রাণহীন—জড়।

এরাই লড়ছে ঐ প-ঞ্চা-শ কো-টি বছর ধরে ?

তাই তো দেখা যাচ্ছে। ক'এক লক্ষ বছর হল লড়াই-এর মোড় ঘুরে গেছে। মোড় ঘুরেছে সেই দিন আর যেদিন মানুষ নামে প্রাণী দেখা দিয়েছে পৃথিবীতে। তখন থেকে চলেছে শুধু মানুষে প্রকৃতিতে লড়াই। হালে তো সে লড়াই একেবারে জমজমাট! প্রকৃতির অবস্থা বেশ কাহিল ঠেকছে যেন! তবে বলা যায় না—লড়াই-টড়াইর ব্যাপার তো! কখন কি ঘটে যায় কে বলবে ?

আচ্ছা কাণ্ড তো!

তাই তো—

শুরু থেকেই হোক না তা হলে—

শুরু থেকে ? হোক—

ব্যাপার হল—এই যে পৃথিবী, এটা একদিনে এমনিটি হয়ে ওঠে নি। সাজিয়ে-গুছিয়ে সুন্দরটি

করে হঠাৎ একদিন কেউ একে পাঠিয়ে দেয়নি।

সূর্য থেকে পৃথিবী জন্ম নেয়। সূর্য হল জ্বলন্ত গ্যাসে ভর্তি। সে এক ভয়ংকর ব্যাপার। দাউদাউ করে জ্বলছে, আর বাঁইবাঁই করে ঘুরছে। একদিন হল কি, ওর গা থেকে খানিকটা খসে ছিটকে বেরিয়ে গেল। কিন্তু যাবে কোথায়? সূর্যের ভীষণ টানে থমকে গিয়ে সূর্যের চারধারে ডিগবাজী খেতে খেতে ঘুরে বেড়াতে লাগল। এটা হল প্রায় দুশো কোটি বছর আগের কথা। বেচারা এখনও ডিগবাজী খাচ্ছে আর ঘুরছে।

বাপ কা ব্যাটা! সূর্যের ছেলে পৃথিবী। আগুনের ছেলে আগুন। জল নেই, বাতাস নেই, কোথাও প্রাণের চিহ্ন মাত্র নেই কে বলবে এই 'আগুনে' পৃথিবীতে একদিন প্রাণ জন্ম নেবে!

কিন্তু নিল। তার জন্য আয়োজন চলেছিল বহুকাল। 'বহুকাল' মানে, কয়েক কোটি বছর। 'আগুনে' পৃথিবী ধীরে ধীরে জুড়োতে লাগল। গরম দুধ জুড়োলে সর পড়ে। পৃথিবীর গায়েও তেমনি সর পড়তে লাগল।

ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হয়ে চলল পৃথিবী। আর সরটাও চলল পুরু হয়ে। তারপরে একদিন নামল বৃষ্টি। একটানা বৃষ্টি অঝোরে ঝরে চলল বছরের পর বছর। সারা পৃথিবী জলে জলে থৈ থৈ।

আরও জুড়োতে লাগল। আরও। সরটাও চলল আরও পুরু, আরও শক্ত হয়ে। আজ যাকে আমরা মাটি বলি—সেটা হল ঐ সর। আজ

আমাদের পায়ের তলায় সরটা প্রায় পঞ্চাশ মাইলের মতো পুরু হয়ে উঠেছে।

ওদিকে, গরম কড়াইতে ঠাণ্ডা জল ঢাললে যা হয়, তাই হতে লাগল। 'আগুনে' পৃথিবী ঠাণ্ডা জলের ছোঁয়া পেয়ে মাতাল হয়ে উঠল—ফেটে-ফুটে, ভেঙে-চুরে যাচ্ছেতাই হয়ে উঠল ওর চেহারা। যেখানটায় সরটা ছিল একটু কম পুরু, সেখানটা দিয়েই ঠেলে বেরুল আগুন। এতে পৃথিবীর কোন কোন জায়গা বসে যেতে লাগল, আবার কোন কোন জায়গা ঠেলে উঁচু হয়ে উঠতে লাগল। এমনি ধারা ভাঙ্গা-গড়া চলল বহু, বহুকাল। এমনি করেই যত সমুদ্র, পাহাড় আর ডাঙ্গার সৃষ্টি হল।

এমনি একদিনে সমুদ্রের গরম জলের মধ্যে প্রথম প্রাণ দেখা দিল। ঘন লালার মতো ছিল এরা দেখতে—জলে ভেসে বেড়াত। এদের আকারের কিছুই ঠিক ছিল না। এক এক সময় এক এক রকম দেখাত। কিন্তু একটা ব্যাপার ঠিক ছিল। তা হল, ওদের দেহের ঠিক মাঝখানটায় ফুটকি মতো একটা বিন্দু, ওটাই হল ওদের প্রাণ-কেন্দ্র। দেহের মাঝখানটা দিয়ে সরু হতে হতে ওরা দুই ভাগে ভাগ হয়ে যেত, আর সেই বিন্দুটাও খানিক এদিক, খানিক ওদিক কেটে যেত। অর্থাৎ শরীরটা দুভাগ হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে প্রাণ-বিন্দুটাও দুভাগ হয়ে যেত। যা ছিল এক, তা হল দুই। এই ভাবেই চলত ওদের বংশ বৃদ্ধি।

এটা ঘটেছিল প্রায় পঞ্চাশ কোটি বছর আগে।

এটা যে একটা কত বড় ঘটনা, তা ভেবে কূল পাওয়া যায় না। সেই ‘আগুনে’ পৃথিবী, দুর্দান্ত মাতাল পৃথিবী, ফাটছে, ফুটছে, ভাঙছে, গড়ছে—তার মধ্যে ছোট্ট একটি প্রাণের দানা!

টিঁকলো কি করে?

কে জানে? তবু তো টিঁকলো! আর শুধু কি টেঁকা? ওরই মধ্যে তার বংশ চলল বেড়ে—এক থেকে দুই, দুই থেকে বহু—বহু।

শুরু হল লড়াই। সেই যে শুরু হল, আজও তা চলছে।

গোড়াতে দেখতে পাই, প্রাণী শুধু মার-ই খেয়েছে, —নিদারুণ মার,—বহুকাল, বহু লক্ষ বছর ধরে। প্রকৃতি চেয়েছে প্রাণকে ধুয়ে মুছে শেষ করে ফেলতে, আর প্রাণ চেষ্টা করেছে কোন রকমে টিঁকে থাকতে।

একদিকে অতি দুর্দান্ত প্রকৃতি—অন্যদিকে অতি দুর্বল, অতি সামান্য, অতি নগণ্য প্রাণ। একদিকে শুধু মেরে ফেলার চেষ্টা, অন্যদিকে শুধু টিঁকে থাকবার। তবু প্রকৃতি পারে নি।

ধাপে ধাপে প্রাণ এগিয়ে চলল। কতো বিচিত্র রূপে, কতো বিভিন্ন চেহারায় সে দেখা দিতে লাগল! জলের মধ্যেই চলেছিল তার বিকাশ বহুকাল!

দেখা দিল ঘন লালার মত প্রথম প্রাণ, একটি মাত্র কোষ সম্বল করে।

এলো কতো রকমের গুগ্‌লি, পোকা, কাঁকড়া, শেওলা।

এলো আট-দশ হাত মাছ আর বিছা, ইয়া ইয়া গুগ্‌লি।

এলো কচুরিপানা, আরও কতো।



কতরকমের গুগ্‌লি, পোকা, কাঁকড়া······

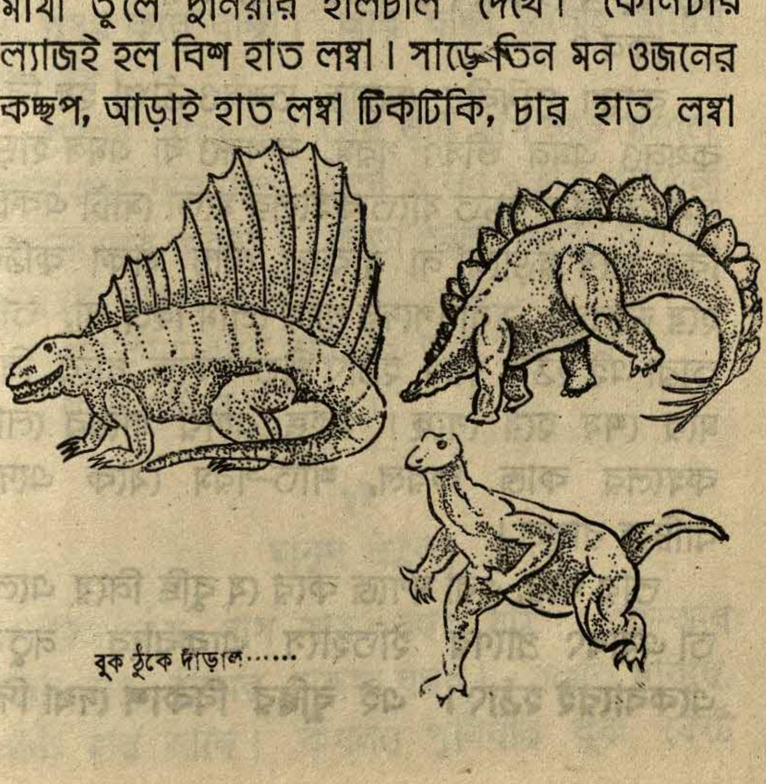
কিন্তু এটা হল কি। হঠাৎ যেন যুদ্ধের চেহারা পালটে গেল?

এত কাল যারা জলের মধ্যে থেকে শুধু মার খেয়েই যাচ্ছিল—হঠাৎ তারা যেন রুখে দাঁড়াল। কেবল দাঁড়াল না—দল বেঁধে জল ছেড়ে ডাঙ্গা বেয়ে উঠতে লাগল। ডাঙ্গা তারা জয় করবেই। গাছে গাছে ছেয়ে গেল ডাঙ্গা—ভীষণ জঙ্গল। আর সেই থমথমে জঙ্গলে—কোন সাড়া নেই, কোন শব্দ নেই—রাক্ষুসে সব পোকা, কোনটা থপ্‌ থপ্‌ করে লাফাচ্ছে, কোনটা পত্‌ পত করে উড়ছে। তারা যে ডাঙ্গা জয় করেছে!

ওদিকে প্রকৃতিও চুপ করে নেই। হঠাৎ সাঁ সাঁ করে ঝড় ছুটে এলো। ভুতুরে গাছগুলি ভয়ে কেঁপে কেঁপে উঠল। তারপরে হুড়মুড় করে ভেঙে-চুরে পড়ল। সমুদ্রের জল ফুলে ফেঁপে দারুণ গর্জনে ডাঙ্গার গায়ে মাথা খুঁড়তে লাগল—যেন ডাঙ্গায় যারা উঠে পড়েছে, ডাঙ্গা শুদ্ধ তাদের গিলে নেবে!

কিন্তু পারল কই?

প্রাণ এগিয়ে চলল। একটা নতুন জাতের প্রাণী দেখা দিল পৃথিবীতে! ভীষণ এদের চেহারা। কোনটা মাটিতে দাঁড়িয়ে তাল গাছের ডগা চিবোয়। কোনটার দাঁতই হল দু-তিন হাত লম্বা, কোনটা তিরিশ-চল্লিশ হাত জলে দাঁড়িয়ে দিব্যি জলের উপর মাথা তুলে দুনিয়ার হালচাল দেখে। কোনটার ল্যাজই হল বিশ হাত লম্বা। সাড়ে তিন মন ওজনের কচ্ছপ, আড়াই হাত লম্বা টিকটিকি, চার হাত লম্বা



বুক ঠুকে দাঁড়াল……

মাটির পোকা, আট ইঞ্চি ঠ্যাং-ওলা মাকড়শা, এরাও এল। বুক ঠুকে দাঁড়াল এরা—লড়বে প্রকৃতির সাথে, লড়বে।

এদের বলে সরীসৃপ। ডিম পাড়ে এরা, তবে জলে নয়, ডাঙ্গায়। এর আগের যারা, তারা ডিম পাড়ত জলে।

এরাই ছিল তখনকার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণী। বহুকাল এরা লড়েছে প্রকৃতির সাথে।

এর পরে যারা এলো, তারা দিল একেবারে চমক লাগিয়ে। এমন ভাবে তৈরী হয়ে এলো যে এদের হটায় কে ? এরা এলো গায়ে লোম আর মাথায় বুদ্ধি নিয়ে। প্রাণী-প্রকৃতি যুদ্ধের ইতিহাসে এটা একটা বড় বড় করে লিখে রাখবার মতো কথা।

কেন ?

কারণ পৃথিবীর মেজাজ তখনও ঠাণ্ডা হয় নি। কখনও এমন ভীষণ গরম, কখনও বা এমন হাড়-জমানো শীত পড়ত যাতে কম্বলের মতো মোটা একটা কিছু গায়ে জড়ানো না থাকলে বেঁচে থাকা কঠিন হয়ে উঠত। সরীসৃপদের গায়ে লোম ছিল না, তাই তারা এই হঠাৎ গরম, হঠাৎ শীত সইতে পারে নি। মরে শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু এদের গায়ের লোম কম্বলের কাজ করল, শীত-গরম থেকে এদের বাঁচিয়ে রাখল।

তার পরে, এরা মগজে করে যে বুদ্ধি নিয়ে এলো, তা এযাবৎ প্রাণের ইতিহাসে একেবারে নতুন, **একেবারেই হঠাৎ। এই বুদ্ধির বিকাশ** দেখা দিল

তাদের বাৎসল্যের মধ্যে। বাৎসল্য মানে, ছেলে-পুলের উপর ভালবাসা। এর থেকে বোঝা যায়, ছেলেপুলে নিয়ে ঘর-সংসার গুছিয়ে বসবাস করবার ইচ্ছা জেগেছে প্রাণী-জগতে। এর আগে এটা দেখা যায় নি। আগের প্রাণীদের মতো এরা শুধু নিজেরাই বাঁচতে চায় নি, নিষ্ঠুর প্রকৃতির হাত থেকে সন্তানদেরও বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছে, যা'তে তারাও লড়তে পারে, টিঁকে থাকতে পারে পৃথিবীর বুকে। কাজেই, এদের হটায় কে?

এরা হল শ্বাপদ—যাদের নিয়ে আমাদের নিত্য কারবার,—গোরু, ঘোড়া, ছাগল, বেড়াল, কুকুর, বাঘ, সিংহ, হাতি, বানর এই সব। এরা ডিম পাড়ে না, প্রসব করে বাচ্ছা! আর বাচ্ছা জন্মেই মায়ের দুধ খায়।

প্রাণের সাথে মন আর বুদ্ধি এসে হাত মেলাল, যুদ্ধের মোড় ঘুরে গেল। এতো করেও প্রকৃতি পারলনা প্রাণকে শেষ করতে। কতো দুর্বল, কতো অসহায় ছিল সে, তবু পারে নি।

এতোকাল যখন পারে নি, আর কি পারে?

লড়াই ঘনিয়ে এলো—।

দুই

মানুষ এলো

দিন যায়, মাস যায়, বছর যায়। এক-আধ বছর নয়, হাজার হাজার বছর। প্রকৃতি মারছে, প্রাণী মার খাচ্ছে। কখনও পৃথিবীর বুক ফেটে

আগুন বেরোনো, কখনও বরফের পাহাড় নেমে আসা, কখনও প্রচণ্ড ঝড়, কখনও তুমুল বৃষ্টি, বজ্র, বিদ্যুৎ, প্লাবন।

প্রকৃতির এই মার, এই প্রচণ্ড ফাটা-ফুটি, আগুন, বরফ, ঝড়, জল, এর ফলে কত প্রাণীই না নিঃশেষ হয়ে গেছে। তবু প্রাণ হারে নি। প্রকৃতি পারে নি তাকে শেষ করতে। সে পৃথিবীর মাটি আঁকড়ে রয়েছে, পৃথিবী তার চাই, পৃথিবী ভোগ করবেই সে। মাটি আঁকড়ে অপেক্ষা করবে সে ততোদিন, যতোদিন না সে পাল্টা মার দিতে পারে—যতোদিন না সে প্রকৃতিকে হারাতে পারে।

তাই তো দেখি, যতো মার খাচ্ছে, প্রাণী ততোই শক্ত-সমর্থ হয়ে উঠছে, তার সহ্য করবার শক্তি ততোই বেড়ে যাচ্ছে। মরছে বটে বহু—আবার টিঁকেও যাচ্ছে অনেক। তারা পুরোদমে বংশবৃদ্ধি করে চলেছে। নতুনের দল নতুন শক্তি নিয়ে প্রকৃতির মুখোমুখি হয়ে দাঁড়াচ্ছে। আবার নতুন বিপদ ঘনিয়ে আসছে। আবার বহু মরছে।

এইভাবে বারে বারে প্রাণী মুছে যাওয়ার মুখে এসেছে, কিন্তু যায় নি। যারা টিঁকে গেছে, তারা নতুন চেহারায় নতুন রূপে পৃথিবীতে নতুন প্রাণের বন্যা বইয়ে দিয়েছে।

প্রকৃতির হাতে মার না খেলে এমনটি বোধ হয় হতো না। মারতে গিয়ে প্রকৃতি প্রাণকে বাঁচিয়ে দিল।

শ্বাপদরা বাঁচবার পণ নিয়ে এসেছে। তারা

হটবে না। কিছুতেই না।'

হটেও নি। মন আর বুদ্ধি তাদের সহায়—একেবারে ব্রহ্মাস্ত্র!

তারপরে কেমন করে কি যে হয়ে গেল, কেউ বলতে পারে না। সে এক পরমাশ্চর্য ব্যাপার!

প্রায় তিন লক্ষ বছরের মাথায় এসে দেখা গেল এক নতুন প্রাণী সেই ভীষণ পৃথিবীর গভীর জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কতো ভয় তার! কারুর সাথে পারে না সে। সবাই তাকে তাড়া করে, সবাই তাকে মারে। চার হাতপায়ে ভর করে মাথা নীচু করে সবাইকে এড়িয়ে চলে সে।

বানর?

না তো। দেখতে খানিকটা তেমনি বটে। কিন্তু ল্যাজ কই? তাছাড়া গাছে উঠতে পারে না, মুখে মূলোর মতো দাঁত, গা-ভর্তি লোম, হাব-ভাব, চলন-চালন তো ঠিক বানরের মতো নয়।

প্রথম মানুষ এলো পৃথিবীতে। সবচাইতে দুর্বল, সবচাইতে ভীরু, সবচাইতে অসহায় সে। অথচ দেখি দিনে দিনে সবাইকে হটিয়ে, সবাইকে পিছু ফেলে সে-ই পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণী হয়ে দাঁড়াল।

বটগাছ গোটা বনটা ঢেকে রাখে, কিন্তু তার বীজ কতটুকু?

মানে কি হল?

মানে হল, শুধু দেখতে-শুনতে বড় হলেই বড় হওয়া যায় না। বড় হতে যা সত্যিকারের দরকার তা হল ভেতরের জিনিস, বাইরের নয়। শুধু

চেহারা দিয়ে বিচার করলে ভুল করা হবে। অতি ক্ষুদ্রের মধ্যেও অতি প্রচণ্ড শক্তি লুকিয়ে থাকে—যার পরিচয় তার প্রকাশে, যেমন বটের বীজ।

ঠিক তেমনি এই প্রথম মানুষ। তখনকার প্রাণীদের তুলনায়, বলতে গেলে সে কিছুই নয়। কিন্তু কি প্রচণ্ড শক্তি সে বহন করে এনেছিল তার অন্তরে। নিজে সে তা জানে নি, বোঝেওনি



বানর? না তো···

বোধহয়। কিন্তু দিনে দিনে সেই শক্তি বিকাশ পেয়ে চলল। ফুল যেমন একটির পর একটি করে পাঁপড়ি মেলে, তার শক্তিও তেমনি করে বিকাশ পেতে লাগল —ধীরে ধীরে।

সেটা আবার কি শক্তি ?

ঐ যে বলেছি মন আর বুদ্ধি, যা সবাইর প্রথমে দেখা দিয়েছিল শ্বাপদদের মধ্যে—তাই। তাই তাকে জুগিয়ে দিল ইচ্ছাশক্তি। প্রবল প্রচণ্ড শক্তি। আর তাই নিয়ে সে প্রকৃতির মুখোমুখি দাঁড়াল। আর মার খাওয়া নয়, আর লুকিয়ে বেড়ানো নয়, আর শুধু মাটি আঁকড়ে টিঁকে থাকা নয়। এবার উলটে মারা, এবার জয়ের জন্য যুদ্ধ, এবার প্রকৃতিকে পরাভূত করার যুদ্ধ, এবার তাকে হুকুমের দাস বানাবার লড়াই।

মানুষ আর প্রকৃতি আজও দাঁড়িয়ে আছে মুখোমুখি। পঞ্চাশ কোটি বছরের যুদ্ধ আজ জমজমাট!

একদিনে হয় নি। তিন লক্ষ বছর এই জন্য মানুষকে অপেক্ষা করতে হয়েছে। তিন লক্ষ বছর ধরে মানুষের সেই লুকোনো শক্তি বিকাশ পেয়েছে, ধীরে ধীরে, একটু একটু করে। আর এরই মধ্যে তাকে কতো না দুঃখ, কতো না কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে। প্রকৃতি তাকে এতটুকুও ক্ষমা করেনি—তার সর্বশক্তি দিয়ে এই দুর্বল মানুষকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলার চেষ্টা করেছে।

কিন্তু পারে নি।

ধাপে ধাপে মানুষ এগিয়ে চলেছে। যতো মার খেয়েছে, ততোই তার উলটে মারবার শক্তি বেড়ে গিয়েছে, ততোই তার বুদ্ধি জাগ্রত হয়েছে, ততোই তার ইচ্ছাশক্তি বেড়েছে।

যুগে যুগে পৃথিবীতে দলে দলে মানুষ এসেছে। এক একটা দল কিছুকাল থাকবার পরে লোপ পেয়ে গিয়েছে। মনে হয়েছে—এইবার বুঝি শেষ। কিন্তু না তো। এসেছে আর এক দল। বুদ্ধিতে, সাহসে, শক্তিতে অনেক উন্নত তারা। এইভাবে মানুষ লড়েছে প্রকৃতির সাথে ক্ষমাহীন, আপোষহীন, অক্লান্ত লড়াই।

তাই তো দেখি, প্রথম দলের পরে যারা এলো, তারা আর ভয়ে ভয়ে লুকিয়ে বেড়াচ্ছে না। তারা পাথর ঘষে অস্ত্র বানিয়ে লড়ছে শ্বাপদদের সাথে। তারা পাথরে পাথর ঠুকে আগুন জ্বালাতে শিখেছে, আর পাতা-টাতা জড়ো করে সেই আগুন জিইয়ে



পাথরে পাথর ঠুকে আগুন জ্বালাতে শিখেছে…

রাখছে। এতে তাদের গুহার অন্ধকার দূর হয়েছে। আগুন দেখে জন্তু-জানোয়ারগুলো ভয়ে গুহার কাছে আর এগুলো না।

ছেলেপুলে নিয়ে গুহার মধ্যে এরা বাস করতে শুরু করল। সেই বাৎসল্য বিকাশ পেয়ে চলল।

কিন্তু এরাও টিঁকতে পারল না শেষ অবধি।

এলো আর একদল। অনেক উন্নত এরা। গুহার গায়ে এরা যে সব ছবি এঁকে রেখে গিয়েছে, আর হরিণের শিং কেটে কেটে যে সব মূর্তি বানিয়ে রেখে গিয়েছে, তা দেখলে সত্যই অবাক হতে হয়। কোথায় যে এ সব তারা শিখেছিল, কে জানে? ছুঁচের ব্যবহারও এরা জানত। এদের ছুঁচ ছিল হাড়ের। এরা ছিল যেন জাত-শিল্পী।



দেখলে অবাক হতে হয়

কি জানি, কি ভাবে এরাও একদিন লোপ পেয়ে গেল! প্রকৃতি এদেরও দিল শেষ করে।

কিন্তু শেষ করলেই হল? লক্ষ লক্ষ বছর যুদ্ধ চালিয়ে শেষ পর্যন্ত প্রাণী হেরে যাবে? হতেই পারে না।

তাই তো দেখি, আজ থেকে প্রায় দশ-বারো হাজার বছরের মাথায় এসে যুদ্ধটা যেন হঠাৎ ঘোরতর হয়ে উঠল।

আর একদল নতুন মানুষ এসে দাঁড়াল পৃথিবীর বুকে। এযাবৎ যে মানুষদের আমরা দেখেছি, তাদের চেয়ে অনেক অনেক উন্নত এরা। তাদের যা-কিছু দুর্বলতা ছিল, যা-কিছু অপূর্ণতা ছিল, সব-কিছু কাটিয়ে এরা লড়বার জন্য বুক ঠুকে দাঁড়াল।

গুহায় থাকা এরা ছেড়ে দিল, ভয় এদের কেটে গেছে। এরা ঘর-বাড়ি বানিয়ে তার মধ্যে বসবাস করতে শুরু করল। সাধারণত জলা জায়গায় মাচা বেঁধে তার উপর এরা ঘর তুলত। জলের উপরে থাকাই বোধহয় এরা বেশী নিরাপদ বোধ করত।

কারণ?

কারণ সোজা। সব সময় জল পাওয়া যাবে, আর জন্তু-জানোয়ার হঠাৎ আক্রমণ করতে পারবে না।

এরাই প্রথম রান্না করে খেতে শুরু করল। এর অনেক আগেই আগুন আবিষ্কার হয়েছিল সত্য।



কিন্তু তা দিয়ে যে রান্না করা যায়, এযাবৎ মানুষের তা খেয়াল হয়নি। তাই তারা খেত সব কাঁচা আর পচা।

পাথরের অস্ত্র ছেড়ে দিয়ে এরা ধাতুর অস্ত্র ব্যবহার শুরু করল। এর ফলে হল এই, জন্তু-জানোয়ার এবার এদের ভয় করে চলতে শুরু করল। কি করে যে এরা ধাতুর খোঁজ পেল, কে জানে? সব চাইতে অবাক হতে হয়, যখন দেখি এরা তামা ও টিন মিশিয়ে কাঁসা বানিয়ে ফেলেছে! ধাতু থাকে মাটির অনেক তলায় লুকোনো। সেখান থেকে এরা ছিনিয়ে আনল তাকে। প্রকৃতির বুক চিরে মানুষ লুটে আনল তার লুকোনো ধনকে।

এইবার শুরু হল প্রকৃতির পিছু হটার পালা।

শুধু কি ছিনিয়ে আনা? মাটি থেকে তুলে আনা সেই ময়লা ধাতুকে গলিয়ে পরিষ্কার করে, এটার সাথে ওটা মিশিয়ে একটা নতুন ধাতু তৈরী করা, তাকে আবার আগুনে পুড়িয়ে নরম করে পিটিয়ে-পিটিয়ে নানা রকম অস্ত্র আর বাসন-কোসন বানানো—সে যে মানুষের কতো বড় জয়, তা বলে শেষ করা যায় না।

শুধু কি এই? গাছের ছালের আঁশ তুলে তাই দিয়ে কাপড় বানিয়ে এরা পরল। এর আগের দু-দল ব্যবহার করত পশুর চামড়া।

কোথায় যাবে প্রকৃতি?

তারপরে এরা যা করে বসল, তার তুলনা নেই। এরা শিকার ছেড়ে চাষ-আবাদ শুরু করে দিল।

আর ঘোড়াকে লাগানো হল ওই কাজে। পৃথিবীতে এই প্রথম চাষ-আবাদ। আর সাথে সাথে যুদ্ধের মোড় একদম ঘুরে গেল।

এবার আর মানুষকে রোখে কে?

কেন?

কারণ, এর আগে যে মানুষদের দেখেছি, খাদ্যের জন্য তাদের প্রকৃতির মুখ চেয়ে বসে থাকতে হয়েছে—গাছের ফল, মেঘের জল, বনের পশু-পাখি, আরো কতো। সব সময় তো এসব পাওয়া যেত না। তাছাড়া, শিকারে গিয়ে জন্তু-জানোয়ারের হাতে অনেকেরই প্রাণ যেত। সুতরাং তাদের জীবনের একমাত্র কাজ ছিল খাদ্য জোগাড় করা—আর তা করতে গিয়ে প্রাণ নিয়ে টানাটানি।

কিন্তু এই নতুন আবিষ্কার সব-কিছুই উলটে-পালটে দিল।

কি করে?

এর ফলে এদের আর শিকারের খোঁজে দিন-ভোর বনে-বাদাড়ে ঘুরে বেড়াতে হল না। চাষের ফসল ঘরে তুলে ধীরে সুস্থে নিশ্চিন্তে বসে খাবার সুযোগ পেল। প্রকৃতির মুখের দিকে আর তাকিয়ে থাকতে হল না। জীবনের বিপদ ও ঝুঁকি কমে গেল। জীবনে এদের অবসর ও বিশ্রাম এলো।

দেহের কাজ অনেক কমে গেল, এবার মাথার কাজ শুরু হল।

এইবার তারা চারদিকের সবকিছু চোখ মেলে,

মন দিয়ে খুব ভাল করে দেখতে লাগল। যতোই দেখে, ততোই অবাক হয়, ততোই রাজ্যের চিন্তা মাথায় আসে—এটা কি, ওটা কি, সেটা কেন? দেখে আর ভাবে—কি করে জীবনকে আরও সহজ, আরও সুন্দর করে গড়ে তোলা যায়। ভাবে—কি করে প্রকৃতির মুখ চেয়ে না থেকে, প্রকৃতির শক্তিগুলোকে কাজে লাগানো যায়, হুকুম মতো চালানো যায়। ঐ জল, ঐ বাতাস, ঐ বিদ্যুৎ, এদের খেয়ালের কাছে তারা আর মাথা নুইয়ে থাকবে না—জয় তাদের করবেই।

শুধু টিঁকে থাকার যুদ্ধে প্রাণী জিতে গেল—মাথার লড়াই এইবারে শুরু।

তিন

মাথার লড়াই

লড়াই এবার একেবারে ঘরের দোরে এসে পড়েছে। কোটি-কোটি, লক্ষ-লক্ষ বছরের হিসাব পেরিয়ে আমরা হাজারের কোঠায় এসে দাঁড়িয়েছি—দশ-বারো হাজার।

এই নতুন দল এসেছিল অনেক সুন্দর ও উন্নত চেহারা নিয়ে—আমাদের চেহারার কাছাকাছি প্রায়।

দেখতে পাচ্ছি লড়াই যতোই এগিয়েছে, মানুষের চেহারার বানর ও বুনো ভাবটা ততোই কেটে গেছে।

এটা হল কেন?

এমনিতে হয়নি। হয়েছে তার বুদ্ধি আর ইচ্ছা-

শক্তি বিকাশের সাথে সাথে। তাই তো দেখি তিন লক্ষ বছর আগের সেই প্রথম মানুষ যাকে 'মানুষ' বলাই দায়, দশ-বারো হাজার বছরের মাথায় এসে কী সুন্দর চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়েছে।



এমনিতে হয়নি

তার নীচু কপাল ও থুতনী উঁচু হয়ে উঠেছে, চ্যাপটা, ভোঁতা নাক উঁচু টিকালো হয়েছে, খাটো মোটা ঘাড় সরু ও লম্বা হয়ে উঠেছে, হাত-পা ও মাথা দেহের সাথে তাল রেখে সুন্দর হয়ে গড়ে উঠেছে।

প্রকৃতি পারল না আর মানুষকে কেবল বুনো করে রাখতে।

প্রাণী আর একবার জিতল।

এদিকে ঘটে গেল আর এক ব্যাপার। এইবার প্রকৃতি আপনাতেই বোধহয় কিছুটা পথ ছেড়ে দিল। বহুকাল ধরে পৃথিবীতে বরফ জমছিল। জমতে জমতে

এমন হয়েছিল যে সেই হাড়-জমানো শীতের মধ্যে টিঁকে থাকাই দায় হত। চলাফেরা করা তো দূরের কথা। এর ফলে তখনকার মানুষ মোটেই চলাফেরা করতে পারে নি। কোন রকমে টিঁকে ছিল মাত্র।

কিন্তু হঠাৎ এটা কি হল ?

বরফ গলতে শুরু করেছে যে! সূর্যের আলো যে কারণেই হোক, বেশী করে পড়তে লাগল পৃথিবীতে। তার ফলে পৃথিবী আবার গরম হয়ে উঠতে লাগল, আর বরফ গলতে লাগল।

মানুষকে আর পায় কে ?

শীতে জড়োসড়ো হয়েছিল সে এতদিন। এইবার সে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল—ছড়িয়ে পড়ল দূর-দূরান্তর দেশ-দেশান্তরে।

মানুষের ভবঘুরে জীবন শুরু হল।

তারপরে এক এক দল এক এক দেশে গিয়ে বসবাস শুরু করল। প্রাণীদের চেহারার রকমফের হয় জল-বায়ুর গুণে। মানুষের বেলাও তাই। সুতরাং এক এক দেশের এক এক রকম জল-বায়ুর ফলে নানা রকম হয়ে উঠল তাদের চেহারা। কেউ হল ফর্সা, কেউ কালো। কেউ কটা, কেউ বাদামী। কেউ লম্বা, কেউ বেঁটে—নানা রকম।

এক আবার বহু হল।

নতুন দেশের নতুন আবহাওয়ার সাথে আবার নতুন করে লড়াই শুরু হল। নতুন নতুন বিপদ-বাধার সামনে দাঁড়িয়ে মানুষ আবার ভাবতে লাগল—কি করে একে জয় করা যায়। যতো ভাবে,

ততোই উপায় বেরিয়ে আসে, ততোই তার সামনের পথ খুলে যায়, প্রকৃতি ততোই পিছু হটতে থাকে।

প্রাণীর জয়যাত্রা এগিয়ে চলে।

চাষ করতে গিয়ে মানুষের নজর পড়ে পশুর দিকে।

না পড়লেও তো পারত? পড়ল কেন? হাতে মাটি খুঁড়ে তো চাষ করা চলত? চলছিলও তো।

চলত বটে। কিন্তু মানুষ ওখানেই থেমে থাকতে পারে নি। যদি থেমে যেত, তবে মানুষ হেরে যেত, প্রকৃতি প্রতিশোধ নিত। মানুষকে ধুয়ে মুছে শেষ করে ফেলত।

চাষ-আবাদ আবিষ্কারের ফলে মানুষের যে মাথার কাজ শুরু হয়েছিল, তাই তাকে এগিয়ে নিয়ে চলল। মানুষ কেবলই চেষ্টা করতে লাগল কি করে পৃথিবীকে বেশী করে ভোগ করা যায়, কি করে জীবনকে আরও সহজ ও সুন্দর করে তোলা যায়।

তাই তার নজর পড়ল পশুর দিকে। পশুদের পোষ মানিয়ে তাদের দিয়ে কাজ করিয়ে নেওয়া যায় কিনা—কতো কম পরিশ্রম করে কতো বেশী ফল পাওয়া যায়—এই হল মানুষের ভাবনা।

তাই দেখি, ঘোড়াকে লাগানো হয়েছে চাষের কাজে। চাষের চাইতে ছুটে বেড়ানোর কাজে ঘোড়া যে বেশী উপযোগী, এটা মানুষ পরে বুঝেছিল। তখন গোরু এসে ঘোড়ার জোয়াল কাঁধে তুলে নিল। আর ঘোড়া ছুটে চলল মানুষকে পিঠে নিয়ে।

একটু নজর দিলে দেখা যাবে, পোষ মানানোর

জন্য পশু বাছাই করবার ব্যাপারে মানুষ কতো না বুদ্ধি-বিবেচনার পরিচয় দিয়েছিল! বাঘ, ভালুক, হাতি ইত্যাদি পোষ মানানোর চেষ্টা না করে, মানুষ নজর দিল ঘোড়া, গোরু, ছাগল, কুকুর এই সবের দিকে। অবশ্য তখনকার এই সব পশু তাদের আজকের জাত-ভাইদের মতো মোটেই ছিল না। ছিল অনেক বুনো, অনেক হিংস্র এবং চেহারাও ছিল অন্যরকম। ঘোড়ার কথাই বলি। ঘোড়ার ছিল কাটা-খুর গোরুর মতো, আর দেখতে ছিল খুব বড়-গোছের রাম-ছাগলের মতো।

কিন্তু লড়াইটা তো চলছে এখন মাথার! সেই মাথা যেন মানুষকে বলে দিল—বনে যতো পশু আছে তার মধ্যে শেষ পর্যন্ত এরাই মানুষের সবচাইতে বেশী কাজে লাগবে।

লাগলও। মানুষ যে বিচারে ভুল করে নি, তা তো আমরা দেখতেই পাচ্ছি।

কি কি কাজে লাগাল মানুষ পশুকে? শুধু কি চাষ করা?

সেখানেই যদি মানুষ থেমে যেত, তবে এ লড়াইতে তাকে জিততে হত না।

ঘোড়া প্রথম মানুষের লাঙ্গল বইল, পরে তাকে পিঠে নিয়ে দূর-দূরান্তর ছুটে বেড়াল। দূরের দেশ কাছের দেশ হয়ে উঠল।

কুকুর তার বাড়ি পাহারা দিল।

আর গোরু? পুরুষ-গোরু বইল লাঙ্গল, আর মেয়ে-গোরুর দুধ ছিনিয়ে নিয়ে মানুষ নিজের দেহ

পুষ্ট করে তুলল। দুধ পান করল, দুধ দিয়ে ঘি-মাখন বানালো। তখনকার মানুষ যে ঘি-মাখন বানাতে জানতো তার তো প্রমাণ পাওয়া গেছে।

এই ভাবে মানুষ একটা নতুন খাদ্য আবিষ্কার করল। এ খাদ্য জোগাড় করতে কোন ঝুঁকি নেই তার। এ খাদ্য খেতে ভাল, আর দেখা গেল শরীরটাও ভালো রাখে। খাবারের জন্য প্রকৃতির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকার দরকার তার আর একদফা কমল।

প্রকৃতি আর একদফা হারল। মাথার লড়াই এগিয়ে চলল।

কিন্তু এগুলে হবে কি? পায়ে পায়ে কতো বাধা, বিপদ কতো! প্রকৃতি ছেড়ে কথা কইছে না —সমানে চলেছে তার মার। সে কতো রকমের মার! ঝড় আসছে সব উড়িয়ে, বাজ পড়ছে বুক কাঁপিয়ে, বান আসছে সব ভাসিয়ে, আগুন লাগছে বনে বনে, পুড়ে সব ছারখার। পৃথিবী দুলে দুলে, কেঁপে কেঁপে, ফেটে ফুটে চৌচির হয়ে যাচ্ছে—আর তার ভেতর থেকে ছুটে বেরুচ্ছে আগুন—আগুন—কেবল আগুন, বৃষ্টি আসছে আকাশ ভেঙ্গে—তখন মানুষ থমকে গেল!

কেন? এ তো নতুন নয়? এর আগেও তো মানুষ এসব দেখেছে— ?

দেখেছে বটে। কিন্তু তখন্ ভাবেনি কিছু, বোঝেনি কিছু। কারণ, ভাববার আর বোঝবার মতো মাথা তখনও তার হয় নি। আর হলেও ভাববার

সময় পায়নি। ভাববার অবসর ছিল না তার।

মানে ?

ঐ যে দেখলাম চাষ আবিষ্কারের ফলে তার জীবনে বিশ্রাম ও অবসর এলো, তাই তো তাকে থমকে দিল। হাতে যতক্ষণ কাজ থাকে ততক্ষণ কাজ ছাড়া আর কিছুই মাথায় আসে না। এতদিন মানুষের একমাত্র চিন্তা ছিল শিকার আর শিকার। আর একমাত্র কাজ ছিল পশু মার আর খাও। তাই যেই না তার জীবনে অবসর এলো, অমনি সে ভাবতে বসল।

সব চাইতে তাকে ভাবিয়ে তুলল প্রকৃতির মারগুলি। সে চিন্তিত হল, ভয় পেল। অবাক হয়ে তাকাল আকাশের দিকে। আকাশের সূর্য, চাঁদ, তারা তাকে ভাবিয়ে তুলল ; রাতের আঁধার, দিনের আলো দু-ই তাকে ভাবালো। বজ্র, বিদ্যুৎ, ঝড়, জল সব তাকে ভাবালো।

এ কি ? এ কেন ? কি করে একে ঠেকানো যায় ? কিভাবে এই মার থেকে বাঁচা যায়, এই হয়ে উঠল তার ভাবনা।

মানুষ ভেবে কূল পেলো না।

পাবে কি করে ? এ তো আর বনের বাঘ নয়, হাতি নয়, ভালুক নয় যে লড়া যাবে, পাথর ছোঁড়া যাবে, তীর ছোঁড়া যাবে, তাড়া করা যাবে ? একে তো ধরা যায় না, ছোঁয়া যায় না। কেমন শত্রু এ ? দেখা যাকে যায় না তার সাথে লড়া কি করে ?

তখন মানুষ থমকে গেল। তার মনে জেগে

উঠল ভয়, দারুন ভয়। সে বুঝল এ শত্রুকে কাবু করা যাবে না অস্ত্র দিয়ে। এ শত্রুর শক্তি তার নিজের শক্তির চাইতে ঢের ঢের বেশী। তখন সে অন্য পথ ধরল। সে হার মানল, মাথা নোয়াল এই দেখতে না-পাওয়া, বুঝতে না পারা ভীষণ শত্রু বা শক্তির কাছে। তার সাথে শক্তির পরখ করতে ছুটে গেল না হাতিয়ার নিয়ে। নানাভাবে তাকে খুশী করতে চাইল, তুষ্ট করবার চেষ্টা করতে লাগল।

মানুষের মনে ভক্তির উদয় হল, বিশ্বাস জন্ম নিল। প্রকৃতির এই শক্তিগুলিকে কতো রূপে কল্পনা করে মানুষ কতো রকমে তাদের খুশী করতে চাইল।

দেব-দেবীর জন্ম হল। পূজা-অর্চনার সৃষ্টি হল। আকাশে, বাতাসে, আগুনে, জলে, পর্ব্বত-অরণ্যে মানুষ দেব-দেবীর কল্পনা করে তাকে প্রণতি জানাল।

এইবার প্রকৃতি জিতল। কিন্তু মানুষ হারল না!

কি রকম হল? হেরেও হারলো না?

হয়, ও রকম হয়। এটা হল যুদ্ধের একটা বড় দরের কৌশল। বেকায়দা দেখলে সৈন্য-সামন্ত নিয়ে যে যতো নিরাপদে পালিয়ে আসতে পারে, সে ততো বড় সেনাপতি। পালিয়ে এসে আর একদিক দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়া। একদিকের হার বাঁচিয়ে আর একদিক দিয়ে মার দেওয়া।

এখানেও দেখছি প্রায় তাই। হাতিয়ার যেখানে

নাগাল পেল না, ভয় সেখানে পথ দেখাল। মানুষের উঁচু মাথা নীচু হল। পূজা দিয়ে, প্রার্থনা দিয়ে, স্তব দিয়ে, স্তুতি দিয়ে প্রকৃতিকে খুশী করতে চাইল। সে ঝড়ের কাছে প্রার্থনা করল, জলের কাছে করল, আগুনের কাছে করল, সূর্যের কাছে করল, পৃথিবীর কাছে করল। যেখানে যার কাছ থেকে এতটুকু বিপদের আশঙ্কা দেখেছে, তাকেই ডেকে বলেছে—'আমাকে তুমি মের না, আমাকে তুমি বাঁচাও। তুমি কতো বড়, আমি কত ছোট, আমি তোমাকে প্রণাম করি।' আরও কতো বলেছে, 'তোমাকে আমি এটা দিচ্ছি, ওটা দিচ্ছি, সেটা দেব, তোমাকে খুশী করছি—তুমি কতো ভাল, কতো সুন্দর, আমাকে বাঁচাও—আমাকে শক্তি দাও।'

প্রকৃতির ভয়ংকর চেহারার দিকে তাকিয়ে মানুষ হাত জোড় করে বলেছে—'হে রুদ্র, তোমার ঐ ভয়াল রুদ্র-রূপ আমাকে দেখিও না। তোমার যে শান্ত সুন্দর রূপ আছে, তাই আমাকে দেখাও। তাই দিয়ে আমাকে রক্ষা কর।'

ব্যাপার মন্দ না! যার সাথে লড়ছি, তাকেই বলছি—আমাকে বাঁচাও! শত্রুর কাছে প্রাণ ভিক্ষা—বল ভিক্ষা!

কিন্তু এতে কাজ হল এক ভাবে। মানুষের বিশ্বাস জন্মাল—যাদের ডাকা হচ্ছে, তারা ডাক শুনছে—এবং প্রার্থনা পূরণ করছে।

একেই বলে ধর্ম-বিশ্বাস।

এই বিশ্বাস থেকে মানুষের মনে সাহস এল, তার

ভয় দূর হল। নতুন সাহসে বুক বেঁধে মানুষ নানাভাবে প্রকৃতিকে আক্রমণ করে চলল।

সাহস দিয়ে উপকার করল বটে। কিন্তু আর একদিক দিয়ে এই ধর্ম-বিশ্বাস মানুষের একটা ভীষণ ক্ষতি করে বসল। সে বড় ভীষণ ক্ষতি। ধর্ম-বিশ্বাস কালক্রমে অন্ধ-বিশ্বাসে রূপ নিতে লাগল। মানুষ চিন্তা-ভাবনা, যুক্তি-বিবেচনা ছেড়ে দিয়ে শুধু এই বিশ্বাসকেই আঁকড়ে থাকতে লাগল। বিচার-বিবেচনা লোপ পেতে চলল। শাস্ত্রের পর শাস্ত্র তৈরী হতে লাগল। রুদ্র-প্রকৃতিকে খুশী করাই হল বড় কথা—অন্য কাজ বৃথা। মন্ত্র হল বড়—মানুষ হয়ে গেল ছোট। লড়াইর কথা সে প্রায় ভুলতেই চলল।

অজ্ঞান এসে জ্ঞানকে ঢেকে ফেলতে চাইল। মাথার লড়াইয়ে মানুষ এবার হেরে যায় বুঝি।—

হারে নি বটে শেষ অবধি। তবে বড্ড বেগ পেতে হয়েছে। কয়েক হাজার বছর ধরে জ্ঞান-অজ্ঞানের এই লড়াই চলেছে। সে বড় ভীষণ লড়াই। প্রাণী-প্রকৃতির যুদ্ধে প্রাণীর এতো বড় বিপদ আর কখনও আসেনি।

মানুষ চেয়েছিল প্রকৃতিকে এড়িয়ে গিয়ে লড়াই চালাবে। তোয়াজ করে কাজ হাসিল করবে। পেরেও ছিল খানিকটা। কিন্তু ঐ ধর্ম-বিশ্বাস অন্ধ-বিশ্বাসের রূপ নিয়ে মানুষের পথ আগলে দাঁড়াল। প্রকৃতিও পাশ কাটিয়ে মানুষকে দিল উলটো মার—সে বড় ভীষণ মার!

অন্ধকার এসে আলো নিভিয়ে দিল প্রায়!

তবুও দেখি অজ্ঞানের সেই অন্ধকারের মধ্যে মাঝে মাঝে দু-একটি জ্ঞানের আলো জ্বলছে। কিন্তু জগৎ-জোড়া অজ্ঞান আর অন্ধ-বিশ্বাসের মধ্যে জ্ঞানের সেই প্রদীপের দিকে কেউ ফিরে তাকায় নি সেদিন।

না তাকাক। তবু সেই আলোরই জয় হয়েছে শেষ অবধি। কিন্তু বড় কষ্টে।

অন্ধ-বিশ্বাস কি রকম?

সে তো হাজার রকম! ঐ যে ছোঁয়া-ছুঁয়ি, হাঁচি-টিক্‌টিকি, এটা করলে জাত যায়, ওটা করলে নরকবাস, মঙ্গলবারে এটা খায় না, রবিবারে ওটা—আরো কতো! এতো আমরা এখনও রোজ দেখছি।

তবু এতো ছোট-জাতের অন্ধ-বিশ্বাস। বিশেষ ক্ষতি হয় নি এতে। এর বড়গুলো অতি মারাত্মক। এত মারাত্মক যে আজও যদি মানুষ সেগুলো আঁকড়ে বসে থাকত, তাহলে মানুষের সভ্যতার বিকাশ ওখানেই শেষ হত—চিরদিনের মতো হেরে যেত সে।

তাই নমস্কার জানাই সেই গুটিকয়েক নির্ভীক জ্ঞানের পূজারীকে যাঁরা অজ্ঞান ও অন্ধ-বিশ্বাসের সেই ঘন আঁধারের মধ্যেও যুগে যুগে জ্ঞানের আলো জ্বেলে বসেছিলেন। কোন অত্যাচারই তাঁদের হটাতে পারে নি, মৃত্যুভয়ও তাঁদের পিছু-পা করতে পারে নি সেদিন।

সত্য-সাধক তাঁরা। প্রাণকে তাঁরা প্রকৃতির চরম মার থেকে বাঁচিয়েছেন।

বড় অন্ধ-বিশ্বাসগুলো কি রকম?

যেমন বহুকাল মানুষের বিশ্বাস ছিল যে সাপেদের রাজা বাসুকি ফণা মেলে পৃথিবীটাকে তার উপর ধরে রেখেছে। সে যখনই নড়াচড়া করে, তখনই পৃথিবী কেঁপে ওঠে, তার ফলেই ভূমিকম্প।

আবার যেমন, ঈশ্বর একদিন সুন্দর করে পৃথিবীটাকে সৃষ্টি করলেন, একেবারে তাঁর মনের মতন করে। তারপরে মানুষ নামে একটি অতি সুন্দর জীব বানিয়ে তাকে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দিলেন, আর বলে দিলেন—'যাও, এবার তুমি পৃথিবী ভোগ করগে'।

কাজেই ঈশ্বরের খাস-দরবারে তৈরী যে পৃথিবী, সেই পৃথিবী কি কখনও কারুর হুকুমে চলতে পারে? কখনই না। সুতরাং রাত্রি-দিন যে ঘুরে ঘুরে আসে, তার কারণ হল ঐ 'আগুনে' সুর্যটা পৃথিবীর চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর এ তো খুব সোজা কথা। কারণ তাই যদি না হবে, অর্থাৎ পৃথিবীই যদি ঘুরে বেড়াবে, তবে তো আমাদের সবাইর ছিটকে পড়ে যাওয়ার কথা। আর পৃথিবীই যদি ঘুরবে, তবে সকালে বাসা ছেড়ে পাখিরা বেরিয়ে সন্ধ্যায় আবার বাসা খুঁজে পায় কি করে? তা তো সব হারিয়ে যাবে যে!

সুতরাং পৃথিবী এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে আর সুর্য তার চারধারে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

সুর্য ঘুরুক, আর পৃথিবীই ঘুরুক, এই অন্ধ-বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে আমরা একটা জিনিস বেশ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। তা হল, রাত্রি দিন কেন হয়,

তাই নিয়ে মানুষের ভাবনা শুরু হয়েছে। আর তারই ফলে মানুষ সুর্যকে ঘুরিয়েছে। আর ঘুরিয়েছে তাকে গোলাকার পথে।

মাথার যুদ্ধ একেবারে থেমে যায় নি তা হলে ?

কিন্তু ঐ অবধিই—আর এগুলোনা তার চিন্তা। মানুষ এই বিশ্বাসকেই আঁকড়ে রইল বহু-বহু কাল। এত গভীর ছিল এই বিশ্বাস যে এর বিরুদ্ধে কথা কইতে কেউ সাহস পেত না। শাস্ত্রের বিরুদ্ধে কথা কইবে কে ?

কিন্তু কথা কইল। ঐ যে বলেছি নির্ভীক জ্ঞানের পূজারীদের কথা—অন্ধকারের মধ্যে প্রদীপের মতো জ্বলছিল যারা—তাঁদেরই একজন।

নাম তাঁর আর্যভট্ট। কয়েক হাজার বছর আগে জন্মেছিলেন ভারতবর্ষে। মহাজ্ঞানী তিনি। বহুকাল আকাশের দিকে তাকিয়ে রইলেন তিনি,—বহু হিসাব-পত্র কষলেন—বহুদিন ধরে। তার পরে সবাইকে ডেকে বললেন, 'না, সুর্য ঘোরে না, ঘোরে পৃথিবী। শুধু পৃথিবী নয়, পৃথিবীর মত আরও কতগুলো, তাদের বলে গ্রহ। তারা ডিগবাজী খাচ্ছে আর ঘুরছে সুর্যের চারধারে। আর সুর্য ঠাঁয় দাঁড়িয়ে আছে—আর দাঁড়িয়ে আছে ঐ তারাগুলো।'

কিন্তু কে শোনে কার কথা ? কত ঠাট্টা, কত অপমান তাঁকে করল মানুষ। গ্রাহ্যই করল না তাঁর কথা।

সুতরাং সুর্যই ঘুরে চল্‌ল—আরও বহুকাল।

তারপর এলেন আর একজন। এবার ভারতবর্ষে

নয়। বহুদূরে। ইউরোপ মহাদেশের পোল্যাণ্ড নামে দেশে। আজ থেকে চারশো সাতআশী বছর আগে জন্মেছিলেন তিনি। তাঁর নাম কোপার্নিকাস। অনেক আঁক কষে, অনেক হিসেব করে, প্রায় চল্লিশ বছর ধরে একটানা পরিশ্রম করে তিনিও বল্‌লেন—পৃথিবীই ঘোরে, সূর্য নয়। হৈ চৈ পড়ে গেল ইউরোপে। বলে কি? পাগল না ক্ষ্যাপা? শাস্ত্র বলে সূর্য ঘোরে, আর পাষণ্ড বলে কিনা পৃথিবী? চরম অপমান জুটেছিল তাঁরও ভাগ্যে।

ওদিকে ব্রুণো নামে একজন খৃষ্টান পাদ্রী ছিলেন সেই সময় ইতালীতে। তিনিও মহাপণ্ডিত। জ্ঞানের এই পরাজয় তাঁর সহ্য হল না। সমস্ত ভয় ভাবনা হেলায় ঠেলে তিনি এগিয়ে এলেন। বললেন—'কোপার্নিকাস ঠিকই বলেছেন। পৃথিবীই ঘোরে। শাস্ত্র যা বলেছে তা ভুল। আর পৃথিবী গোল। তার উত্তর দক্ষিণ কমলালেবুর মত চাপা'।

আর যায় কোথা? ইতালী হল পোপের দেশ। পোপ ছিলেন তখনকার পৃথিবীর সমস্ত খৃষ্টানদের গুরু, তাদের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। খৃষ্টান ব্রুণো, পাদ্রী ব্রুণোর এতো বড় কথা?

ব্রুণোকে ধরে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারা হল।

তবুও আলো নিভল না।

এর কিছুকাল পরে, আবার সেই ইতালীতে জ্ঞানের আলো জ্বলে উঠল।

পাদুয়ার অঙ্কের মাষ্টার গ্যালিলিও। তাঁর মাথায় নানারকম চিন্তা। একদিন করলেন কি, কাঁচ

ঘষে ঘষে একটা চোঙার দু' মাথায় দুটো বসিয়ে, একটা মাথায় চোখ লাগিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগলেন।

বাঃ রে! বেশ মজা তো! কতো দূরের জিনিস কতো বড় হয়ে তাঁর চোখের সামনে ধরা দিচ্ছে! তাকালেন তিনি সমুদ্রের দিকে। বহু দূরের জাহাজ কতো বড় আর স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে! লোক ডেকে ডেকে তাদের দেখালেন। তার পরে একদিন করে বসলেন এক কাণ্ড! যন্ত্রটা আকাশের দিকে তাক করে রইলেন তাকিয়ে। বহুদিন ধরে এমনিভাবে তিনি আকাশ পরীক্ষা করলেন। তার পরে একদিন বলে বসলেন, 'নাঃ, সূর্য নয়, ঘোরে পৃথিবী, ঘোরে গ্রহরা!



গ্যালিলিও

সূর্য এক জায়গায় দাঁড়িয়ে পাক খাচ্ছে—আর ঘুরে

মরছে পৃথিবী আর গ্রহের দল'।

সেই এক কথা—আর্যভট্ট, কোপার্নিকাস্ আর ব্রুণোর কথা। তবে তফাৎ এই, এঁরা যা বলেছিলেন হিসেব কষে—উনি তা প্রমাণ করলেন চোখের দেখায়।

দূরবীন আবিষ্কার হল পৃথিবীতে।

কিন্তু অন্ধ-বিশ্বাস ক্ষমা করল না গ্যালিলিওকে। তাঁর বিচার হল, জেল হল।

গ্যালিলিও জেলে গেলেন বটে—কিন্তু পৃথিবীটাকে ঘুরিয়ে দিয়ে গেলেন চিরদিনের মতো। সেই যে পৃথিবী ঘুরতে শুরু করেছে, আজও সমানে ঘুরে চলেছে, ঘুরবে সৃষ্টির শেষ দিন অবধি।

গ্যালিলিওর আবিষ্কার মানুষ মেনে নিতে বাধ্য হল। জ্ঞানের হল জয়।

আলো এসে অন্ধকার দূর করল। প্রাণের জয়-যাত্রা আবার এগিয়ে চল্‌ল। প্রকৃতি চরম হারা হেরে গেল।

গ্যালিলিও যে সত্য প্রমাণ করলেন, প্রাণ-প্রকৃতির যুদ্ধের ইতিহাসে তা যে কতো বড় ঘটনা, তা বলে শেষ করা যায় না। সোনার অক্ষরে বড় বড় করে লিখে রাখবার মতো কথা এটা।

কেন?

এই সবচাইতে বড়, সবচাইতে মারাত্মক অন্ধ-বিশ্বাসটি যদি দূর না হত, তবে আমরা আজও গ্যালিলিওর সময়কার দুনিয়াতেই থেকে যেতাম। হয়তো আরও সব অন্ধ-বিশ্বাসে জড়িয়ে পড়ে কেবলই

পিছু হটতে থাকতাম।

সূর্য নয়, ঘুরছে পৃথিবী। এই সত্যটি জানবার পর থেকে লড়াই-এর চেহারা একদম পালটে গেল। মাথার লড়াই আবার শুরু হল পুরোদমে। প্রকৃতি ভয় দেখিয়ে ধর্মের নামে যে অন্ধ-বিশ্বাস মানুষের মনে ঢুকিয়ে দিয়েছিল—এতদিনে তা ঝরা পাতার মত ঝরে ঝরে, খসে খসে পড়তে লাগল।

আর শুধু বিশ্বাস নয়, শুধু শাস্ত্রের কথা নয়। এবার শুধু যুক্তি, শুধু বিচার-বিবেচনা, বুদ্ধি। শুধু জ্ঞানের আলোতে এবার পথ চিনে চলা, বিশ্বাসের হাত ধরে নয়।

শেষ লড়াই ঘনিয়ে এলো বুঝি—

চার

শেষ লড়াই

গ্যালিলিও মানুষের মনের বন্ধ দরজা খুলে দিলেন। তার ভয় ভেঙ্গে গেল। মানুষ মুক্তি পেল। দিকে দিকে দেশে দেশে কত নতুন নতুন আবিষ্কার হতে লাগল। বিজ্ঞান-সাধনার পথ থেকে ধর্ম আর শাস্ত্র সরে দাঁড়াল। পায়ে পায়ে প্রকৃতি হেরে যেতে লাগল।

মানুষ চল্‌ল জোর পায়ে এগিয়ে।

* * * *

* * *

এগুবার পথে প্রাণীকে সবচেয়ে বড় বাধা পেতে হয়েছে জলের কাছ থেকে। এই বাধা যদি সে

উৎরোতে না পারত, তবে ওখানেই তার শেষ হত।

প্রথম প্রাণ এসেছিল জলে, তা আমরা দেখেছি। কয়েক কোটি বছর ধরে জলের মধ্যেই চলেছিল তার বিকাশ। সে জলে ডিম পাড়ে, জলের মধ্যেই বড় হয়। ডাঙ্গায় তুললেই মরে যায়, এখনও যেমন হয় মাছের জীবনে।

তারপরে প্রাণী একদিন জলের দাসত্ব কাটিয়ে ডাঙ্গায় উঠল। আর সেই দিন থেকে শুরু হল তার জয়যাত্রা। জলের দাসত্ব কাটাল বটে, কিন্তু থাকত জলের কাছ ঘেঁষে। বিপদ বুঝলেই জলে ঝাঁপ দিত।

তার পরে প্রাণী আরও এগুল। তখন শুধু মাঝে মাঝে জল খাওয়া ছাড়া, জলের দরকার আর বড় হত না। তখনও তারা ভরসা করে জল ছেড়ে খুব বেশী দূর এগুতে পারে নি। তাই তো দেখি, সেই যুগের জন্তু-জানোয়াররাও যেমন জলের কাছাকাছি থাকত, মানুষও তেমনি থাকত। জলের উপর ঘর বাঁধত তারা।

তারপরে চাষ করতে গিয়েই মানুষের টনক নড়ল। জল ছাড়া চাষ হয় না, আর জল তো তার ইচ্ছামত আসা-যাওয়া করবে না। কিন্তু জলকে বাগে না আনতে পারলেও তো টেকা দায়!

কাজেই শুরু হল জলের সাথে লড়াই।

প্রথম দিকটায় মানুষ জলের কূল ঘেঁষেই চাষ-আবাদ করত। মাটিতে গর্ত খুঁড়ে রাখত, নালা-খানা কেটে রাখত। বানের জল জমি ডুবিয়ে দিয়ে যখন নেমে যেত, ঐ নালা-খানা-ডোবাগুলো থাকত

জলে ভর্তি হয়ে। তাই দিয়েই কিছুদিন চলত। তারপরে আবার বানের মুখ চেয়ে বসে থাকতে হত। এইভাবে বৃষ্টির জলও ধরে রাখা হত।

কিন্তু এ তো শুধু প্রকৃতির মুখ চেয়ে বসে থাকা, প্রকৃতির দয়ার উপরে ভরসা করেবসেথাকামানুষ তা চায়নি তো!

ওদিকে আবার জল নেই—জল নেই, তো এমন জল এলো যে সব শেষ! মাঠ-ঘাট ডুবে গেল, খেত-খামার ভেসে গেল, ঘর-দোর ভেঙ্গে পড়ল, গোরু-মোষ ভেসে গেল, কত মানুষ ডুবে মরল। সর্বনেশে বান এসে গেছে, বৃষ্টি ঝরছে তো ঝরছেই, আর থামছেই না। নদী-নালা ফুলে, ফেঁপে, ফুঁসে উঠেছে—সব যেন গিলে নেবে! মানুষের ভারী বিপদ হল—জল না পেলেও বিপদ, বেশী জলেও বিপদ।

জলের অভাবে মাটি শুকোতে শুকোতে মরুভূমি হয়ে যাচ্ছে, ওদিকে আবার অতি জলে সব ভেসে, ডুবে যাচ্ছে।

হাজার হাজার বছর ধরে মানুষ ভেবেছে কি করে জলকে বন্দী করে হুকুম মতো চালানো যায়।

তাই তো দেখি, আজ থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে চীন দেশের মানুষ প্রায় হাজার মাইল লম্বা একটা খাল কেটে ফেলেছে। সেই খালের জলে তাদের চাষের জমির মাটি ভিজত, বানের জল, বৃষ্টির জল সেই খাল বেয়ে নেমে যেত। চাষও হত, বানও ঠেকত।

এর চাইতেও বেশী লড়াই করেছে মিশর দেশের

মানুষ। মিশর দেশে বৃষ্টি নেই—প্রায় গোটা দেশটা জুড়ে মরুভূমি—খাঁ-খাঁ করছে। তারই মধ্য দিয়ে বয়ে চলেছে নীল নদ। অথচ এই মরুভূমির মধ্যেই শুধু নীল নদকে সম্বল করে বহু প্রাচীনকাল থেকেই মানুষের সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। মিশরের মানুষ লড়েছে জলের সাথে, মরুভূমির সাথে—প্রাণপণ লড়াই।

প্রথমটায় তারা নীলের কূল ঘেঁষেই চাষ করত। বানের জল, জোয়ারের জল মাটি ভিজিয়ে দিয়ে যেত। কিন্তু এতে তো চলে না। কারণ যে বছর নীলের জল কম থাকত, জোয়ার তেমন জাগত না, বান আসত না, সে বছর ফসল ফলত না। দেশে লাগত আকাল। তাই, আজ থেকে হাজার চার বছর আগে দেখতে পাই, মিশরের মানুষ নীল নদ আর লোহিত সাগরকে জুড়ে দিয়েছিল একটা খাল কেটে। কিন্তু তাতেও বিশেষ সুবিধা হল না। মরুভূমির কাছ থেকে মাটি ছিনিয়ে না আনা পর্যন্ত তারা থামবে না।

ছিনাবে কি করে ?

জল দিয়ে। জল ঢেলে মরুভূমিকে ঠাণ্ডা করবে, উর্বর করবে, তার পরে তার বুকে ফলাবে সোনার ফসল। বহুকাল ধরে এই লড়াই চলেছে মিশরে। তার পরে দেখতে পাই চার-চারটে বাঁধ তুলে মিশরের মানুষ আটকে ফেলেছে নীল নদের জল। প্রকাণ্ড, বিরাট বাঁধ সেগুলো। নীল বন্দী হল মানুষের হাতে। বাঁধের মধ্যে জল আটকা পড়ল। আর সেই জল মানুষের ইচ্ছা মত, হুকুম মত ছুটে চল্‌ল ডাঙ্গার

দিকে। আর বান-জোয়ার-বৃষ্টির মুখ চেয়ে বসে থাকতে হল না। মিশরের শুকনো মাটি সরস হয়ে উঠল। সবুজের বন্যা এলো মিশরের মাঠে মাঠে। লক্ষ লক্ষ বিঘা জমি মানুষ ছিনিয়ে আনল মরুভূমির মুখ থেকে। প্রায় সারা বছরই এখন চাষ হয় মিশরে।

কি করে যে মানুষ আজ এই দুরন্ত নদীগুলোকে বেঁধে ফেলেছে, তা ভাবলেও অবাক হতে হয়। কী পরিশ্রম, কী বুদ্ধি, কী সাহস, কী ধৈর্য যে এতে দরকার, তা বলে বোঝানো যায় না।

নদীও কি সহজে ছেড়ে কথা কইছে? হঠাৎ পাগলা হয়ে উঠেছে, মাতাল হয়ে উঠেছে। ভেঙ্গে-চুরে, সব তছনছ করে, দুই তীর ভাসিয়ে দূরন্ত বেগে সে ছুটে চলেছে। মানুষের হাতে সে ধরা দেবে না, কোন বাধা সে মানবে না। যেখানেই মানুষ নদী বাঁধতে গিয়েছে, সেখানেই বারবার এরকম হয়েছে। দামোদরের বাঁধ ভেঙ্গেছে অনেকবার। কিছু কাল আগে পাঞ্জাবে ভাক্‌রা-নাঙ্গাল বাঁধ ভেঙ্গে কতো মানুষ মরল, কতো কোটি টাকা নষ্ট হল।

তবুও মানুষ পিছু হটেনি।

ভারতবর্ষের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে ভারত মহাসাগর আর প্রশান্ত মহাসাগরের মাঝখানে অষ্ট্রেলিয়া নামে মস্তবড় একটা দ্বীপ আছে। দ্বীপটা খুব বড় বলে একে মহাদেশ বলা হয়। এখানকার লোকদের ভারী মুস্কিল হল জল নিয়ে। এর কোন কোন জায়গায় জল বলতে কিছুই নেই। কাজেই খাল

কেটে জল আনা, বা বাঁধ বেধে জল আটকানো, এর কোনটাই সেখানে চলে না। কিন্তু জল না হলে চলবে কেন? জল পেতেই হবে যে। তাই তারা করল কি, মাটি ফুটো করে তার মধ্যে মোটা মোটা লোহার পাইপ বসিয়ে দিল, হাজার হাজার ফুট নীচু অবধি। মাটির তলায় যে জল আছে তাতো আমরা নলকূপ থেকেই বুঝতে পারি। এখন পাইপগুলো যেই না হাজার হাজার ফুট মাটির তলায় জলের কাছে পৌঁছাল, অমনি হু হু করে জল ঠেলে উঠতে লাগল পাইপ বেয়ে। বড় বড় পুকুর কেটে ধরে রাখল সেই জল। ব্যাস্, চুকে গেল ল্যাঠা! আর অভাব নেই জলের—এখন যা খুশী তাই করা যাবে এই জল দিয়ে।

মানুষ পৃথিবীর বুক চিরে জল লুটে আনল।

ওদিকে সুইজারল্যাণ্ডের বিপদ আবার অন্যরকম। সেও বড় কম নয়। সুইজারল্যাণ্ড ইউরোপের ছোট্ট একটি পাহাড় ঘেরা দেশ। সেখানেও জলের অভাব খুব। পাহাড়ের মাথায় মাথায় বরফ জমে আছে, কিন্তু নীচের চাষের জমিতে জল নেই। তা ছাড়া রোদে যেটুকু বরফ গলে, তাও আবার এদিক-ওদিক চলে যায়, পুরো কাজে লাগানো যায় না। কিন্তু চাষ তো করতেই হবে। কাজেই জল চাই। শত শত বছর পরিশ্রম করে সেখানকার লোকেরা তাদের মাঠে জল আনাবার একটা অদ্ভুত উপায় বার করেছে।

তারা করেছে কি, পাহাড়ের সেই মাথা থেকে

পাথর কেটে কেটে সরু সরু সব নালা বানিয়েছে। সেই নালাগুলোকে পাহাড়ের গা দিয়ে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে এমন একটা জায়গায় এনে ফেলেছে যেখানটা খুব খাড়া।

তার পরে বড় বড় গাছ ফোকর করে নালার সেই ছোট্ট মুখের সাথে লোহার আংটা দিয়ে বেশ শক্ত করে এঁটে দিয়েছে। এবার যাক না জল, কোথায় যাবে? বরফ-গলা সব জল এই পথ ছাড়া এখন আর বেরুতে পারে না। দিব্যি চাষ করছে তারা এখন। এই জল যদি কেউ নষ্ট করে, তবে দেশের আইনে তার শাস্তি হয়।

পাহাড়ের মাথায় জমাট-বাঁধা জলকেও ছাড়ল না মানুষ।

এটা তো দেখলাম শুধু জলের সাথে লড়াই-এর একটা দিক মাত্র। জলকে বাগ মানিয়ে চাষের কাজে লাগানো—মরুভূমির বুক থেকে জমি ছিনিয়ে আনা।

ওদিকে জলের সাথে আর একরকম লড়াই চলেছে হল্যাণ্ড দেশে। সে বড় ভীষণ লড়াই। এ হল সমুদ্রের বুক থেকে জমি ছিনিয়ে আনার লড়াই। একেই তো পৃথিবীর চারভাগের তিন ভাগই হল জল। বাকী ঐ একটি ভাগে যেটুকু ডাঙ্গা আছে, তাও যদি জল এসে কেড়ে নেয়, তবে মানুষ থাকবে কোথায়? তাই হল্যাণ্ডের মানুষ রুখে দাঁড়িয়েছে। সমুদ্রকে হটিয়ে দিয়ে তার মুখ থেকে জমি ছিনিয়ে নেবে তাঁরা।

হল্যাণ্ড হল ইউরোপের উত্তর সাগরের কূল ঘেঁষে ছোট্ট একটি দেশ। এই দেশের বেশীর ভাগ জায়গাই সমুদ্রের বুক থেকে নীচু। কাজেই সমুদ্রের সাথে তাদের লড়াই চিরদিনের। কতবার সমুদ্রের জল এসে তাদের দেশ ভাসিয়ে নিয়েছে—কত মানুষ মরেছে। তবু তারা লড়েই চলেছে।

শুধু যদি ডুবিয়ে ভাসিয়ে দিয়েই চুপ থাকত সমুদ্র, তবুও হত। কিন্তু বিপদ দাঁড়াল আরও সাংঘাতিক। সমুদ্র ধীরে ধীরে দেশের মাটি গ্রাস করতে লাগল। সমুদ্র এগিয়ে আসছে—দেশ বুঝি আর টেঁকে না! ঐ দেশের ছোট্ট একটি হ্রদ। নাম তার জুইডার জী। সমুদ্রের আক্রমণে দিনে দিনে সেও ছোটখাটো একটি সাগর হয়ে দাঁড়াল, কোন কোন জায়গায় আশী মাইল লম্বা, এবং পঁয়তাল্লিশ মাইল চওড়া। এ তো চলতে পারে না! এতো জমি সমুদ্র কেড়ে নেবে? কিছুতেই না। সমুদ্র আর নদীগুলোর তীর ধরে তারা বাঁধের পর বাঁধ বেঁধে তুলল—শক্ত কঠিন বাঁধ। নীচু জমির জল বার করবার জন্য হাজার হাজার মাইল খাল কাটল। হাওয়া কল বসিয়ে তাই দিয়ে পাম্প করে সমুদ্রের জল সমুদ্রে ফিরিয়ে দিল। তার-পরে চলল রাতদিন সেই বাঁধ পাহারা। বিশ্বাস নেই, কোথা দিয়ে সমুদ্র এসে বাঁধে আবার ফাটল ধরিয়ে দেয়!

কী পরিশ্রম, কী সাহস, কী ধৈর্য ও বুদ্ধি নিয়ে হল্যাণ্ডের লোকেরা শত শত বছর ধরে সমুদ্রের

সাথে যুঝে আসছে, তা ভাবতেও অবাক লাগে। আজও তারা টিকে আছে। সমুদ্রের জল তাদের



হাওয়া কল

মাটির অনেক উঁচুতে—বাঁধ ঠেকিয়ে রেখেছে সেই জলকে। একবার ভাঙ্গলেই সর্বনাশ! তবুও তারা নির্ভীক। তারা এগিয়ে চলেছে।

জলকে মানুষ আরও নানারকম ভাবে পরাস্ত করে কাজে লাগিয়েছে।

খুব বেগে-ছুটে-চলা জলকে ধরে মানুষ নানারকম কল চালিয়েছে। একটা কলকে চালু করতে সবাইর প্রথম যে শক্তিটা দরকার, সেটা আসে তাপ থেকে—হয় কয়লা পুড়িয়ে, নয় তেল পুড়িয়ে, নয়তো বিদ্যুৎ থেকে। এতে খরচা খুব বেশী। যদি অল্প খরচায় সেই শক্তিটা পাওয়া যায়, তবে মন্দ কি? তাই মানুষের মাথায় এলো জলের শক্তির কথা।

জল যখন খুব বেগে ছুটে চলে, অথবা অনেক উপর থেকে নীচে নেমে আসে তখন একটা ভীষণ শক্তির সৃষ্টি হয়।

মানুষ সেই শক্তিটাকে কাজে লাগিয়ে বসল। তাই দিয়ে কল চালিয়ে বিদ্যুৎ তৈরি করল, ভারী ভারী জিনিস তোলাল। আরো কতো কি করল! বড় বড় ঝরণা, জলপ্রপাত এবং বাঁধের জল দিয়ে আজকাল খুব সস্তায় জল-বিদ্যুৎ তৈরি হচ্ছে। আমাদের দামোদরের বাঁধের জলে তৈরি বিদ্যুৎ বহু গ্রাম ও শহরে আজ আলো জ্বালিয়েছে।

এখানেই শেষ নয়। মানুষ জলকে সহজে ছাড়ে নি।

ফুটন্ত জলের বাষ্প কেৎলির ঢাকনা ঠেলে তুলছে। তাই না দেখে মানুষ বুঝল বাষ্পের মধ্যে প্রচণ্ড শক্তি লুকিয়ে আছে। আর যায় কোথা? কতো পরিশ্রম, কতো পরীক্ষা! তার পরে আজ থেকে প্রায় দুশো তিরাশী বছর আগে ডেনিস পেপিন নামে একজন ফরাসী বিজ্ঞানী বাষ্প-শক্তি দিয়ে চালানো যায়, এমন একটা কল বানিনে ফেল্‌লেন। 'ষ্টিম-ইঞ্জিন' যাকে বলি, এইভাবে তা প্রথম আবিষ্কার হল। এই ষ্টিম-ইঞ্জিন কালক্রমে ষ্টিমার চালাল, জাহাজ চালাল, রেলগাড়ি চালাল—আরও কতো কি করল। পেপিনের পরে একজন ইংরেজ বিজ্ঞানী, জেম্‌স্ ওয়াট্ ষ্টিম-ইঞ্জিনকে আরও উন্নত করে তোলেন।

এইভাবে মানুষ জলের সঙ্গে লড়াই করছে। জল

হার মেনেছে—মাথা নুইয়েছে। হয়তো দিন আসবে যখন সমুদ্রের ঢেউ-এর প্রচণ্ড শক্তি মানুষের হুকুমে কাজ করে যাবে।

আগুনকে মানুষ বড় ভয় করেছে। আকাশের বিদ্যুৎ আর বনের আগুন তাকে হক্‌চকিয়ে দিয়েছে।

সেই আগুন যেদিন প্রথম তার হাতে ধরা দিল, সেইদিন আগুনের তাপের চাইতে আলোর দিকটাতেই তার নজর পড়েছিল বেশী। কারণ, সে দেখতে পেয়েছিল, এতে অন্ধকার দূর হয়। আরও একটা মজার জিনিস সে লক্ষ্য করেছিল—আগুন দেখে জন্তু-জানোয়ারগুলো ভয় পায়—আর পালিয়ে যায়।

তাই চেষ্টা চল্‌ল আগুন জিইয়ে রাখার।

প্রথমটায় পাতা-টাতা জড়ো করে আগুন জ্বালিয়ে রাখার চেষ্টা চল্‌ল। এতে সুবিধা হল না।

তারপর থেকে দেখতে পাই মানুষ কতো রকম চেষ্টা করে চলেছে আলো জ্বালিয়ে রাখবার জন্য। এলো মশাল। কিন্তু চল্‌ল না। এলো মাটির প্রদীপ—নানা দেশে নানারকম চেহারার। জ্বালানো হত পশুর চর্বি দিয়ে। তারপরে এলো মোমবাতি। এই মোমবাতি প্রথম আবিষ্কার হয়েছিল ইটালীর রোমে। প্রদীপ আর মোমবাতি বহুদিন মানুষের আলোর কাজ চালিয়েছে। চর্বির বদলে রেড়ি বা সর্ষের তেল দিয়ে প্রদীপ জ্বালানো হয়েছে পরে। গাছের ফলের মধ্যেও যে তেল লুকিয়ে থাকতে পারে, মানুষ তাও টের পেয়েছিল।

মাথার লড়াই আর কাকে বলে!

কিন্তু মানুষ ওখানে থামলো না। আলো তার চাই, বেশী আলো, উজ্বল আলো, নিরাপদ আলো, আরো আলো।

তার পরে আজ থেকে একশ একাশী বছর আগে উইলিয়াম মারডক্ নামে এক ইংরেজ ভদ্রলোক এক অসম্ভব কাণ্ড করে বসলেন। কয়লা নিয়ে পরীক্ষা করতে করতে তিনি দেখতে পেলেন, কয়লা পোড়ালে যে গ্যাস বার হয়, তাতে আগুন লাগালে জ্বলে ওঠে, আর একটা অদ্ভুত উজ্বল আলো দেখা দেয়। তিনি গ্যাসের বাতি তৈরী করে ফেল্‌লেন। মস্তবড় একটা আবিষ্কার হল পৃথিবীতে।

গ্যাস এসে প্রদীপ আর মোমবাতির আসন কেড়ে নিল। ঘরে ঘরে গ্যাস জ্বল্‌ল, রাস্তায় রাস্তায় গ্যাস জ্বল্‌ল। রাত্রিগুলি দিনের মতো হয়ে উঠল। এই সেদিনও কলকাতার রাস্তায় গ্যাসের আলো দেখা যেত।

তার পরে এলো বিদ্যুৎ, চোখ-ঝল্‌সানো আলো নিয়ে। গ্যাসেরও দিন ফুরোল। বিদ্যুতের রাজত্ব চল্‌ল—এখনও চলছে।

পাথর-ঠোকা আগুনের ফুলকির মধ্যে আদিম মানুষ যে আলোর খোঁজ পেয়েছিল, কতো না লড়াই করে সেই আলোকে আজ সে বন্দী করে ফেলেছে।

আলো নিয়ে মানুষের পরীক্ষার শেষ নেই। সুর্য থেকে পৃথিবীর জন্ম, এই কথাটা চালু হওয়ার পর থেকে অনেকেই বিশ্বাস করেনি কথাটা। কতো

প্রশ্ন করেছে, কতো সন্দেহ জেগেছে মানুষের মনে! তারা বল্‌লে, চোখের দেখায় প্রমাণ চাই, যেমন প্রমাণ দিয়েছিলেন গ্যালিলিও।

প্রমাণ? কি রকম প্রমাণ?

সুর্যের মধ্যে যে সব জিনিস আছে, পৃথিবীতেও তার খোঁজ চাই। দিতে পারো ভালো, নইলে রইল তোমার কথা, বিশ্বাসই করিনে।

প্রমাণের চেষ্টা চল্‌ল, অক্লান্ত চেষ্টা। তার পরে আবিষ্কার হল এক যন্ত্র, নাম তার স্পেক্‌ট্রোস্কোপ। ঐ যন্ত্র দিয়ে সুর্যের আলো ভেঙ্গে পরীক্ষা চল্‌ল। একে বলে বর্ণালী পরীক্ষা। ফলে জানা গেল, সুর্য সাতানব্বুইটা পদার্থে তৈরি। সেই পদার্থগুলি গ্যাসীয় অবস্থায় জ্বলছে সুর্যের মধ্যে। খোঁজ করে পৃথিবীতেও সেই সাতানব্বুইটা পদার্থের হদিস মিল্‌ল। এদের বলে মৌলিক পদার্থ। এই বর্ণালী পরীক্ষায় আমাদের দেশের বিজ্ঞানী ডক্টর মেঘনাদ সাহার দান অসীম। গ্যালিলিওর দূরবীন আবিষ্কারের পরে এতবড় আবিষ্কার পৃথিবীতে আর গুটিকয়েক মাত্র হয়েছে।

শুধু আলো নিয়ে পরীক্ষা মানুষকে কোথায় নিয়ে চল্‌ল?

শেষ হয়নি এখনও।

পৃথিবীতে যতো রং দেখি আমরা তার গোড়ায় হল সুর্য। সুর্যের আলোতে সাতটা রং লুকিয়ে আছে—বেগুনী, নীল, আসমানী, সবুজ, হলুদ, কমলা আর লাল। এই সাতটা আলোক-রশ্মি মিলেমিশে

পৃথিবীর গায়ে এসে পড়ে। মানুষ একেও রেহাই দেয়নি। খুঁজে-পেতে জেনে ফেলেছে কোন আলোক-রশ্মিটার কি গুণ। দেখা গেছে, বেগুনী-রশ্মি যেটা, সেটাই মানুষের সবচাইতে বেশী উপকার করে। বহু কঠিন রোগ সারিয়ে দেয়।

তাই এক সময় ডাক্তারেরা রুগীদের খালি গায়ে রোদ লাগাতে পরামর্শ দিতেন। কিন্তু সূর্যের মুখ চেয়ে বসে থাকা চলবে না তো। বন্দী করতে হবে ওকে।

করাও হল। মানুষ বেগুনী-রশ্মি তৈরি করল। আজ বড় বড় হাসপাতালে বেগুনী-রশ্মির আলো জ্বালিয়ে কতো রোগের চিকিৎসা হচ্ছে!

এর পরে একদিন যা ঘটে গেল, তার তুলনা নেই। ঘটনাটা ঘটেছিল হঠাৎ। কিন্তু তার ফল যা দাঁড়াল তাতে মানুষের জয়-যাত্রাকে আরও বহুদূর এগিয়ে নিয়ে গেল।

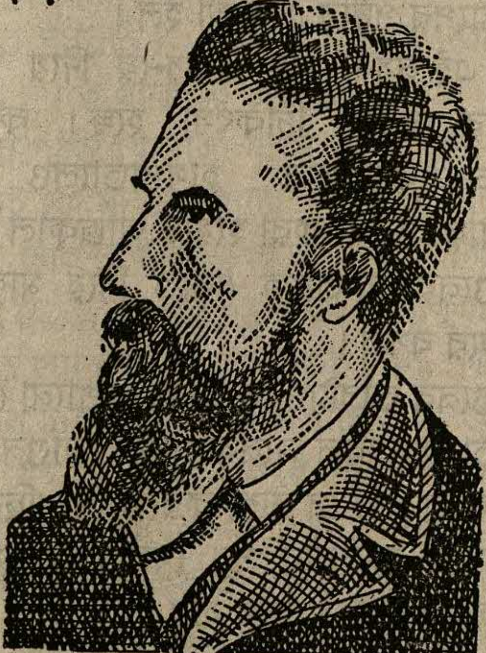
বিজ্ঞানী রন্‌টগেন। ইউরোপের প্রুশিয়া দেশে তাঁর জন্ম। আজ থেকে আটাত্তর বছর আগে একদিন তিনি বিদ্যুৎ নিয়ে নানারকম পরীক্ষা করছিলেন। একটা কাঁচের পাত্রের মুখ খুব ভালো করে আটকে তার থেকে যদি ধীরে ধীরে বাতাস টেনে বার করা যায়, তবে পাত্রটার গায়ে নানারকম রং দেখা দেয়। কেন দেখা দেয়—এটাই তিনি জানবার চেষ্টা করছিলেন।

কিন্তু হঠাৎ তিনি চোখে দেখা যায় না, এমন একটা আলোক-রশ্মির সন্ধান পেয়ে গেলেন।

প্রথমটায় বুঝেই উঠতে পারলেন না, ব্যাপারটা কি হল।

আলো কতকগুলো জিনিস ভেদ করতে পারে, যেমন জল, বাতাস, কাঁচ ইত্যাদি। আবার কতকগুলো পারে না। প্রথমগুলোকে বলে স্বচ্ছ পদার্থ, আর পরের গুলোকে বলে অনচ্ছ পদার্থ।

কিন্তু এ কী মজার আলো! বহু অনচ্ছ জিনিস এ তো বেশ ভেদ করে যাচ্ছে। অবশ্য ঘনত্ব যার বেশী তাকে পারছে না, যেমন ধাতু, হাড় ইত্যাদি। তিনি এর নাম দিলেন 'একস্-রে,' মানে, অজানা রশ্মি। বুঝলেন না যাকে, তার আবার নাম দেবেন কি ?



বিজ্ঞানী রন্‌টগেন

মানুষ নানাভাবে এই রশ্মিকে কাজে লাগাতে

লাগল। বহু অজানা গোপন খবর এর সাহায্যে মানুষ জানতে পারল। লোহার ভিতরে কোনো দোষ আছে কিনা, হীরা-জহরত খাঁটি কিনা, পড়ে গিয়ে কোন হাড়টা ভাঙল, ভাঙ্গা হাড় জুড়ল কিনা, এ স-ব একস্-রে বলে দিতে লাগল। মানুষের দেহের যন্ত্রপাতি ঠিকমতো চলছে কিনা, বাচ্ছাটা পয়সাটা গিলে ফেলেছে, কোথায় গেল সেটা, তাও বলে দিল একস্-রে। একস্-রে দিয়ে বায়োস্কোপের ফটো তুলে মানুষের ফুসফুস, হৃদ-যন্ত্র এসব কি ভাবে কাজ করছে, খাবারটা মুখ দিয়ে ঢুকে গলা দিয়ে গলে পেটের মধ্যে গিয়ে কিভাবে কি হয়ে গেল, তাও বায়োস্কোপের পর্দায় দেখানো হল।

শুধু এই নয়। তীব্র একস্-রে দিয়ে আজকাল ক্যানসার রোগের চিকিৎসা হচ্ছে। কলকাতার চিত্তরঞ্জন ক্যানসার হাসপাতালেও এরকম চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে আজকাল।

আগুনের আলোকে ধরতে গিয়ে মানুষ এ কী কাণ্ড করে বসল!

আগুনের তাপটাও যে কাজে লাগানো যেতে পারে মানুষ তা জেনেছিল অনেক পরে। আগুন জ্বালাবার অনেককাল পরে সে রান্না করতে শিখেছিল।

খবরটা জানবার পর থেকেই মানুষ তাপকে বন্দী করার চেষ্টায় লেগে যায়।

আজ দেখতে পাচ্ছি তাপকে মানুষ কতো না কাজে লাগাচ্ছে।

রেলের এবং জাহাজের ইঞ্জিনে আগুন যে তাপ

সৃষ্টি করছে, তাতে জল বাষ্পের রূপ নিচ্ছে, তাই আবার রেল-জাহাজ চালাচ্ছে তাতো আগেই বলেছি। মোটর-গাড়ি এবং এরোপ্লেনের ইঞ্জিনে পেট্রোল যে তাপ সৃষ্টি করছে, তাই তাদের ছুটিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে।

প্রচণ্ড তাপের শিখা দিয়ে মানুষ কচ্ কচ্ করে মোটা মোটা লোহা কেটে ফেলছে, লোহার গায়ে লোহা জুড়ে দিচ্ছে।

বৈদ্যুতিক উনুনের ভীষণ তাপে আজ লোহা গলে যাচ্ছে। সেই গলানো লোহা দিয়ে মানুষ কতো না জিনিস বানাচ্ছে।

তবুও মানুষ আজও তাপকে পুরোপুরি কাজে লাগাতে পারেনি। পারেনি তাকে পুরোপুরি শাসন করতে। রান্নাঘরের উনুন থেকে কারখানার কলঘর পর্যন্ত যেখানে যতো তাপ সৃষ্টি হচ্ছে, তার সবটুকুই কি মানুষ কাজে লাগাতে পেরেছে? না তো। তার বেশীর ভাগই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। গাড়ির ইঞ্জিনে যে তাপ তৈরি হয়, তার সবটুকুই কিন্তু গাড়ি চালাতে লাগে না। তাই তো দেখি, মোটর-গাড়ির ইঞ্জিনের ঢাকনা খুলে ইঞ্জিন জুড়োন হচ্ছে, রেলের ইঞ্জিন থেকে বাষ্প বার করে দেওয়া হচ্ছে।

সুর্য কি আমাদের কম তাপ দেয়? সুর্যের সেই তাপকে মানুষ এখনও পুরোপুরি কাজে লাগাতে পারল কই? চেষ্টা চলছে, সুর্যের তাপ দিয়ে রান্না করবার, কল-কারখানা চালাবার, সেই তাপকে জমিয়ে রেখে দরকার মতো ধীরে-সুস্থে খরচ

করবার। কিন্তু এখনও সেই চেষ্টা ঠিক সফল হয়ে ওঠেনি।

না হোক। তাতে ভাববার কিছু নেই। দিন আসবে যেদিন মানুষ তাপকে পুরোপুরি বশে আনতে পারবে। প্রকৃতি আর কি পারে মানুষকে হটাতে ?

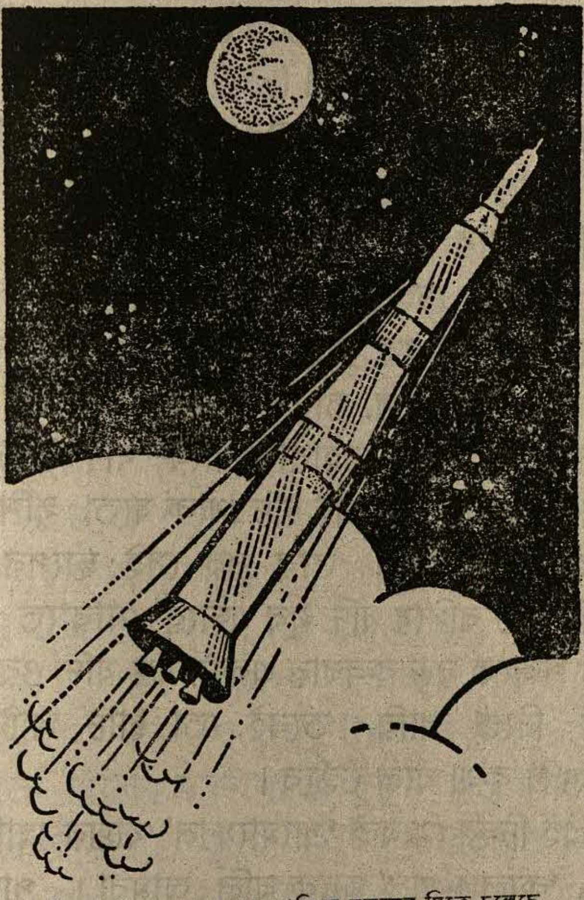
বাতাসকেও মানুষ আজ জয় করতে চলেছে। প্রকৃতি যাবে কোথায় ?

পাখিকে উড়তে দেখে মানুষের মনে বাতাস জয়ের প্রথম ইচ্ছা জেগেছিল। সে-ও উড়তে চায়। কতো চেষ্টা কতো পরিশ্রমের পরে মানুষ আজ আকাশে উড়ছে। মানুষ এরোপ্লেন আবিষ্কার করেছে। সেখানেও থামেনি। মানুষ আজ চাঁদকে জয় করেছে। একবার নয়, বার বার মানুষ চাঁদে গিয়ে ফিরে এসেছে। নিয়ে এসেছে সেখান থেকে থলে ভর্তি পাথর-নুড়ি। মানুষ-বিহীন যন্ত্রও পাঠিয়েছে সেখানে। চাঁদের বুকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেই যন্ত্র চাঁদের সব খবর পাঠাচ্ছে পৃথিবীতে। চাঁদ ছাড়িয়ে শুক্রে, শুক্র ছাড়িয়ে মঙ্গল গ্রহেও যন্ত্র পাঠিয়েছে মানুষ। তারাও খবর পাঠাচ্ছে সেখান থেকে! এর পরে গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে চলবে মানুষের যাতায়াত।

পাল্লা চলেছে রাশিয়ার সঙ্গে আমেরিকার। কে আগে দখল করবে মহাকাশ। দরকার হলে কে আগে ঘর বাঁধবে গ্রহ-উপগ্রহে।

আরও কতো রকমে যে মানুষ বাতাসকে বন্দী করেছে! সাইকেল বা মোটর-গাড়ি চড়ে বেড়ানো তো আদপে বাতাস চড়ে বেড়ানো। কারণ, চাকায়

যদি বাতাস ভর্তি না থাকত তবে বেড়ানোর সুখ



চাঁদ ছাড়িয়ে শুক্রে, শুক্র ছাড়িয়ে মঙ্গলের দিকে চলেছে

মিটে যেত ! ফটাস্ করে চাকা ফেটে গেলে, অথবা চাকার বাতাস কমে গেলে কি অবস্থা দাঁড়ায়, তাতো প্রায়ই আমরা দেখি।

পাম্প চালিয়ে হু হু করে জল টেনে তোলা হচ্ছে—তাও তো বাতাসের কাজ। ছুটন্ত গাড়ি ঘ্যাচাং করে থেমে গেল। ব্রেক কষা হয়েছে। ঐ ব্রেককে কাজ করাচ্ছে কে ? সেওতো বাতাস।

শব্দ বাতাস ভর করে চলে। চলে ঢেউ-এর মতো তালে তালে। চাঁদে বাতাস নেই, কাজেই সেখানে শব্দ-ও নেই। হাজার বোমা একত্র ফাটালেও সেখানে টুঁ-শব্দটি হবে না।

মানুষ এ খবরটি জানবার পর থেকে নানাভাবে একে কাজে লাগিয়েছে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে প্রতিটি শব্দের এক-একটা চেহারা আছে। কোন দুটো শব্দের চেহারা একরকম নয়। যেমন 'ক' এর চেহারা 'খ'-এর চাইতে আলাদা। আবার 'গ' শব্দ যে চেহারা নেয়, তা 'খ'-এর মতো মোটেই নয়। এখন শব্দের এই চেহারাগুলোকে যদি ছাঁচে ধরে রাখা যায় তবে তো সেই ছাঁচ থেকে যতো খুশি ছাপ তৈরি করা যাবে। তার পর সেই ছাপের গায়ে একটা ছুঁচ বসিয়ে যদি খুব জোরে ঘোরাতে পারি, আর শব্দকে বড় করবার একটা যন্ত্র যদি ওর সাথে জুড়ে দিতে পারি, তবেই তো ছাঁচে আটকানো শব্দগুলি কথা বলে উঠবে।

এই চিন্তা থেকেই 'গ্রামোফোন' যন্ত্রের আবিষ্কার হয়; 'কলের-গান' যাকে বলি আমরা। প্রায় এই একই নিয়মে বায়োস্কোপের ছবি আজ কথা কইছে।

এটা আবিষ্কার করেন আমেরিকার বিজ্ঞানী টমাস আল্‌ভা এডিসন্‌।

এখানেই থামেনি মানুষ। বাতাসকে একেবারে নাজেহাল করে ছেড়েছে। শব্দ যখন পিঠে নিয়ে বেড়ায়, তখন বাতাসকে আর ছাড়াছাড়ি নেই।

মানুষ বুঝল, আকাশে বাতাসে শব্দ ভেসে

বেড়াচ্ছে সব সময়। নিশ্চুপ ঘরের মধ্যেও ছুটছে, শুনতে পাইনা, এই যা। শব্দ ধরবার যন্ত্র হল কান। কানের ক্ষমতার একটা সীমা আছে। সেই সীমার বাইরের শব্দ সে ধরতে পারে না। এখন কি করা যায়?

এই নিয়ে ভাবল মানুষ অনেক কাল।

পরীক্ষা চল্‌ল—নানারকম পরীক্ষা।

মানুষ বুঝতে পেল, এমনিতে শব্দ বাতাসের বুকে যে ঢেউ তোলে, তার চাইতে জোরে যদি ঢেউ জাগিয়ে তোলা যায়, তবে বহু দূরের শব্দ বিনা তারে ঘরে বসেই শোনা যাবে।

যা ভাবা তাই। আবিষ্কার হল রেডিয়ো। রেডিয়োর মধ্যে আছে দুটো কল, একটা হল শব্দের ঢেউ ধরবার, অপরটা হল শব্দকে বড় করে ছড়িয়ে দেবার। যাঁর অক্লান্ত সাধনার ফলে রেডিয়ো আবিষ্কার সম্ভব হয়েছে—তিনি আমাদেরই ঘরের ছেলে—আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু। আজ যখন দিনের শেষে রেডিয়োটি খুলে আরাম করে দেশ-বিদেশের কথা শুনি, গান-নাটক শুনি, খেলার রীলে শুনি, তখন কি ভাবি, আমার এই আরাম ও আনন্দের পেছনে বিজ্ঞানের এই নীরব সাধকের দান কতোখানি? জগদীশচন্দ্রের পরে রেডিয়ো যন্ত্রের আরও অনেক উন্নতি করেন ইতালী দেশের বিজ্ঞানী মার্কনি।


আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু

রেডিয়োতে যে সব শব্দ আমরা শুনতে পাই তার মধ্যে কতকগুলো আকাশের ষাট-সত্তর মাইল উপর দিয়ে ভেসে আসে—আর আমরা দিব্যি আরামে ঘরে বসে শুনি।

বাতাস একেবারে যাচ্ছেতাই হারা হেরে গেল।

কিন্তু মানুষ আজ পর্যন্ত প্রকৃতির যতোগুলি শক্তিকে পরাস্ত করেছে, তার মধ্যে সবচেয়ে বড়, সবচেয়ে ভয়ংকর হল বিদ্যুৎ। বিদ্যুৎকে যদি মানুষ বশে আনতে না পারত, তবে মানুষকে আর এগুতে হত না।

কেন ?

বিদ্যুৎ কি করছে ?

কি না করছে ? উঠতে, বসতে, শুতে, চলতে, ফিরতে, কথা কইতে, সব-কিছুতেই বিদ্যুৎ আমাদের কাজ করে যাচ্ছে। রান্না করতে বিদ্যুৎ, হাওয়া খেতে বিদ্যুৎ, আলো জ্বালতে বিদ্যুৎ। ট্রামগাড়ি চালাচ্ছে বিদ্যুৎ, বাষ্পে-চলা ইঞ্জিনকে হটিয়ে দিয়ে রেলগাড়ি চালাচ্ছে বিদ্যুৎ। বিদ্যুৎ না হলে রেডিয়ো চলত না, টেলিফোন কথা কইত না, টেলিগ্রাফ টরে-টক্কা করত না। কলকারখানা বন্ধ হয়ে যেত, মজা করে বায়োস্কোপ দেখা টেলিভিসন চলত না মাইকে গান শোনা যেত না। বোতাম টিপলেই ঘণ্টা বাজতো না। ঘরদোর শীতে গরম, আর গরমে ঠাণ্ডা করে রাখা যেত না। বোতাম টিপে হাজার হাজার মণ ওজন এক নিমেষে তুলে ফেলতে পারতাম না। বিদ্যুৎ না হলে আকাশে রকেট উঠত না।

মঙ্গলে-চাঁদে যেতুম কি করে? আরও কতো বলব?

কিন্তু এতো করেও মানুষ আজও বিদ্যুতের অনেক কিছুই বুঝে উঠতে পারে নি—অদ্ভুত গোলমেলে এর স্বভাব। ভয়ঙ্কর এর মেজাজ।

হবে না? মানুষ একেবারে প্রকৃতির ভঁাড়ারে হাত দিয়েছে যে!

মানে?

মানে সৃষ্টির শেষ কথা হল বিদ্যুৎ। এককণা ধুলো থেকে আকাশের ঐ মিটমিটে তারাটা, সবারই শেষ কথা হল বিদ্যুৎ। সব কিছুই ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে দেখা যাবে শেষ পর্যন্ত কিছুই আর নেই—বিদ্যুৎ হয়ে পালিয়েছে।

ঐ যে বলেছি, সাতানব্বুইটা মৌলিক পদার্থে এই বিশ্বসৃষ্টি গড়ে উঠেছে—একদিন মানুষ তাই নিয়ে পরীক্ষা করতে বসল। ভাঙ্গতে বসল তাদের। দেখা যাক না, সব কথার শেষ কথা কি? ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে এমন একটা জায়গায় এসে পেঁাছল, যেখানে এতটুকু চোট আর সয় না। অর্থাৎ 'পদার্থ' বলে ডাকতে গেলে তাকে আর ভাঙ্গা চলে না। এই হল পদার্থের শেষ অবস্থা। একে বলে অণু, ইংরেজীতে মলিকিউল।

কিন্তু এতো শেষ লড়াই। মানুষ এখানেই থামবে কি করে?

থামল না। এগিয়ে চলল—প্রকৃতির বুকে এবারে শেষ শেল ছুঁড়তে হবে!

ছুঁড়ল। ভাঙ্গা হল অণু। যা বেরিয়ে এলো, তা আর বলবার নয়! এতো ছোট, এতো খুদে এরা, যে দশ কোটি এক জায়গায় ঠেসে দিলে মাত্র এক ইঞ্চি জায়গা জুড়ে থাকে! এর নাম পরমাণু—অ্যাটম্।

বেয়াড়া মানুষ তবু থামল না। প্রকৃতিকে ঘায়েল করা চা-ই। ভাঙ্গতে হবে একেও—দেখতে হবে কোথায় লুকিয়ে আছে প্রকৃতির আসল শক্তি—অতো ভয় দেখানো যে শক্তি দিয়ে—বজ্র, বিদ্যুৎ, ঝড়, জল—আগুন! ভয় দেখিয়ে ভক্তি আদায় করা? দেখি না আসল শক্তিটা কোথায় ওর? কেমন সেটা?

কিন্তু ভাঙ্গা যায় কি করে? পিটিয়ে? না। আছড়িয়ে? না তো! তবে?

অবশেষে আবিষ্কার হল এক যন্ত্র। সাইক্লোট্রোন তার নাম। তাই দিয়ে ভাঙ্গা হল অ্যাটম। বেরিয়ে এলো প্রকৃতির শেষ কথা। কিন্তু একি! ঐ যে খুদে এ্যাটম্ তার মধ্যেও এ-তো কাণ্ড? এ-কী তাথৈ নাচন চলছে অ্যাটমের অন্তরে! একটা কেন্দ্র-বিন্দুকে ঘিরে কতোগুলি বিন্দুর সে কী নাচন! কোন বেতাল নেই, বেচাল নেই—নাচন কেবলই নাচন। কেন্দ্র-বিন্দুটাকে বলা হল প্রোটন, আর ঘুরছে যারা, তাদের বলা হল ইলেকট্রন। এদের নাচের বেগ সেকেণ্ডে হাজার মাইলেরও উপরে।

বেরিয়ে এলো সৃষ্টির শেষ কথা। প্রকৃতি একেবারে ঘায়েল, একেবারে নাজেহাল হয়ে গেল!

ইলেকট্রনদের নিয়ম হল, আঘাত পেলেই তারা

চঞ্চল হয়ে ওঠে, আর চঞ্চল হলেই গরম হতে শুরু করে। তারপরে ছুটে পালাতে চায়। আর ইলেকট্রনের কমতি পড়লেই প্রোটনের আকর্ষণ বেড়ে ওঠে—তার মেজাজ যায় বিগড়ে। তারই ফলে ভীষণ তাণ্ডব শুরু হয় অ্যাটমের বুকে—আর তারই ফলে বিদ্যুৎ।

ঐ যে হাতে হাত ঘষলে গরম হয়ে ওঠে না? ঐ তো বিদ্যুৎ সৃষ্টি হল। ঘষার ফলে হাতের ইলেকট্রন ক্ষেপে গেল। পাথরে পাথরে ঠুকে প্রথম যে আগুন জ্বলেছিল—তাও তো এই ইলেকট্রনের খেলা। অথচ মানুষ বুঝল কত পরে।

একটুকরো লোহা। এমনিতে বেশ আছে। ধরা হল আগুনের মধ্যে। প্রথমে গরম হয়ে উঠল—ইলেকট্রন চঞ্চল হয়ে উঠেছে। তারপরে আরো, আরো। লাল টক্‌টকে হয়ে উঠল এবার। ইলেকট্রন ভীষণ ক্ষেপেছে। গলে গেল। ইলেকট্রন পালাতে চায়। তাকে আরো তাপ দেওয়া হল। এবার গ্যাস হয়ে পালিয়ে গেল— লোহা আর লোহা নেই। এখন ঐ গ্যাসকে ধরেও যদি তাপ দেওয়া যায়—তবে? তবে—গ্যাসও নেই—শুধু তেজ। লোহার ইলেকট্রন বিদ্যুৎ হয়ে পালিয়ে গেছে!

এই হল বিদ্যুৎ—সৃষ্টির শেষ কথা। আর একে বাগ মানাতে মানুষ হিমসিম খেয়ে গেছে। খেয়েছে হিমসিম, কিন্তু বাগিয়েছে তো! কতোকাল ধরে কতোরকম পরীক্ষা করেছে মানুষ একে নিয়ে। একদিনে পারে নি, পেরেছে একটু একটু করে,

ধাপে ধাপে।

সবাইর আগে বিদ্যুৎ দিয়ে আলো জ্বালালেন ইংলণ্ডের বিজ্ঞানী হাম্‌ফ্রে ডেভি, আজ থেকে প্রায় দেড়শ বছর আগে। কী চমৎকার আলো! কতো জেল্লা তার! কোথায় লাগে গ্যাসের আলো? ধোঁয়া নেই, কালি নেই, জ্বালাতে দেশলাই লাগে না—আর সে আলোর তেজ কতো! আরো মজা হল, এক জায়গায় বসে বোতাম টিপে এক সাথে যতো খুশী ততো আলো জ্বালানো যায়—ঘুরে ঘুরে পল্‌তে ধরাতে হয় না।

রাত হয়ে উঠল দিন। মানুষকে আর সুর্যের মুখ চেয়ে বসে থাকতে হল না।

কিন্তু মুশকিল বাঁধল এই আলোর তেজ বাড়ানো নিয়ে আর জ্বালাবার খরচা কমানো নিয়ে। বিদ্যুৎকে মানুষ তখনও খুব শক্তিশালী করে তুলতে পারে নি। আর যেভাবে বিদ্যুৎ তৈরি হত, তাতে খরচও পড়ত অনেক।

মানুষ বসে রইল না। প্রকৃতির এই মহাশক্তির খোঁজ যখন একবার সে পেয়েছে—তখন কি আর ছেড়ে কথা বলা?

চেষ্টা চল্‌ল কি করে সস্তায় খুব শক্তিশালী বিদ্যুৎ তৈরি করা যায়। শুধু তৈরি করা নয়, কি করে তাকে জমিয়ে রাখা যায়, এবং ইচ্ছামতো খরচ করা যায়। আজ চারদিকে বিদ্যুতের যে জয়জয়কার দেখতে পাই, তা হল এই চেষ্টারই ফল।

হঠাৎ শহরের আলো নিভে গেল। হৈ হৈ

ব্যাপার! খবর গেল 'পাওয়ার হাউস'-এ। সেখানে গুড়্গুড়্ করে একটা কল চলছে। ওটাই হল সব। এটা আবিষ্কার করার জন্য মানুষকে বহুকাল চেষ্টা করতে হয়েছে। ওকে বলে ডায়নামো। ওটাই গুড়্গুড়্ করতে করতে ক্রমাগত বিদ্যুৎ তৈরি করে যাচ্ছে। এটা আবিষ্কার করেছিলেন ইংলণ্ডের আর একজন বিজ্ঞানী, মাইকেল ফ্যারাডে। ডেভির শিষ্য



মাইকেল ফ্যারাডে

ছিলেন তিনি। এ হল আজ থেকে প্রায় একশ তেরো বছর আগের কথা।

গ্যালিলিওর দূরবীন যেমন এক লাফে মানুষকে বহুদূর এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল—তেমনি নিয়েছে ফ্যারাডের ডায়নামো। মানুষের বিরাট জয় এটা।

ডায়নামো আবিষ্কারের গোড়ার দিকে ফ্যারাডে তাঁর এক বন্ধুকে লিখেছিলেন—"বলতে পাচ্ছি না, তবে যেন মনে হচ্ছে বড় গোছের একটা-কিছু এবার জালে আটকে ফেলেছি। পরিশ্রম করে টেনে-টুনে যখন তুলব, তখন হয়তো দেখব—ওটা মাছ নয়, শেওলা"।

বিদ্যুতের মহাশক্তি আজ মানুষের হাতের মুঠোর মধ্যে এসে পড়েছে। মানুষ প্রকৃতির বুকে চরম আঘাত হেনেছে। দিন আসবে, যখন মানুষ ইঁট, কাঠ, মাটি, নুড়ি, যেখানে যা কিছু পাবে তার ভেতর থেকে এই মহাশক্তি, বিদ্যুৎকে লুটে এনে নিজের কাজে লাগাবে। মানুষ বসে নেই। চেষ্টা চলছে।

* * *

* *

প্রাণ-প্রকৃতির লড়াই আজ জম-জমাট। পঞ্চাশ কোটি বছর আগে সমুদ্রের গরম বুকে ছোট্ট একটি প্রাণের দানা যে লড়াই শুরু করেছিল—এ-কী তার রূপ আজ? মানুষ দাঁড়িয়েছে প্রকৃতির মুখোমুখি। রুখে দাঁড়িয়েছে বুক ঠুকে। আজ তার কাছে অসম্ভব বলে কিছুই নেই। সে সমুদ্রে ডুবে মণি-মুক্তা তুলে আনছে, পৃথিবীর বুক চিরে প্রকৃতির লুকোনো ধন লুটে নিচ্ছে, জলকে বন্দী করেছে, বাতাসকে পরাস্ত করেছে, আগুন, তাপ, তেজ, সব তার হাতের মুঠোয়। শূন্য ছাড়িয়ে মহাশূন্যের দিকে সে আজ ছুটে চলেছে—স্বর্গ সে জয় করবেই!

* * *

* *

বাইরে রাতের আঁধার ঘনিয়ে আসছে, আর ঘরে বসে আমি প্রাণের এই জয়-যাত্রার ইতিহাস লিখছি পঞ্চাশ কোটি বছরের লড়াই-এর ইতিহাস। কতো দুঃখ, কতো কষ্ট, কতো বাধা, কতো বিপদের মধ্য দিয়ে প-ঞ্চা-শ কো-টি বছর ধরে প্রাণ এগিয়ে চলেছে। প্রকৃতি কখনও তাকে ক্ষমা করেনি। নির্মম আঘাত হেনেছে তাকে বারে বারে। বারে বারে প্রাণী মুছে যাওয়ার মুখে এসেছে—তবু যায় নি।

প্রাণী মরেছে—কিন্তু প্রাণ মরে নি। কত রূপে, কত ভাবে সে বিকাশ পেয়ে, প্রকাশ পেয়ে আজকের মানুষের মধ্যে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। অজেয়, অমর প্রাণের সেই কাহিনী লিখছিলাম আমি।

প্রকৃতির সাথে আজ তার শেষ বোঝাপড়া—

* * *

* *

হঠাৎ বাইরে ছোটদের কাকলি শুনে থমকে গেলাম। বেরিয়ে দেখি আকাশ ভরা তারার মেলা। আর তারই মধ্যে ভেসে ভেসে চলেছে মাঝারি গোছের একটা তারা। পরে জেনেছিলাম, আমেরিকার মানুষ ওটা বানিয়েছে, তারপরে ছেড়ে দিয়েছে শূন্য ছাড়িয়ে মহাশূন্যে। ঘুরে বেড়াচ্ছে পৃথিবীর চারদিকে চাঁদের মতো। ওতে মানুষ নেই। তবু নাকি খবর পাঠাবে ওখান থেকে পৃথিবীতে, মহাশূন্যের খবর। তার পরে মানুষ বেরুবে একদিন স্বর্গ জয় করতে—যাবে চাঁদে—যাবে গ্রহ-গ্রহান্তরে।

স্তব্ধ হয়ে ভেবেছিলাম—সেই দিন আর কতদূর—

বাইশে আগস্ট সেদিন। শরতের সোনালী সকাল। ঘুম থেকে উঠে প্রথমেই যে খবর পেলাম, মন তাতে আনন্দে নেচে উঠল। মনে হল, সেদিনের আর দেরী নেই তো। বহুদিন ধরে আকাশ জয়ের যে চেষ্টা রাশিয়া করছিল, মনে হল আজ তা সফল হতে চলেছে। তিন দিন আগে কয়েকটি প্রাণী নিয়ে তাদের যে রকেট উঠেছিল মহাশূন্যে, তাকে আবার ফিরিয়ে আনা হয়েছে পৃথিবীতে। সেই রকেটের যাত্রী যারা, দুটি কুকুর,—বেল্‌কা, স্ত্রেল্‌কা—আরও কয়েকটি প্রাণী—তাদের কোন ক্ষতিই হয় নি। যেখানে নামবার কথা, রকেটটা সেখান থেকে মাত্র সওয়া ছয় মাইল দূরে নেমেছিল। ১২৪ মণ ওজনের এই রকেট দুশো মাইল উপরে উঠেছিল। তিন দিনে চার লক্ষ সাইত্রিশ হাজার মাইল পথ ছুটেছে, আর, আঠারো বার পৃথিবীর চারধারে ঘুরে আবার পৃথিবীতে ফিরে এসেছে।

সেটা ছিল উনিশশো ষাট সাল। আর আজ হল উনিশশো তেহাত্তর সাল। মাত্র তেরোটি বছর কেটেছে, এরই মধ্যে মানুষ এ কী করে বসল? চার মাস ধরে আড়াই কোটি মাইলেরও বেশী পথ পেরিয়ে সোভিয়েট রাশিয়ার যাত্রী-বিহীন মহাকাশ যান ভেনাস-৮ আজ শুক্রগ্রহে নেমে পড়েছে। শুধু নামেই নি, সেখান থেকে নানারকম খবর পাঠাচ্ছে পৃথিবীতে। সে কতো খবর! শুক্র গ্রহের তাপ কি রকম, সেখানকার বাতাসের চাপ

কতো, সেখানকার আকাশের অবস্থা কি রকম—আরো কতো! এরও আগে ১৯৭০ সালে রাশিয়ার ভেনাস-৭ নেমেছিল শুক্রে। সেবারও খবর পাঠিয়েছিল অনেক, কিন্তু বেশীক্ষণ পারে নি।

কিন্তু শেষ চমক লাগিয়ে দিয়েছে আমেরিকার মানুষ! এই তো সেদিন তারা মহাকাশে পাঠিয়েছিল স্কাইল্যাব্। 'স্কাই' মানে আকাশ, আর 'ল্যাব্' হল ল্যাবরেটারী, মানে গবেষণাগার—যেখানে বসে নানারকম বৈজ্ঞানীক পরীক্ষা চালানো হয়। একটা ছোটোখাটো বাড়ীর মতন এটা—স্নানের ঘর ছিল, শোবার ঘর ছিল, আর ছিল গবেষণার ঘর—কতো জটিল আর সুক্ষ সব যন্ত্রপাতি রছিল ওখানে। ওর মধ্যে জল-বাতাস আপনাতেই তৈরি হচ্ছিল আর ওকে চালাচ্ছিল যে বিদ্যুৎ-শক্তি, তা তৈরি হচ্ছিল সূর্যের আলো দিয়ে। ও ঘুরে বেড়াবে মহাকাশে, আর মানুষ ওর মধ্যে বসে বসে নিশ্চিন্তে নানারকম গবেষণা করে তার ফলাফল জানাবে পৃথিবীর মানুষকে। ওটা ছাড়ার দিন কয়েক পরে আর একটা যানে করে তিনজন মানুষ পাঠিয়ে দেয়া হল। তারা ছুটে গিয়ে ঢুকে পড়ল স্কাইল্যাবের মধ্যে। আঠাশ দিন রইল তারা ওর মধ্যে। নানারকম গবেষণা করল তারা—কতো ফটো, কতো খবর তারা পাঠাল পৃথিবীতে। তারপরে একদিন তাদের ফিরিয়ে আনা হল। আবার গেল দ্বিতীয় দল, এবারে তিনজন। থাকার কথা আটান্ন দিন নানা রকম খবর তারা পাঠিয়েছে পৃথিবীতে ওখান

থেকে। কিন্তু মজা হল, একদিন এর মধ্যে ওর যন্ত্রপাতিতে কিছুটা গোলমাল ধরা পড়ল। একজন বেরিয়ে পড়ল ভেতর থেকে। তার পরে বহুক্ষণ ধরে শূন্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মেরামত করে আবার ঢুকে পড়ল ভেতরে। কিছুকাল আগে, ভেঙ্গে পড়েছে

মানুষ আজ চাঁদ জয় করল। শুক্র জয় করল, মঙ্গলের খবর লুটে আনল, আরও কত করবে কে জানে ?

* * *

এই কি শেষ লড়াই ? কে বলবে ? কে বলবে, প্রকৃতির হাতে কোন গোপন অস্ত্র এখনও লুকিয়ে আছে কিনা, যার খোঁজ এখনও মানুষ পায় নি ? কে জানে কবে কোন দিন প্রকৃতি আবার নির্মম আঘাত হেনে বসবে প্রাণকে ! হয়তো সেদিন পৃথিবী ভেঙ্গে থান্ থান্ হয়ে মহাশূন্যে মিলিয়ে যাবে। প্রাণের চিহ্নমাত্র থাকবে না আর। সৃষ্টির সেই প্রথম দিন আবার ফিরে আসবে। আবার কোটি কোটি বছর কেটে যাবে ! সেই বিশ্ব-জোড়া জড়ের মধ্যে হয়তো আবার ছোট্ট একটি ভীরু প্রাণ গোপনে এসে দানা বাঁধবে।

আবার যাত্রা হবে শুরু—

আজব কল

কল বলে কল ?

সে এক আজব কল ! তাজ্জব কাণ্ড ! শুনলে মাথা ঘুরে যায় !

কোথায় লাগে তার কাছে রেলগাড়ি,—ঐ যে ভোঁস্ ভোঁস্ করে করে দৈত্যের মতো ছুটছে ?

কোথায় লাগে এরোপ্লেন,—শাঁ শাঁ করে ডানা মেলে পাখীর মতো উড়ছে,—চোখের পলকে কো-থা-য় চলে যাচ্ছে ?

কোথায় লাগে টেলিভিশন,—কতো দূরের মানুষ আমার সমুখে বসে কথা কইছে—স্পষ্ট দেখছি তাকে হাসছে, খেলছে, গাইছে, নাচছে।

আর ঐ যে মহাকাশযান—মানুষ যাকে পাঠিয়ে দিলে আকাশ ছাড়িয়ে মহাকাশে—লক্ষ, কোটি মাইল দূর থেকে যে খবর পাঠাচ্ছে, ছবি পাঠাচ্ছে মহাকাশের—সেও পারেনা এর সাথে।

কলের সেরা আজব কল !

কে এই কল বানালো, কবে বানালো, কোথায় বানালো, তা কিন্তু বলতে পারবো না।

তবে বলতে পারি একটা কথা,—কে এই কল চালাচ্ছে, কলটার নাম কি, আর কি ভাবেই বা চলছে।

বলবো ? চালাচ্ছে যে, নাম তার প্রাণী, অর্থাৎ প্রাণ যার আছে। কলের নাম দেহ, মানে শরীর।

আর চলছে কি ভাবে ?

সে অনেক কথা—তা বলতেই তো বসা !

সত্যি বলতে কি, প্রাণিদেহের মতো এমন অদ্ভূত কল বা যন্ত্র আর নেই।

আর তার মধ্যে সব চাইতে সেরা হলো মানুষের দেহ। মানুষের সব বুদ্ধি, সব জ্ঞান-বিজ্ঞান, সব আবিষ্কার এর কাছে হার মেনেছে। একটা গোটা প্রাণীর দূরের কথা, প্রাণিদেহের এতোটুকু একটা অংশও মানুষ আজও বানাতে পারলো না—একগাছা চুল—একটুকরো নখ পর্যন্ত না।

চলেছে তো চলেছেই—

অন্য সব প্রাণী ছেড়ে দিয়ে আমরা শুধু মানুষ কলটাকেই দেখবো। কেমন ? কারণ, এই সেরা কলটার হালচাল যদি আঁচ করে উঠতে পারি, তবে এর চাইতে কম গোলমেলে যেগুলো, তা বুঝতে কতোক্ষণ ?

শিশু যতোদিন মায়ের পেটে থাকে, ততোদিন মায়ের কলই তাকে চালিয়ে নেয়।

তারপর যে মুহূর্তে সে ভূমিষ্ঠ হয়, মানে পৃথিবীতে নেমে আসে, সেই মুহূর্তে মায়ের সঙ্গে তার যোগাযোগ কেটে যায়। সে ট্যাঁ-ট্যাঁ, উঁভা-উঁভা করে উঠে—আর সেই মুহূর্তে তার দেহের কল চলতে শুরু করে।

সেই যে শুরু হলো চলা, সে চলার আর থামা নেই।

শিশু বড়ো হলো, আরো বড়ো—আরো। বুড়ো হলো। তারপরে মৃত্যু যখন তাকে ডাক দিলো—তখন কল থামলো।

কাজেই দেখতে পাচ্ছি, এই জন্ম-মৃত্যুর মাঝখানটায় কলটা যে শুধু চলেছে তা নয়—বড়ো হয়েছে, চেহারা পালটেছে, স্বভাব পালটেছে আর এরই মাঝে সেই কল থেকে নতুন নতুন কল সৃষ্টি হয়েছে, অর্থাৎ তার ছেলে-পুলে হয়েছে।

এমন কল কে তৈরি করতে পেরেছে—কোন কারখানায়?

আসলে কিছুই নয়। কিন্তু—

আসলে আমাদের এই দেহটা কিছুই নয়। পৃথিবীর যেমন তিনভাগ জল আর একভাগ স্থল, আমাদেরও তাই। তিনভাগ জল—স্রেফ জল। আর বাকি যা—তা হলো কিছু হাড়, কিছু মাংস, মজ্জা, কিছু রক্তকণা, কিছু শিরা, ধমনী, এইসব।

কিন্তু এই কী সব?

না তো! কী অপূর্ব রহস্যে গড়ে উঠেছে আমাদের দেহ, কী অপূর্ব রহস্যে মাথার মধ্যে লুকানো একটুখানি মগজের হুকুমে হাত চলছে, পা চলছে, শ্বাস-প্রশ্বাস চলছে, রক্ত চলেছে ছুটে প্রতিটি জীবকোষের খাবার নিয়ে, কী অপূর্ব রহস্যে তিলে তিলে, পলে পলে আমাদের দেহ

বেড়ে উঠছে, গড়ে উঠছে, কথা বলছি, খাচ্ছি, হজম কচ্ছি। - তাই তো বলবো।

প্রবালের পাহাড় যেন—

কোন কোন সমুদ্রের জলে খুব-খুদে একরকম পোকা পাওয়া যায়। তার নাম প্রবাল-কীট। রং তাদের লাল। তারা করে কি হঠাৎ কখনো খেয়ালবশে জটলা পাকাতে পাকাতে ক্রমেই শক্ত দলার মতো হয়ে ওঠে।

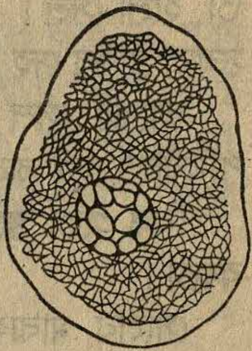
তারপরে সেটা বাড়তে বাড়তে এতো বড়ো হয়ে ওঠে যে সমুদ্রের জল ফুঁড়ে পাহাড়ের মতো মাথা তুলে দাঁড়ায়। নীল জলে লাল পাহাড়। এই হলো প্রবাল পাহাড়!

কতো প্রবালকীট মিলে যে এমন একটা পাহাড় গড়ে তোলে, তা হিসেব করতে যাওয়া বৃথা। মানুষ এই পাহাড় কেটে কেটে প্রবাল নিয়ে আসে লাল পাথরের মতো। তাই দিয়ে নানা কাজ করে। আংটিতে 'পলা' বলে যে 'পাথর' আমরা পরি, তা ওই প্রবাল।

আমাদের দেহটাও অনেকটা ওই প্রবাল-পাহাড়ের মতো। অসংখ্য, অগুন্তি জীবকোষ ইংরেজিতে যাকে বলে সেল, তাই মিলে আমাদের দেহ। তারাও প্রবালকীটের মতো জটলা পাকিয়ে আছে, আমাদের মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত সারা দেহে।

কিন্তু তফাত আছে।

প্রবালগুলো পাহাড় তৈরি করেই মরে যায়। কাজেই তৈরি পাহাড়টা আর বাড়ে না। কিন্তু আমাদের সেলগুলো সব জ্যান্ত। যে পর্যন্ত আমরা বেঁচে আছি ওরাও বেঁচে আছে। অথবা যতোদিন ওরা বেঁচে আছে ততোদিন আমরা বেঁচে আছি।



জীবকোষ—সেল
এরা সব জ্যান্ত

জ্যান্ত বলেই তাদের বাড় আছে। যার ফলে শিশু বড়ো হয় রোগা মোটা হয়। বেঁচে থাকবার জন্য তাদের খেতে হয়। এবং তাদের খাইয়ে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য আমাদের দেহের মধ্যে অপূর্ব ব্যবস্থা রয়েছে।

সত্যি বলতে কি, আমরা যা খাচ্ছি সবই ওদের জন্য, আমরা যে শ্বাস নিচ্ছি তাও ওদের বাঁচিয়ে রাখার জন্য। কাজেই ওদের বাঁচা-মরার ওপর আমাদের মরণ-বাঁচন, ওদের সুখে থাকার ওপরেই আমাদের সুখ।

মোট কথা, আমরা হলাম এক একটি সেলের পাহাড়!

বস্তুটা কী?

তাতো হল। কিন্তু সেল বস্তুটা কি?

সেল হল অতি সূক্ষ্ম প্রাণের কণা। এতো খুদে যে

খুব শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া ওকে দেখাই যায় না।

পৃথিবীতে সবাইর আগে প্রাণরূপে যা এসেছিলো, তা হলো সেল। এর উপরে ভর করেই গড়ে উঠেছে সকল প্রাণীর দেহ।

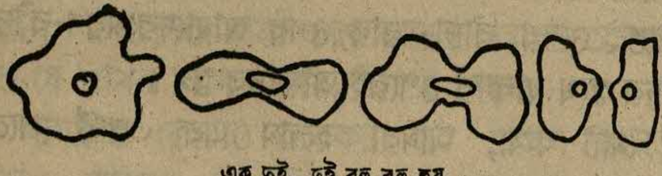
কাজেই সেল যদি পৃথিবীতে না জন্মাতো, তবে পৃথিবীতে প্রাণী বলে কিছুই থাকতো না।

কিন্তু এতো খুদে যে সেল, তার হালচালও আজব কতো!

সেলের মাঝখানে আছে একটা ফুটকির মতো। প্রাণকেন্দ্র ওটা। ওকে বলে 'নিউক্লিয়াস্'। সব সেলের চেহারা এক রকম নয়,—নানা রকম—গোল, চোকা, লম্বা, বাঁকাচোরা, নানা রকম। সেলগুলো আবার বংশবৃদ্ধি করে। এক দুই হয়, দুই বহু হয়।

কী করে?

সে এক মজার ব্যাপার!



এক দুই, দুই বহু বহু হয়

হঠাৎ ওর দেহের মাঝখানটা সরু হতে হতে দুটো ভাগে ভাগ হয়ে যায়,—আর তার সাথে প্রাণ-কণাটাও কেটে দুভাগ হয়ে খানিক এদিক, খানিক ওদিক চলে যায়।

এমনি এককোষ বা এক সেলওলা প্রাণী আজও দেখা যায়। তাদের বলে প্রটোজোয়া।

একটিমাত্র সেল, বা প্রাণকণা সম্বল করে যে, প্রথম প্রাণ পৃথিবীতে এসেছিলো কে জানতো পঞ্চাশ কোটি বছর ধরে তা বিকাশ পেতে পেতে বহু কোষাধরী এতো রকমারি প্রাণী গড়ে তুলবে আজব কল, মানুষ গড়ে তুলবে!

হালচাল কেমন?

আমাদের দেহের সেল, আর প্রোটোজোয়ার সেল গোড়ায় এক হলেও দুই-এর হালচাল কিন্তু ঠিক এক নয়। প্রাণিদেহে, বিশেষ করে আমাদের দেহে বাসা বেঁধে ওরা অনেক বনেদী হয়ে উঠেছে।

প্রোটোজোয়ার ওই তো 'সবে ধন নীলমণি',—একটিমাত্র সেল। কাজেই বেচারাকে একাই সব কাজ করতে হয়। অর্থাৎ চলতে গেলেও ওই গোটা দেহ, খেতে গেলেও ওই গোটা দেহ—সব-কিছুতেই পুরো শরীর।

সেই সেল আমাদের শরীরে এসে হাল ফেললো একদম পালটে। এখানে তো সে একা নয়, কোটি কোটি, কতো কোটি কে বলবে? কারণ, একফোঁটা রক্তেই যদি থাকে ত্রিশ কোটি লালকণা, আর তিন থেকে পাঁচ লাখ শাদাকণা নামে সেল, তবে গোটা দেহে কতো আছে গুণবে কে?

তাই আমাদের দেহে এরা যে-যার কাজ ভাগ করে

নিয়েছে। তাও আবার একা নয় দল পাকিয়ে, জোট বেঁধে।

যেমন, যে দল হাত চালাচ্ছে, সে দল পা চালাবে না। খাবার ভার যার ওপর, দেখবার দায় তার নয়।

এই করে এক একটা দল এক একটা কাজ করছে—আর সেই কাজে ওস্তাদ হয়ে উঠছে।

আলাদা রকমের কাজ করতে হয় বলেই আমাদের দেহের সব সেলগুলোর চেহারা একরকম নয়,—এক একটা অংশ এক একরকম।

একের মধ্যে বহু—

অথবা বলতে পারি বহু নিয়ে এক! কারণ আগেই বলেছি, প্রতিটি সেল হলো এক একটি প্রাণের দানা,—সব জ্যান্ত। আবার সবগুলো নিয়ে আমি, একটি জ্যান্ত মানুষ।

মরণ বাঁচন—

তাহলে মরণ-বাঁচন কাকে বলে? মরতে গেলে কি দেহের সব সেলগুলোকেই একসঙ্গে মরতে হবে? আর বাঁচতে গেলেও কি তাই?

প্রাণী যখন মরে, তখন কিন্তু দেহের সব সেলগুলোই মরে না। সেলের যে দলগুলির উপর গোটা শরীরের সব-সেলগুলো বাঁচিয়ে রাখার ভার, তারা যদি মরে, তবেই মৃত্যু আসে।

কারণ, খাবার ভার যার, সে যদি খাবার না পাঠায়, অক্সিজেন দেওয়ার ভার যার, সে যদি তা না দেয়, রক্ত চালাবার ভার যার, সে যদি রক্ত না চালায়, তবে বাকি যারা, তারা বাঁচবে কি করে? আর বাঁচলে তো কাজ করবে,

তাই বলে তারা কিন্তু তখুনি মরে না। ধীরে ধীরে মরে।

পরীক্ষা করে দেখা গেছে, মৃত্যুর পরেও শরীরের যে-কোনো অংশ কায়দা করে বাঁচিয়ে রাখা যায় অনেকদিন। যে অবস্থায় ঐ অংশটুকুর সেলগুলো স্বাভাবিক ভাবে বাঁচতে পারে, সেই ব্যবস্থা যদি তৈরি করা যায়—তবে ওটা জ্যান্ত থাকবে না কেন?

কাজেই দেখতে পাচ্ছি, বাঁচতে গেলে ওই প্রধান দল গুলো বেঁচে থাকলেই চলে। সব সেলকে যে একই সঙ্গে বেঁচে থাকতে হবে, এমন কথা নেই।

তা ছাড়া দেহের মধ্যে সেলের মৃত্যু হচ্ছে অহরহ। শুধু রক্তের সেলগুলোই ধরা যাক। এদের পরমায়ু নব্বুই থেকে একশো পঞ্চাশ দিনের বেশি নয়। আর প্রতি সেকেণ্ডে মরছে প্রায় এক কোটি। আবার তৈরিও হচ্ছে সমান তালে।

কোথায়? খুব গোপন একটা জায়গায়। হাড়ের ফোকরে যে মজ্জা আছে, তার মধ্যে।

আর সেই মরার স্তূপ?

রাক্ষস আছে লুকিয়ে—

এদের না হয় গোর দেওয়া, না হয় পোড়ানো। এরা সব চলে যায় কতগুলো রাক্ষসের পেটে। এই রাক্ষস—সেলগুলো দেখতে লালকণা সেলদের আটগুণ বড়ো। তারা লুকিয়ে থাকে পিলের মধ্যে। জ্যান্ত তারা ছোঁয় না। মড়া খেতে তাদের বড় সাধ। তাই যেই না সেলগুলো মরলো অমনি সব চলে গেলো ওদের পেটে।

দেখিনা কী আছে?

তাহলে এই হলাম আমরা, মানে মানুষ—দল-পাকানো, জোট-পাকানো অগুন্তি সেল, যে যার কাজ করে যাচ্ছে আপন মনে।

কিন্তু কাজটা করছে কী ভাবে?

তা জানতে হলে গায়ের চামড়া তুলে দেখতে হবে, হাড়-মাংস নেড়ে চেড়ে দেখতে হবে।

হয় হোক্ - দেখি না, কী আছে।

সেলগুলো প্রথমেই যে ছোট ছোট দল পাকিয়ে তোলে, তাকে বলে টিস্যু। যেমন পেশীর টিস্যু, নার্ভের টিস্যু এই সব।

এই টিস্যুরা আবার আর একটু বড়ো বড়ো দলে ভাগ হয়ে নতুন কতকগুলো দল গড়ে তোলে।

তাদের বলে অঙ্গ। যেমন,—হজমের জন্য পাকস্থলী, লিভার, অন্ত্র, রক্ত চলাচলের জন্য হৃৎপিণ্ড; দেহ যন্ত্রের

হেড-অফিস, মগজ ইত্যাদি।

এখানেই শেষ নয়—

অঙ্গগুলোও আবার দল পাকায়—আরও বড়ো দল।

কতোগুলো অঙ্গ একত্র হয়ে গড়ে তোলে নতুন দল, তাকে বাংলায় বলে তন্ত্র, ইংরেজীতে সিষ্টেম্। এই তন্ত্র বা সিষ্টেম্-গুলোর ওপরই শেষ পর্যন্ত পুরো শরীরটা চালিয়ে নেবার ভার। এরাই হলো আজব-কলের সর্দার কর্মী।

এরা কারা?

যেমন—শ্বাস-প্রশ্বাসের ভার যার ওপর নাম তার শ্বাসতন্ত্র। খাওয়া, হজম করার ভার যার, তার নাম হজমতন্ত্র। রক্ত চালিয়ে সেলগুলোকে জিইয়ে রাখছে যে, নাম তার রক্তচলাচলতন্ত্র—এই আর কি!

কাজেই দেখছি, বেশ একটা নিয়মমাফিক কায়দায় আমাদের আজব-কল, দেহটা চলছে। এ যেন বিরাট কোন অফিস বা কারখানা। তন্ত্র চালাচ্ছে অঙ্গকে, অঙ্গ টিস্থকে, টিস্থ সেলকে। কিন্তু সর্দার কর্মী যারা, সেই তন্ত্র, তাদের চালাচ্ছে কে?

কারখানার দশটা বিভাগের দশজন ম্যানেজার। তাদের নীচে কুড়িজন অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ম্যানেজার। তাদের নীচে পঞ্চাশজন বড়বাবু। তাদের নীচে অসংখ্য কর্মী।

এই তো?

কিন্তু ওই দশজন ম্যানেজার চলছে কার হুকুমে? আর হুকুম এক জায়গা থেকে না এলে তো যে যার খুশিমতো চলতে পারে। তবেই তো হয়েছে! কারখানার বারোটা বেজে যাবে যে!

কিন্তু তা হয় না। সবার ওপরে থাকেন একজন—তিনি হলেন মালিক।

ঠিক তেমনি।

আমাদের এই তন্ত্রগুলোর ওপরে একজন মালিক আছেন—নাম তাঁর মগজ—মাথার মধ্যে তাঁর অফিস। তাঁর হুকুমেই চলছে সব। একটু বেতাল বেচাল হবার যো নেই। তবে এই হেড-অফিসে যদি গোল বেঁধে যায়, তখন আলাদা কথা। তখন তাকে আমরা পাগল বলি। তাই না?

ইঞ্জিন নাকি?

আমাদের দেহ, আর স্টিম-ইঞ্জিনে মিল অনেক।

ইঞ্জিনে কয়লা লাগে, জল লাগে। তা না হলে বাষ্প তৈরি হয় না। আর বাষ্প না হলে ইঞ্জিন চলে না।

আমাদেরও তাই। খাবার চাই, জল চাই—তবে দেহ চলবে। আবার যা-তা কয়লা, ঘোলাটে জল, নোনা জল দিয়ে চালালে ইঞ্জিন যেমন বিকল হয়, আমাদেরও তাই। ভালো ভালো খাবার চাই, বিশুদ্ধ জল চাই—তবেই তো! আর সেই খাদ্য ও জল

ইঞ্জিনের কয়লার মতো শরীরের মধ্যে পোড়ে, হজম হয়, তবেই তো ইঞ্জিনের বাষ্পের মতো শরীরের তেজ ও শক্তি তৈরি হয়। আর তাই না আমরা বাঁচি, চলি-ফিরি, কাজ করি। ইঞ্জিনের চোঙা দিয়ে, নল দিয়ে, ধোঁয়া, বাজে জল, বাজে সব জিনিস বেরিয়ে যায়। না বেরুলে ইঞ্জিনের কলকব্জার মধ্যে ওগুলো আটকে গিয়ে ইঞ্জিনকে বিগড়ে দেয়।

আমাদেরও তাই।

আমরা যা খাই আর নাক দিয়ে যে বাতাস টেনে নেই, তার সাথে অনেক বাজে জিনিস, অনেক দূষিত জিনিস শরীরে ঢুকে পড়ে। তাছাড়া বাতাসের সাথে আমরা যে অক্সিজেন টেনে নেই, তা শরীরের মধ্যে ঢুকে কার্বন ডাই-অক্সাইড নামে একটা বিষাক্ত গ্যাস তৈরি করে। এটাই শরীরের তাপ সৃষ্টি করে। বড় গরম গ্যাস এটা। কিন্তু যেটুকু দরকার তার বেশি হলেই মরণ। তাই এটা সাথে সাথে বেরিয়ে আসে নাক দিয়ে। তাই তো আমাদের নাক দিয়ে বেরিয়ে-আসা বাতাসটা এতো গরম।

খাবারের মধ্যকার যেসব জিনিস শরীর নেয় না, শরীর তা ছিবড়ে করে বার করে দেয়। সেগুলোই বেরিয়ে আসে মল হয়ে, মূত্র হয়ে, ঘাম হয়ে। এরা যদি না বেরুতো, তবে সর্বনাশ হতো।

ইঞ্জিন বিগড়ালে মিস্ত্রি ডাকতে হয়,—আমাদের দেহ বিগড়ালে ডাক্তার ডাকি।

মোটকথা, ঠিকমতো চালু রাখতে হলে দুটোকেই খু-ব তোয়াজে রাখতে হয়।

কিন্তু তফাৎ আছে–

একই মতো হলে আজব কল আর আজব হলো কী?

আমাদের দেহে যে তেজ ও শক্তি তৈরি হচ্ছে, তার কোন ক্ষয় নেই। ইঞ্জিনের শক্তির ক্ষয় আছে।

মানুষের দেহ যে কোনো অবস্থায় নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। ইঞ্জিন পারে না তো।

আমাদের দেহ বাড়ে। ইঞ্জিন বাড়ে না।

সবশেষে আমাদের ভেতর লুকিয়ে আছে প্রাণ—যার ফলে আমরা জন্মি, বাড়ি, যেদিক খুশি সেদিক যাই, চিন্তা করি, কথা বলি, বংশ বিস্তার করি।

ইঞ্জিন কি তা পারে?

কাঠামোর কথা—

মূর্তি গড়তে যেমন কাঠামো লাগে, বাঁশ কাঠ, খড় কুটো—আমাদেরও তাই।

একটা আশ্চর্য কাঠামোর ওপর আমাদের শরীরটা দাঁড়িয়ে আছে—বাঁশ-কাঠের নয়, হাড়ের। এই কাঠামোটি না থাকলে দেহটা হতো একতাল মাংস।

প্রাণীদের মোটের উপর দুটো ভাগ করা হয়েছে, যাদের মেরুদণ্ড আছে, আর যাদের নেই।

যাদের নেই, তারা হলো পোকা, মাকড়, কেঁচো, জোঁক এইসব। মাছ হলো পৃথিবীর প্রথম মেরুদণ্ডওলা প্রাণী। আমরা হলাম মাছের দলের।

এক সেলওলা প্রোটোজোয়া ধাপে ধাপে উন্নীত হতে হতে হঠাৎ এসে এমনি ধারা দুটো দলে ভাগ হয়ে গিয়েছিলো।

শেষ অবধি দেখা গেলো, মেরুদণ্ড যাদের গজিয়েছে, তারাই এগুচ্ছে চটাপট্—এটা থেকে ওটা, মাছ থেকে সরীসৃপ, (সাপ, গোসাপ, টিক্‌টিকি, কুমীর, এসব); সরীসৃপ থেকে শ্বাপদ ; প্রথমে চার পা-ওলা, (গোরু-ঘোড়া, হাতী ইত্যাদি), তারপরে দু'পা-ওলা মানুষ।

কাজেই মনে হয়, প্রাণীর উন্নতির মূলে মেরুদণ্ড একটা মস্তবড়ো ব্যাপার।

ওটা যারা পেলো না—তারা সেই যেখানে ছিলো সেখানেই রয়ে গেলো।

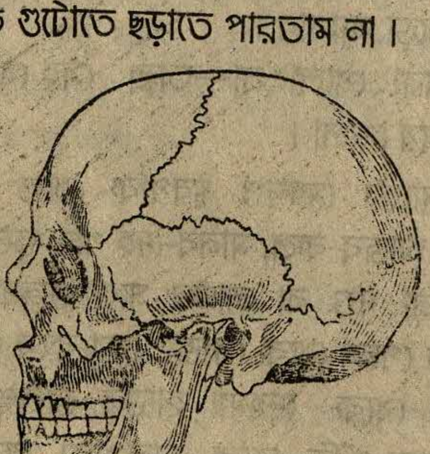
আর মাছের মেরুদণ্ড ঘুরপাক খেতে খেতে শেষ অবধি এই আজব-কল, মানব-দেহ গড়ে তুললো।

একখানা দণ্ড বা লাঠির মতো মেরুদণ্ড আমাদের শরীরটাকে পেছন থেকে সোজা খাড়া করে ধরে রেখেছে। আর ওরি থেকে দেহময় হাড়ের ডালপালা ছড়িয়ে পড়েছে, গাছের গুঁড়ি থেকে ডালপালা বেরোয় যেমনি —তেমনি।

তবে মেরুদণ্ডটা কিন্তু একগাছা লাঠি বা গাছের গুঁড়ির মতো ঠিক নয়।

লাঠি বা গুঁড়িকে বাঁকানো চোরানো যায় না—মেরুদণ্ডকে যায়। তার কারণ, মেরুদণ্ড একখানা গোটা হাড়ে তৈরি নয়। ওটা টুকরো টুকরো কতগুলো হাড়ের একখানা মালা যেন। একটার ওপর আর একটা আলগোছে জোড়া দেওয়া। দুটো টুকরোর মাঝে রয়েছে নরম ও পাতলা একরকম হাড়, আর পিছলে একরকম রস। তারই ফলে আমরা শরীরটাকে বাঁকাতে-চোরাতে পারি, যেমন ইচ্ছে তেমন করতে পারি।

দণ্ডটা যদি সত্যিই দণ্ড হতো, তবে কিন্তু ভারি মুশকিল হতো! হেলেদুলে চলতে পারতাম না, কুঁকড়ে-মুকড়ে শুতে পারতাম না, দরকার মতো শরীরটাকে গুটোতে ছড়াতে পারতাম না।



কী অপূর্ব এর গড়ন

চলতাম, যেন একখানা ডাণ্ডা চলেছে!

এই মেরুদণ্ডের ঠিক ওপরেই রয়েছে মাথা, সমস্ত

শরীরের হেড-অফিস। তার ভেতর রয়েছে মগজ, মানে দেহের মালিক, যার কথা একটু আগেই বলেছি।

কী অপূর্ব এই মাথার খুলির গড়ন!

কেনই বা হবে না অমন? মালিককে কি আর যা-তা ভাবে রাখা যায়? তাই তো তার জায়গা হয়েছে সবার উপরে, আর সবচাইতে সুন্দর, শক্ত আর গোপন জায়গায়।

মাথার খুলিটি ঠিক যেন একটা সিন্দুক।

সিন্দুকে যেমন হীরা, জহরত, মণিমুক্তা রাখা হয়, ওর মধ্যেও রয়েছে তার চাইতেও দামী জিনিস, সেই মগজ। আর তার জন্যই এতো!

কয়েকখানা খুব শক্ত পাতলা হাড়ের তক্তা দিয়ে মাথার এই সিন্দুকটা তৈরি হয়েছে। হাড়ের টুকরো-গুলোর দুধারে সরু সরু খাঁজ কাটা। সেই খাঁজে খাঁজে টুকরোগুলো এমন জোড় বেঁধে গেছে যে পিটিয়েও ছাড়ানো যায় না। তার ওপরে রয়েছে মোটা চামড়া, তার ওপরে চুলের ঢাকনা। হেড-অফিসের কাণ্ড-কারখানাই আলাদা!

এরপরে ঘাড়ের নীচে রয়েছে আর একটি মহামূল্য যন্ত্রের আধার। আর একটি সিন্দুক।

বুক বা বক্ষদেশ। বুকের ইংরেজী চেস্ট। চেস্ট মানে সিন্দুক।

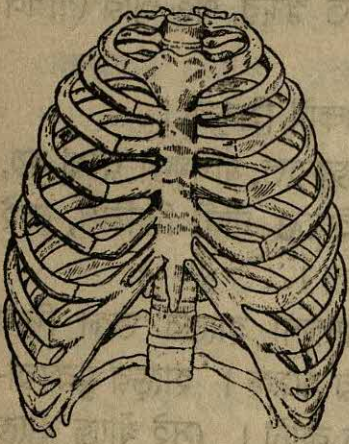
কি রয়েছে ওখানে? হৃৎপিণ্ড আর ফুসফুস।

ওরে বাব্বা! মালিকের পরেই যে এদের মান।

এদেরও কি আর যা-তা জায়গায় রাখা যায়? তাই তো এদের জন্যও সিন্দুক।

কিন্তু এদের কাজ কী?

হৃৎপিণ্ড রক্ত চালায়, আর ফুস্‌ফুস্‌ বাতাস থেকে অক্‌সিজেন টেনে সেই রক্তকে তাজা রাখে, আর সাথে সাথে বিষাক্ত গ্যাস, কার্বন-ডাই-অক্‌সাইডকে বার করে দেয়।



চেষ্ট মানে সিন্দুক

জব্বর কাজ—

এরাই হলো সর্দার কর্মাদের মধ্যে সেরা।

ওই দুটোর একটাও যদি রেগেমেগে কাজ বন্ধ করে দেয়, তবে আর দেখতে হবে না—নির্ঘাত মৃত্যু। তাই ওদেরও অতো যত্ন করে সিন্দুকে পুরে রাখতে হয়েছে।

এই সিন্দুকটা আবার কেমন?

খুব শক্ত, তবে মাথার মতো নয়।

বারোজোড়া সরু শক্ত ও বাঁকা হাড় মেরুদণ্ড থেকে গড়ে উঠে দুপাশ দিয়ে বুকটাকে বেড়ে ধরেছে। সামনের দিকে এরা এসে একে জুড়েছে দুপাশ দিয়ে একখানা খাড়া লম্বা ও পাতলা হাড়ের সাথে।

এই বারোজোড়া হাড়কে বলে পঞ্জর বা পাঁজরা, ইংরেজীতে রিবস্‌।

এরপরেই রয়েছে শরীরের আর কয়েকটি মূল্যবান যন্ত্রের স্থান। তা হলো পেট।

পেটের মধ্যে যারা আছে, তাদের মধ্যে প্রধান হলো পাকস্থলী, যকৃৎ ও অন্ত্র। ইংরেজীতে পাকস্থলী হলো ষ্টম্যাক, যকৃৎ হলো লিভার, আর অন্ত্রকে বলে ইন্টেষ্টাইন। এরাঁও ওই সর্দার কর্মীদলের।

খুব গুরুতর কাজের দায় এদের ওপর। এদের বাদ দিয়ে একমুহূর্তও চলা যায় না। পাকস্থলী ও ছোট অন্ত্র হজম করায়।

আর লিভারের কাজ ? সে সাংঘাতিক।

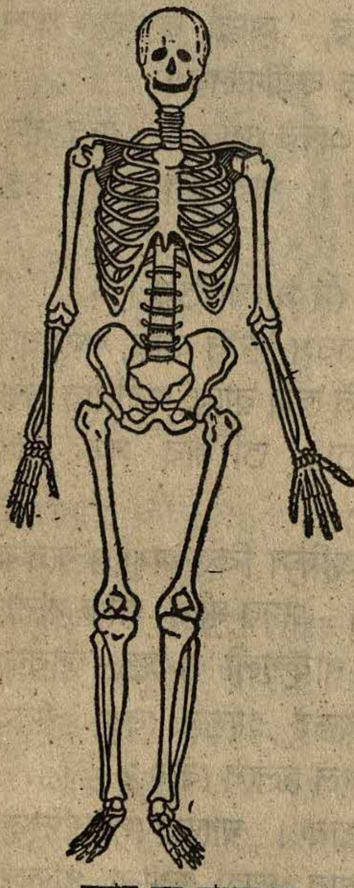
লিভার হজমের জন্য পিত্তরস তৈরি করে, শরীরের তেজ ও শক্তি রক্ষার জন্য চিনি জমা রাখে, শরীরের জন্য চর্বি তৈরি করে, আরও কতো। তা পরে সব খুলে বলবো।

এমন দুটি সর্দার কর্মীর অফিস কিন্তু মাথা ও বুকের মতো হাড়ের বেড়া দেয়া নয়। এদের মধ্যে আছে যারা, তাদের কেউ কেউ, যেমন পাকস্থলী ও অন্ত্র, আবার নড়াচড়া করে কিনা! কাজেই হাড়ের বেড়া দিয়ে তাদের পোক্ত করে আটক দিলে চলবে কেন ?

আবার ওপরদিকে ওঠা যাক। ঘাড়ের পেছনদিকে, পিঠের দুপাশে আছে পাথ্‌নার মতো দুখানা পাতলা চেপ্‌টা হাড়। আর তার সাথে লেগে আছে দুটো হাত।

কাঁধ থেকে কনুই অবধি আছে একখানা লম্বা হাড়, আর কনুই থেকে কবজি অবধি যেটুকু, তা তৈরি দুটো লম্বা হাড় দিয়ে। আঙুলে আছে অনেকগুলো ছোট ছোট হাড়।

এদিকে আবার কাঁধটিকে ঠেলে টান করে রেখেছে দুটো কণ্ঠার হাড়।


অবাক হয়ে ভাবতে হয়

তলপেটের পেছনে রয়েছে দুখানা চওড়া হাড়, জুড়ে আছে মেরুদণ্ডের শেষপ্রান্তের সাথে। ওরই সাথে ঝুলে আছে দুটো পা। পায়ের হাড়ও হাতের হাড়ের মতো।

অবাক হয়ে ভাবতে হয়, কী করে এমন একটি অপূর্ব কাঠামো গড়ে উঠলো। প্রতিটি হাড় কে যেন কতো বিচার বিবেচনা করে, কতো বুদ্ধি খরচ করে ঠিক জায়গামতো বসিয়ে দিয়েছে। আর সে কাজে নিপুণতা কতো!

গোটা কাঠামোটা গড়তে হাড় লেগেছে, ছোটোবড়ো

মুগো ছয় খানা। তার একখানাও বাজে নয়, অকেজো নয়। সবারই নিজ নিজ কাজ আছে। কেউ দেহের জটিল অংশগুলো রক্ষা করছে, কেউ দেহটাকে শক্ত-পোক্ত করে রেখেছে, কেউ বা নড়তে চড়তে সাহায্য করছে। আরো কতো!

কতো শক্ত?

কাজেই হাড়গুলো কতো শক্ত! আর তাই আমরা কথায় বলি 'হাড়ের মতো শক্ত'। তাই না? কিন্তু আজব কলের সবই আজব! ওই যে পোক্ত হাড়, ওর মধ্যে যা আছে, তার অর্ধেকই হল জল। আর বাকিটা চুন আর আঠা-জাতীয় একটা জিনিস। শক্ত যা দেখছি, তা ওদেরই জন্যে।

কী ভয়, কী লজ্জা—

হাড় কিন্তু নিরেট নয়, মোটেই নয়—ফাঁপা যেন বাঁশ। তবে বাঁশের ফোকর একেবারেই ফাঁপা, হাড়ের তা নয়। ওর মধ্যে লাল নরম মতো একটা পদার্থ আছে। তার নাম মজ্জা।

পাড়াগাঁয়ে দেখেছি, গেরস্ত ঘরের বাঁশের খুঁটি ফুটো করে পয়সা রাখে। চুরি হওয়ার ভয় আছে, তাই এতো সাবধান। চোর বাক্স-প্যাঁটরা খুঁজবে—খুঁটি তো আর খুঁজবে না। এও কি তাই? কেন এত ভয়?

এমন কী জিনিস ওই মজ্জা—যাকে গোটা দেহে আর কোথাও রাখতে ভরসা হল না ? কেন এত লজ্জা ?

তার কারণ আছে,—খুব গুরুতর কারণ। মজ্জার মধ্যে রয়েছে রক্তের লাল-সেলের কারখানা।

আগেই বলেছি যে এই লাল-সেলগুলো সেকেণ্ডে প্রায় এক কোটি করে মরছে। এই হারে মরতে থাকলে তো ভরসা ভালো ! কারণ, এরা দেহের মধ্যে যে কী গুরুতর কাজ করে যাচ্ছে, তা পরে বলছি। কিন্তু ভয় নেই। ওই যে হাড়ের মধ্যে লুকোনো মজ্জার অতি-গোপন কারখানা, সেখানে আবার প্রতি সেকেণ্ডে কোটি কোটি তৈরি হচ্ছে। কাজেই খরচ আর জমা ঠিকই থাকে। তাই তো ভাবি, মজ্জার কেন এতো লজ্জা ! দেহের অন্য কোথাও একে ঠাঁই দেওয়া খুব নিরাপদ হত না বোধহয়।

মজ্জা কিন্তু জাতে টিস্থ।

এতো ভাল কথা নয়—

কতকগুলো ফাঁপা হাড়ের ওপর তাহলে শরীরটা দাঁড়িয়ে ? এতো ভাল কথা নয় ! মোটেই নয়। বিপদ ঘটতে কতক্ষণ ? ভেঙ্গে দুমড়ে পড়ে যায় যদি ?

তা পড়বে না।

কারণ, দেখা গেছে একই আয়তনের দুটো লোহার খুঁটি—একটা নিরেট একটা ফাঁপা, দুটোরই জোর সমান। অথচ ফাঁপা খুঁটির ওজন কম বলে সুবিধা অনেক।

এই রহস্য মানুষ জেনেছে খুব বেশীদিন নয়। অথচ ফাঁপা মেরুদণ্ড-ওলা প্রাণী পৃথিবীতে এসেছে কতোকাল আগে, কতো কোটি বছর ?

কে এই রহস্যের কিনারা করবে ?

ভাগ্যিস হাড়গুলো ফাঁপা !

যদি নিরেট হতো ? তবে দেহের ওজন কতো যে বেড়ে যেতো ! সেই দেহটাকে চালু রাখতে হিম্‌সিম্‌ খেয়ে যেতে হতো। আর সেটাকে বয়ে বেড়াতে প্রাণীর হত প্রাণান্ত। আরও অনেক বেশি মাংস, অনেক বেশি পেশী, আরও বেশি খাদ্য, আরও রক্ত, আরও অক্‌সিজেন লাগত ! পেল্লায় হতো মানুষের চেহারা।

তা নয় হতো, কিন্তু মজ্জা ? মজ্জা থাকতো কোথায় ? আর মজ্জা না থাকলে রক্ত তৈরি হতো কী করে ?

পেশীর কথা—

কথাটা উঠলোই যখন, চুকিয়েই নেই।

হাড়ের কাঠামোটাকে ঢেকে ঢুকে গোল-গাল করে রেখেছে যে, তার নাম পেশী বা মাংস। এই পেশীর উপরেই থাকে চর্বির ঢাকনা—তার ওপরেই চামড়া।

সারা দেহে পেশী আছে পাঁচশো'। এর মধ্যে কতো গুলোকে আমরা ইচ্ছামতো চালাতে পারি, আর কতক-গুলো নিজেদের মর্জিমত চলে, টেরও পাই না।

হাড়ের উপরে যেসব পেশী আছে, তারা চলে আমাদের কথামতো।

আর পেটের মধ্যে, ধমনীর মধ্যে, শিরা প্রভৃতির মধ্যের গুলো চলছে যে যার আপন মনে—আমাদের ইচ্ছা অনিচ্ছার তোয়াক্কা করেনা।



ঢেকে-ঢুকে গোলগাল করে রেখেছে

কাজেই একটা মুহূর্তও দেহটা বিশ্রাম পাচ্ছে না, ঘুমিয়ে থাকলেও না, জেগে থাকলেও না। এরা কাজ করে, শুধু কাজ করে। কী যে করে—তা জানতেও পাইনে। দেহের সামান্য একটু নাড়াচাড়াতে শতশত পেশী একসঙ্গে কাজ করে যায়, অদ্ভুত সুশৃঙ্খল এরা।

দুটো হাড়ের জোঁড়ার কাছটাতেই পেশীর কাজ বেশি। হাড়ের দুপাশে টানা-সতোন দিয়ে পেশীগুলো আটকানো থাকে; কাজ শুরু হতেই ওরা গুটিয়ে ফুলে শক্ত হয়ে ওঠে। কাজ বন্ধ করলেই আবার আগের মতোন ঢিলে হয়ে যায়। একেই তো আমার গুল বলি। যেমন হাতের গুল, পায়ের গুল, এইসব।

হাড়ের জোড়ার কাছটাতেই এই পেশীগুলো আট-

কানো থাকে বলেই হাত-পাগুলোকে অতো সহজে শক্ত ঢিলে করতে পারি, গুটোতে পারি, বাঁকাতে পারি, আবার ছড়িয়েও দিতে পারি।

দেখা গেছে, যারা খুব শরীর খাটিয়ে কাজ করে তাদের পেশীগুলো খুব শক্ত ও লম্বা গোছের হয়ে ওঠে। এটা মানুষের মধ্যেও দেখা যায়, পশুদের মধ্যেও দেখা যায়। যেমন পশুদের মধ্যে ঘোড়া, হরিণ, বাঘ, সিংহ, এদের পেশী যেমনি লম্বা তেমনি শক্ত।

আবার গায়-খাটুনি যাদের নেই, তাদের পেশীগুলো ঢিলে হয়ে পড়ে। চেহারায় কোন বাঁধন-ছাঁদন থাকে না—নাদুস নুদুস, গোল-গাল।

আবার যে সমস্ত পেশী, বা দেহের অন্যান্য যন্ত্রের কাজ আমরা ভুলে গেছি, বা যাদের কাজে লাগাই না—তারা ক্রমে একদম অকেজো হয়ে পড়ে।

আমাদের দেহে নাকি এমনতরো একশো'টি যন্ত্র আছে; তার মধ্যে কতকগুলো পেশীও আছে।

যেমন, কানের পেছনে আছে সাতটা পেশী। এদেরই সাহায্যে পশুরা কান নাড়ায়, এদিক-ওদিক ঘুরায়, মশা-মাছি তাড়ায়, কোন্‌দিক দিয়ে শব্দ আসছে, বিপদ আসছে, তা আঁচ করে। আমাদের আর ওদের দরকার নেই। কাজেই ওই পেশীগুলো অকেজো হয়ে চুপচাপ বসে আছে। অবশ্য, কান নাড়ানো মানুষ, এখনও মাঝে মাঝে দেখা যায়।

হাঁফ লাগে যে—

খুব পরিশ্রমের কাজ হঠাৎ শুরু করে দিলে আমরা প্রথমটায় বেশ হাঁফিয়ে পড়ি। তখন খুব ঘন ঘন শ্বাস নিতে হয়। তারপরে না থেমে যদি কাজ চালিয়ে যাই, তখন ধীরে ধীরে হাঁফ-ধরা ভাবটা কেটে যায়, দম আবার ফিরে আসে।

কেন হাঁফ লাগে ?

ব্যাপারটা ওই ইঞ্জিনের মতো।

ইঞ্জিন চালু হলেই পুরোদমে চলতে পারে না। খানিক সময় নেয় তেতে উঠতে, মেতে উঠতে। তারপরে ছুটতে শুরু করে। রেল-ইঞ্জিন তো শুরুতে প্রায় দম-ফেটে যাওয়ার মতো করে,—ভোঁস্—ভোঁস্—ভোঁ-ও-ও-স্—ক্যাঁচ্, কোঁচ্।

আমাদেরও তাই।

হঠাৎ যখন খুব বেশিরকম শ্রমের কাজ পেশীগুলোর ওপর চাপিয়ে দেই—ওরা থমকে যায়—চলতে চায় না। তখন লাগে হাঁফ। আর তখনই সারা দেহে নানারকম ওলটপালট শুরু হয়ে যায়। রক্তের পাম্প হৃৎপিণ্ড, আর শ্বাসের পাম্প ফুসফুস সা-মা-ল সা-মা-ল করে ওঠে। রক্ত চঞ্চল হয়ে দাপাদাপি শুরু করে দেয়। তারপরে ধীরে ধীরে সামলে নেয়—হাঁফ কেটে যায়, দম ফিরে আসে।

কল চলে পুরোদমে।

কিন্তু চলে কী করে?

ইঞ্জিন নাহয় চলছে কয়লা পুড়িয়ে জল ফুটিয়ে বাষ্পের শক্তিতে।

কিন্তু দেহ? তার শক্তি আসে কোথা থেকে? সে চলেছে কী করে?

সেকথা তো গোড়াতেই বলেছি,—ওই যেখানটায় ইঞ্জিনের সঙ্গে আমাদের শরীরের তুলনা করা হয়েছে, —সেখানটায়। সেখানে যা বলেছি তার মধ্যে একটা খুব জরুরী কথা আছে।

তাহলো এই যে, ইঞ্জিনের বাষ্প-শক্তি তাকে শুধু চালাচ্ছেই, আর কিছুই নয়। না পারছে বাড়াতে, না পারছে আপনা থেকে ক্ষয় মেরামত করতে।

কিন্তু মানুষের দেহ খাদ্য পুরিয়ে যে শক্তি পাচ্ছে তা দিয়ে একই সঙ্গে দুটো কাজ হচ্ছে। এক হলো, দেহযন্ত্রটা চলেছে। আর হলো, দেহের বৃদ্ধিও হচ্ছে—চলতে গিয়ে যেটুকু ক্ষয় হচ্ছে, আপনা থেকে তা মেরামত হচ্ছে।

খাদ্য আমাদের দেহে এই দুটো কাজ করাচ্ছে একসঙ্গে।

একথাটা মনে রাখলে পরের কথাগুলো বুঝতে সুবিধে হবে।

কি খাই কি খাই—

রাতদিন কেবল খাই, খাই, আর খাই! এতো খাওয়া কেন? আর খাচ্ছি তো যাচ্ছে কোথায়?

বাঃ রে? আমি খাচ্ছি নাকি? খাচ্ছে তো ওই সেলগুলো, কোটি-কোটি-কোটি। আমি কী করতে পারি? রাতদিন কেবল চেঁচাচ্ছে খাবো খাবো খাবো। পাগল করলে রে বাবা! তাই না খাবার দাবার যা পাচ্ছি হাতের গোড়ায়—ধরে দিচ্ছি মুখে পুরে। তারপরে দাঁত আর জিভ দিয়ে খানিক দলাই-পেষাই করে টক্‌কাস করে ফেলছি গিলে! তারপরে কি হচ্ছে জানিনে আমি বাপু। তবে হ্যাঁ—রাক্ষসগুলো থামলো বটে!

সত্যি বলতে কি—আমাদের খাওয়া-দাওয়া যা, সবই ওই সেলগুলোর জন্য। নইলে খাওয়ার এত হাঙ্গামা করতো কে?

ওদের জন্যই আমাদের খিদে পায়—আর খিদের চোটে মুখ দিয়ে যা পেটে পুরি—তা ওদেরই বাঁচিয়ে রাখে—আর তাই না আমরা বাঁচি।

কিন্ত আমরা যেমনটা খাচ্ছি তেমনটাই কী সেলগুলোর কাছে পোঁছাচ্ছে?

না তো।

অনেক কাণ্ডকারখানা করে, অনেক হিজিবিজি ব্যাপার ঘুরে শেষ পর্যন্ত তেজ হয়ে পোঁছাচ্ছে ওদের কাছে।

কোথায় ভাত, ডাল, পাঁঠার ঝোল, ভীমনাগের সন্দেশ আর মালপো—আর কোথায় তেজ?

হায় রে কপাল!

তারপরে?

মুখভর্তি খাবার তো 'নোলার জলে' ভিজে দাঁতের চিবুনি আর জিভের নাড়ুনিতে মণ্ড পাকিয়ে গেলো। নোলার জল যাকে বলি, সে হলো লালা।

কানের গোড়ায় লুকানো একরকম গ্রন্থি বা গ্ল্যাণ্ডের ভেতর ওটা তৈরি হয়ে একটা নল বেয়ে মুখের মধ্যে চলে এসে খাবারটাকে নরম করে দেয়। এদিকে দাঁত আর জিভ মাছের কাঁটা, মাংসের হাড়, আলুর খোসা এই সব শক্ত জিনিস যা পায়, তা তক্ষুণি বার করে দেয়।

যেই না মণ্ড তৈরি হলো, অমনি হেড-অফিসে খবর ছুটলো—মণ্ড তৈরি। সাথে সাথে মুখের পেশীর ওপর হুকুম এলো, দাও ওটাকে ঠেলে গলার মধ্যে ঢুকিয়ে। গলার নালী পেরিয়ে মণ্ডটা পড়লো গিয়ে পাকস্থলী, মানে, যে থলির মধ্যে পাক, অর্থাৎ রান্না হয়, তার মধ্যে।

ওটা থলিই বটে। ফুটবলের ব্লাডারের মতো বাড়ে কমে। সাথে সাথে কী কাণ্ড সেখানে! থলিটা কুঁচকে-মুচকে দলে-পিষে দিতে লাগলো মণ্ডটাকে।

সাথে সাথে থলির গা থেকে চুঁইয়ে চুঁইয়ে একটা হজমী রস বেরিয়ে মণ্ডটাকে একদলা কাদার মতোন করে ফেললো।

এই রসটা ভারী তেজী, এটা অম্ল, মানে টক-মতোন। খাবারের সাথে যদি কোনো রোগের জীবাণু চলে আসে, তবে এই রস তাকে শেষ করে দেয়। এর মধ্যে আর একটা জিনিস আছে। তার নাম

পেপ্‌সিন। পেঁপের রসের মধ্যে পেপ্‌সিন পাওয়া যায়। এর কাজ হলো, খাবারের মধ্যে ভারি জিনিস, যাকে বলে প্রোটিন, অম্লরস যাকে কায়দা করতে পারে না, তাকে গুঁড়িয়ে দেওয়া।

ভালো রাঁধুনি মাংস রাধতে পেঁপের রস দিয়ে থাকেন। ওতে মাংস সহজে ভালো সেদ্ধ হয়।

পাকস্থলীর কাজ এখানেই শেষ হলো।

আর শেষ হতেই ওর নীচের দিকে একটা মুখের মতো আছে, সেটা গেলো খুলে।

তারপরে সে এক কাণ্ড! এই খোলা মুখ দিয়ে পাতলা খাবারটা ঢুকলো এসে আর একটা জায়গায়। তার নাম অন্ত্র।

অন্ত্র মানে নাড়ী। ওর দুটো ভাগ আছে, ক্ষুদ্র মানে ছোট, আর বৃহৎ মানে বড়ো।

খাবারটা পড়লো এসে ক্ষুদ্র-অন্ত্রের মধ্যে। আর এখানেই তার শেষ অবস্থা।

প্রায় পঁচিশ ফিট লম্বা এই সরু নাড়ীটা হিজিবিজি হয়ে তালগোল পাকিয়ে লুকিয়ে রয়েছে আমাদের পেটের মধ্যে।

খাবারটা এখানে পেঁছলো মাত্র পিত্তথলি থেকে ছুটে এলো পিত্তরস, পিত্তনালীর ভেতর দিয়ে। ওই যে মাছের পেটে পিত্তথলি দেখি, ঘন সবুজ মতো জল, কী তেতো! ওই জিনিস।

এতেও হলো না। এবার এলো একেবারে ব্রহ্মাস্ত্র—

অগ্ন্যাশয় রস। যেমন কড়া নাম, তেমন কড়া এর তেজ।

পাকস্থলীর গায়ে অগ্ন্যাশয় বলে একটা গ্ল্যাণ্ড আছে। ইংরেজীতে এর নাম প্যানক্রীয়্। অগ্ন্যাশয় মানে, আগুনের আশয় অর্থাৎ, যেখানে আগুন থাকে। ওই রসটাই হলো সেই আগুন। এর চেয়ে তেজী রস মানুষের শরীরে আর নেই। এখন, লিভার থেকে পিত্ত রস, আর অগ্ন্যাশয় থেকে অগ্ন্যাশয় রস মিশলো এসে পাঁক-পানা ঐ খাবারটার সাথে।



খাচ্ছি তো যাচ্ছে কোথায় ?

তারপর ?

তারপর আর নেই।

কি নেই ?

খাদ্য বলতে আমরা যা বুঝি, তার আর কিছুই নেই।

তবে সেলগুলোর গতি কি হবে ? তারা খাবে কি ?

আমাদের খাদ্য আর তাদের খাদ্য তো এক নয়। আমরা যা খেলাম, এভাবে তা হজম হয়ে তাদের খাদ্য

তৈরি হলো। সে খাদ্যটা তারা কি করে খায়, এবারে সেই কথা।

কাজেই দেখতে পাচ্ছি, অগ্ন্যাশয় রসের কল্যাণে আমাদের খাদ্যের যেটা শেষ অবস্থা, সেলদের কাছে সেটা কেবল কাঁচামাল।

আমাদের হজম শেষ হলো, ওদের কেবল বাজার এলো—এবার রান্না চড়বে।

চিনিভাঙা কল—

চিনির কল তো শুনেছি। চিনিভাঙা কলটা আবার কেমন ?

আছে।

আমরা যা খাই, তাকে মোটামুটি তিনটা ভাগ করা যায়,—কার্বোহাইড্রেট, যেমন চাল, গম, আলু, মিষ্টি ইত্যাদি। দুই, ফ্যাট,মানে স্নেহদ্রব্য, যেমন ঘি, মাখন, তেল ইত্যাদি। আর প্রোটিন—যেমন মাছ, মাংস, ছানা ডিম ইত্যাদি।

এখন ওই যে কার্বোহাইড্রেট, ওটাই হলো চিনি। ওটাই শেষ পর্যন্ত হজম হয়ে শরীরের মধ্যে চিনি হয়ে দাঁড়ায়, আর ওটাই শরীরের তেজ ও শক্তির যোগান দেয়। কিন্তু শরীর আবার চিনিটাকে না ভেঙে হজম করতে পারে না।

ভাঙা মানে ?

কার্বোহাইড্রেট কথাটার মধ্যেই মানেটা লুকিয়ে

আছে। কার্বো হল স্রেফ কাঠকয়লা, আর হাইডার মানে জল। তাহলে চিনি, গুড়, চাল, গম, আলু এসবই শেষ পর্যন্ত হলো কয়লা আর জল। ফ্যাসাদ কতো!

কিন্তু ভাঙি কী করে?

ভাবনা নেই। ব্যবস্থা ঠিক আছে।

ঐ যে অগ্ন্যাশয়, ওরই মধ্যে একটা রস তৈরি হয়, তার নাম ইন্সুলিন। ঐ ইন্সুলিনই চিনিকে ভেঙে দুভাগ করে দেয়, কার্বন-ডাই-অক্সাইড আর জল। তবেই শরীরে তাপ জন্মায়, তেজ ও শক্তি জন্মায়।

এখন অগ্ন্যাশয় রসের সাথে ইন্সুলিন যদি ঠিকমতো না বেরোয়, তবে হয় ভীষণ বিপত্তি। চিনি ভাঙা হয় না বলে শরীরে তেজ জন্মায় না। শরীর দুর্বল হয়ে পড়ে আর শরীরে চিনি জমতে থাকে। তখন ঘন ঘন প্রস্রাব হয় এবং তার সাথে চিনি বেরিয়ে আসে। একে বহুমূত্র বলে।

ইনসুলিন দিয়ে বহুমূত্রের চিকিৎসা করা হয়।

বাঁচায় যে—

লিভ্ (Live) কথাটার অর্থ হল বাঁচা।

কাজেই লিভার (Liver) কথাটার মানে দাঁড়ায় 'বাঁচায় যে'। এর কথা আগে কিছুটা বলেছি। বড় দরকারী যন্ত্র এটা।

এ করে কী, রক্ত যখন এর ভেতর দিয়ে চলতে থাকে, তখন তার থেকে বাড়তি চিনিটুকু ধরে রাখে।

কেন?

যখন রক্তে চিনির কমতি পড়বে, তখন ঘাটতি পূরণ করবে বলে।

আজব আর কাকে বলে!

তাছাড়া, ওই যে পিত্তরসের কথা বলেছি, তাই দিয়ে লিভার স্নেহ-পদার্থগুলোকে হজম করায়।

সেও এক মজার ব্যাপার।

খেলাম তেল, ঘি, মাখন, আর তাই পেটে গিয়ে পিত্তরসের সাথে মিশে হয়ে গেল সাবান-গোলা মতোন! আর তাই চর্বি হয়ে চামড়ার নীচে স্থান পেলো।

চর্বিকে বলে জমাট শক্তি। চর্বি শরীরকে সুন্দর সুগোল করে, শরীরের তাপ আটকে রাখে এবং শরীরে কার্বোহাইড্রেটের কমতি পড়লে আপনাতেই জল ও কার্বন-ডাই-অক্সাইডে ভাগ হয়ে শক্তির যোগান দেয়।

আরও আছে। পেটে যা দিলাম, তার মধ্যে অনেক বাজে জিনিস তো থাকে। তা ছাঁটাই হয়ে যায়। তারই মধ্যে কতক লিভারের সাহায্যে ইউরিক অ্যাসিডে রূপ নেয়, এবং শেষ পর্যন্ত মূত্র ও ঘাম হয়ে বেরিয়ে যায়।

ভাগ্যিস্ লিভার ছিলো, তাই বাঁচোয়া।

কিন্তু এ তো কেবল শরীরের তেজ ও শক্তির কথাই হচ্ছে—ইঞ্জিনের বাষ্প। খাদ্যের সেই দেহ-গড়ন আর দেহ-মেরামতী কাজ কোথায়? কে করে সেটা?

গড়ন-বাড়ন যার হাতে—

সে কাজ করে প্রোটিন। গড়ন-বাড়ন তারই হাতে।

আগেই বলেছি, পাকস্থলীর রস পেপ্‌সিন এই প্রোটিনের (মাছ, মাংস, ডিম ইত্যাদি) বেশির ভাগ হজম করিয়ে দেয়। বাকি যেটুকু থাকে সেটুকু পুরো হজম হয়ে যায় অগ্ন্যাশয় রসের টিপ্‌সিন নামে একটা পদার্থ দ্বারা। হজম হওয়া প্রোটিন শরীরের ক্ষয় পূরণ করে, নতুন নতুন সেল তৈরি করে। এবং তারই ফলে এই আজব-কল দেহ চলতে চলতে বাড়ে, ক্ষয় মেরামত হয়, রোগা লোক মোটা হয়।

ইঞ্জিনের সাথে তফাতটা এখানেই।

বৃহৎ অন্ত্র—

ছোটো অন্ত্রের ব্যাপার দেখলাম। এখন বড়োটার কারবার দেখি। এর হলো কেবল ড্রেনের কাজ। মানে, খাদ্যের সাথে বাজে মাল যা পেটে ঢোকে, আর শরীর যাকে ছাঁটাই করে দেয়, তাই মল হয়ে এই নর্দমার ভেঁতর দিয়ে বেরিয়ে আসে।

কাজেই একেও খুব তোয়াজে রাখতে হয়। না হলে ভারি বিপদ। ময়লা আটকে আজব-কল বিগড়ে বসবে।

খুদে রাক্ষসের খাওয়া—

এতক্ষণ তো আমরা খেলাম। কিন্তু যাদের জন্য খাওয়া, খুদে-রাক্ষস, সেই সেলগুলোর খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারটা ?

এবার সেটাই দেখবো।

কত ঘটা করে তো হজম হলো। এতে লাগলো প্রায় তিন চার ঘণ্টা। তারপরে খাবারটা ছোটো অন্ত্রের গা দিয়ে চুঁইয়ে চুঁইয়ে মিশলো গিয়ে রক্তে। আর তক্ষুণি হেড অফিস থেকে তলব হলো অক্‌সিজেন-এর। হুকুম হলো—ওকে জ্বালিয়ে দাও, পুড়িয়ে দাও।

ওরে বাবা! জ্বালাবে পোড়াবে কী? অগ্নিকাণ্ড করবে নাকি ?

প্রায় তাই।

তবে যেমন আগুন আমরা দেখে থাকি, তেমন নয়।

ফুসফুসের টানে বাতাসের সাথে অক্‌সিজেন ঢুকছে অবিরত আমাদের শরীরে। কেন যে অক্‌সিজেন আমাদের চাই, এবারে তা বুঝবো।

অক্‌সিজেন বড়ো মিশুক গ্যাস, বাতাসের সাথে মিশে আগুন জ্বালায়, লোহার গায়ে লেগে মরচে ধরায়। কোন জিনিস পুড়ে গেলেই তার থেকে শক্তি বেরোয়।

এখন এই খাবার-মেশা রক্তের সাথে অক্সিজেন মিশে তাকে দেয় পুড়িয়ে। আর তখুনি সৃষ্টি হয় তাপ, তাপ থেকে শক্তি। এতক্ষণে তৈরি হলো সেলের খাবার। রক্ত তক্ষুণি সেই খাবার নিয়ে দে ছুট।

কোথায় ?

গোটা শরীরময় ছড়িয়ে আছে রক্ত-চলার নদী, নালা, খাল—মোটা, সরু, আরও সরু,—আরও –আরও।

আসছি সে কথায়।

রক্ত ছুটলো তার ভেতর দিয়ে—খাওয়াতে হবে যে। হাঁ করে আছে খুদেগুলো।

এই চলার পথেই লিভার আটকে রাখে বাড়তি চিনি, আর পেশীগুলো রাখে চর্বি।

কেন ? তা তো বলেছি।

আর প্রোটিন ? তার জন্য আলাদা জায়গা নেই। রক্তের সাথে সে চলে যায় প্রতি সেলে। সেল কিন্তু সবটুকুই খায় না। কিছুটা ছিবড়েও ফেলে।

সেটা আবার কি ?

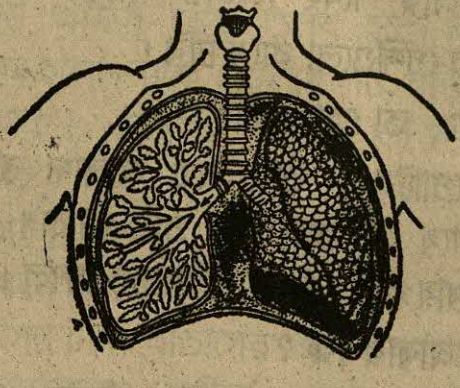
সেটা হলো কার্বন-ডাই-অক্সাইড, ওই যে আগে বলেছি—সেই বিষাক্ত গ্যাস। রক্ত তখন ফিরতি পথে ওটাকে বইয়ে আনে। আর হেড-অফিসের হুকুমে ওটা নাক দিয়ে বেরিয়ে যায়।

বাতাস। বাতাস।—

তা হলে দেখতে পাচ্ছি, বেঁচে থাকতে শুধু পেট পুরে খেলেই হলো না, বাতাস চাই, বাতাস। কারণ, শেষ অবধি সেলের খাবার তৈরি যে করে দেয়, সেই অক্সিজেন রয়েছে বাতাসে মিশে।

কিন্তু এই বাতাস টানা-ছাড়ার জরুরি কাজটি করছে কে?

করছে ফুস্‌ফুস্‌, নাকের সাহায্যে। ফুস্‌ফুস্‌ কি এবং শরীরের কোথায় থাকে, তা গোড়াতেই কাঠামোর কথা বলতে গিয়েই বলেছি।



পাঁজরার সিন্দুকের মধ্যে গোটা বুক জুড়ে আছে

পাঁজরার সিন্দুকের মধ্যে প্রায় গোটা বুকটা জুড়ে আছে ফুস্‌ফুস্‌, দেখতে মৌচাকের মতো, অজস্র, অসংখ্য ছোটো ছোটো খোপ তাতে। পাতলা চামড়া দিয়ে তৈরি

খোপ-গুলোর গা। খুব খুদে নলের যোগ রয়েছে একটার সাথে আর একটার। শ্বাস টানবার সাথে সাথে বাতাস এসে ঐ খোপগুলো ভরে দেয়। আর বাতাসের অক্সিজেন খোপের পাতলা চামড়া চুঁইয়ে চুঁইয়ে রক্তের সাথে মিশে যায়। আর তাই নিয়ে রক্ত ছুটতে শুরু করে দেয় সেলগুলোকে খাওয়াতে। খাইয়ে-দাইয়ে রক্ত আবার ফিরে আসে ফুস্‌ফুসের গায়ে।

এবার কিন্তু রক্ত আর লাল থাকে না। হয়ে যায় কালোমতো নীল।

আচ্ছা ঝামেলা বটে! রক্ত আবার নীল কেন?

ঐ যে বলেছি, সেলগুলো খেয়ে দেয়ে ছিবড়ে ফেলে, কার্বন-ডাই-অক্সাইড্ যাকে বলে। তাই রক্তে মিশে লাল রক্ত হয়ে যায় নীল।

কিন্তু ছিবড়েটা যায় কোথায়?

বেশিটা যায় নাক দিয়ে বেরিয়ে। আর খানিকটা থেকে যায়। রক্তকে নীল করে তোলে।

এখন এই দূষিত রক্ত যেই না ফিরে আসে ফুস্‌ফুসের গায়ে, অমনি আবার খোপগুলোর গা চুঁইয়ে অক্সিজেন বেরিয়ে ওটাকে সতেজ করে দেয়; নীল রক্ত টুক্‌টুকে লাল হয় আবার।

আমাদের হাতে পায়ে কতকগুলো নীল শিরা দেখি না? ওরা নিয়ে চলেছে সেই দূষিত রক্ত ফুস্‌ফুসের কাছে।

প্রশ্বাস-নিঃশ্বাসের কথা—

ওই যে আগেই বলেছি, হজম-টজম হওয়ার পরে খাবারটা যেই না এসে রক্তে মিশলো, অমনি হেড-অফিস, মগজ তলব করলো অক্সিজেনকে, জ্বালিয়ে দাও, পুড়িয়ে দাও। সাথে সাথে পাঁজরার পেশীগুলো ফুলে উঠলো, আর নাকের ভেতর দিয়ে বাতাস ঢুকে পড়লো ফুস্‌ফুসের মধ্যে। তারপরেই পেশী আবার কুঁকড়ে গেলো। সাথে সাথে নিঃশ্বাস হয়ে কার্বন-ডাই-অক্সাইড মেশানো বাতাস বেরিয়ে এলো নাক দিয়ে।

এই ভাবেই চলেছে ফুস্‌ফুসের কাজ, কি ঘুমে, কি জাগরণে, জন্মদিন থেকে মৃত্যুদিন পর্যন্ত। ওর আর বিশ্রাম নেই। আর ওর বিশ্রাম মানেই তো মৃত্যু।

কারণ, অক্সিজেন যদি রক্তে না মিশলো, তবে সেলগুলো তো আর বাঁচবে না।

সুস্থ অবস্থায় আমরা মিনিটে পনেরো কুড়িবার বাতাস টানি ও ছাড়ি (প্রশ্বাস-নিঃশ্বাস)।

কাজেই দেখতে পাচ্ছি, বেঁচে থাকতে শুধু পেটপুরে খেলেই চলে না—বুকভরা বাতাসও চাই।

মুখে খাবার পুরে দেওয়ার সাথে সাথে 'আহার' নামে যে কাজটি শুরু হলো, তার শেষ হলো গিয়ে ফুস্‌ফুসের টেনে-নেওয়া অক্সিজেনের ছোঁয়া লেগে।

কাজেই বাতাস ছাড়া আহার মিছে, আবার আহার ছাড়া বাতাস মিছে।

রক্ত যদি না চলে—

তা তো হলো।

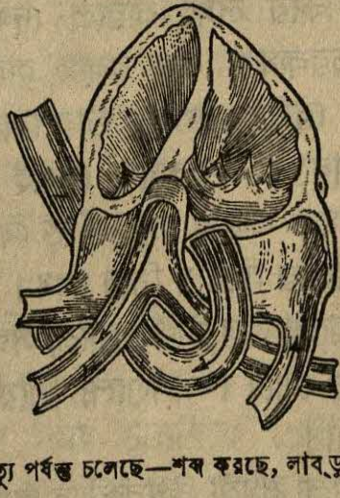
কিন্তু রক্ত যদি না চলে? যদি সেলের কাছে খাবার পৌঁছে না দেয়? তবে?

তবে আর কি? তবে তো মরতুম।

কিন্তু মরা কি অতো সোজা? রক্ত চলবে না, এটা একটা কথা হলো? ওকে চালাবার জন্য বিরাট ব্যবস্থা রয়েছে যে। না চলে ওর সাধ্য কি?

তবে চালাচ্ছে কে?

চালাচ্ছে সেই পাঁজরার সিন্দুকে-পোরা সর্দার-কর্মীদের আর একজন—হৃৎপিণ্ড। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এ-ও চলেছে, আর শব্দ করছে লাব্‌ডুপ্‌—লাবডুপ্‌।



জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত চলেছে—শব্দ করছে, লাব্‌ডুপ্‌, লাব্‌ডুপ্‌

হৃৎপিণ্ড একটা পেশীর থলের মতোন। বুকের একটু বাঁপাশ ঘেঁষে এটা আছে। আর এর দুদিকে

ঘিরে আছে ফুস্‌ফুস্‌। এর মধ্যে আছে চারটে খোপ—ডানদিকে দুটো, উপরে নীচে; বাঁদিকে দুটো, উপরে নীচে। খোপ চারটে পরস্পরের সাথে নল দিয়ে জোড়া। এই জোড়াগুলোর মুখে এমন ব্যবস্থা আছে যে রক্ত শুধু এক-মুখোই চলতে পারে, উপর থেকে নীচে।

নদী-নালা সব—

আগে বলেছি, গোটা শরীরময় ছড়িয়ে আছে রক্ত চলবার নদী-নালা। এরা হলো কতগুলো নল—কতগুলো মোটা, কতগুলো মাঝারি, কতগুলো মিহি, কতগুলো আরও মিহি—এতো মিহি যে অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া দেখা যায় না।

খুব ভালো করে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে এই নলের ব্যবস্থা দুরকম। এক রকম হলো মোটা থেকে সরু ডালপালা বেরিয়ে গেছে, তার থেকে আরও সরু, তার থেকে আরও। তারপরে দেখাই যায় না এতো সরু। ঠিক যেমন একটা গাছ, গুঁড়ি থেকে ডালপালা ছড়িয়ে ছড়িয়ে পাতার শিরায় গিয়ে শেষ।

অপরগুলো হলো উল্‌টো। মানে, সরু থেকে মোটা, তার থেকে আরও মোটা। সেগুলো গিয়ে মিশছে আরও মোটা নলের মধ্যে।

প্রথমগুলো হলো ধমনী, ইংরেজীতে আর্টারি।

আর পরের গুলো হলো শিরা, ইংরেজীতে ভেন্‌।

আর ওই যে অতি-মিহিগুলো জালের মতো ছড়িয়ে

আছে সারা শরীরে, ওরা হলো জালক, ইংরেজীতে ক্যাপিল্যারি।

এখন, এই ধমনীর মোটা নলগুলো শুরু হয়েছে যেখান থেকে, শিরার মোটা নলগুলোও শেষ হয়েছে সেখানেই— অর্থাৎ হৃৎপিণ্ডে।

কেন?

এখান থেকেই দারুণ জোরে রক্ত পাম্প করে দেওয়া হয়। সেই রক্তই সারা দেহ ঘুরে শিরা দিয়ে আবার হৃৎপিণ্ডে গিয়ে হাজির হয়। হৃৎপিণ্ডের পেশীগুলো পাম্পের মতো কখনো চুপ্‌সে যায়, কখনো ঢিলে হয়। তারই ফলে ঐ লাব্‌ডুব্‌ শব্দ।

একজন বয়স্ক সুস্থলোকের হৃৎপিণ্ড মিনিটে বাহাত্তর থেকে আশী বার ঐরকম শব্দ করে।

ফুস্‌ফুস্‌ থেকে অক্‌সিজেন খেয়ে রক্ত চলে আসে হৃৎপিণ্ডে। আসামাত্র ওখানকার বাঁদিকের পেশী দেয় চাপ। তার ফলে সেই তাজা রক্ত ছুটে চলে ধমনী বেয়ে।

আবার পেশী যেই ঢিলে হয়, নতুন তাজা রক্ত এসে ঢোকে হৃৎপিণ্ডে ফুস্‌ফুস্‌ থেকে।

ঠিক এমনি সময় ডানদিকে পেশী কুঁকড়ে যায়। তার ফলে রক্ত ছুটে যায় ফুস্‌ফুসের মধ্যে, অক্‌সিজেন খেয়ে তাজা হতে।

আবার ঐ পেশী যখন ঢিলে হয়ে যায়, তখন দূষিত

রক্ত শিরার ভেতর দিয়ে চলে আসে হৃৎপিণ্ডের ডান-খোপে।

এখানে একটা ভারি মজার জিনিস দেখবার আছে।

হৃৎপিণ্ডের ডান অর্ধেকে থাকে দূষিত রক্ত, আর বাঁ অর্ধেকে থাকে তাজা রক্ত। হৃৎপিণ্ড তার ডানদিক দিয়ে দূষিত রক্ত ফুস্‌ফুসে পাঠিয়ে তাজা করে বাঁ দিকে টেনে নেয়। আর সেখান থেকেই ধমনী বেয়ে তাজা রক্ত ছুটে চলে সেলদের খাওয়াতে।

এগুতে এগুতে রক্তের বেগ ক্রমেই কমতে থাকে। কারণ, চলবার পথ ক্রমেই সরু হয়ে আসে। এইভাবে চলতে চলতে সেই তাজা রক্ত শেষে হাজির হয় তার শেষ সীমায়,—অর্থাৎ জালক বা ক্যাপিলারির কাছে। তার সব কাজ তো এখানেই। এখানেই তো সে এতো-করে বয়ে-আনা খাবারের বোঝা নামিয়ে দেবে; আবার এখান থেকেই সেলদের এঁটো-কাটা কুড়িয়ে নেবে।

এই জালকগুলি অনেক সময়ে এতো সরু যে, ছুটি লাল কণা পাশাপাশি ঢুকতে পারে না—লাইন দিতে হয়। একফোঁটা রক্তে যে-কণা থাকে ত্রিশ কোটি, এতো ক্ষুদে যে কণা, তার ছুটিও একসঙ্গে এখানে পথ পায় না! মাথা ঘুলিয়ে যাওয়ার ব্যাপার যে!

যা হোক, জালক ধমনীরও আছে, শিরারও আছে।

এঁটো-কাটা কুড়িয়ে রক্ত তখন হয়ে যায় গাঢ় নীল, মানে দূষিত। ধমনীর জালক তখন তাকে ঢেলে দেয়

শিরার জালকের মধ্যে! আর যেই না ঢেলে দেওয়া, অমনি সেই নীল রক্ত সেই জালক থেকে সরু নল, তার থেকে আর একটু মোটা, তার থেকে আর একটু, এই করে দে-দে দৌড়। এক দৌড়ে হাজির হয় হৃৎপিণ্ডের সেই ডানভাগে।

তারপরে কি হয় তা তো বলেছি।

তাহলে, এবার দেখলাম আর একটা ব্যাপার। শুধু পেটপুরে খেলে আর বুকভরে শ্বাস নিলেই চলে না, রক্ত চলা চাই। নইলে স-ব মাটি!

আরও খবর—

এতক্ষণে আমরা রক্তের অনেক খবর জেনে ফেলেছি; রক্তের কারখানা কোথায়, রক্ত কিভাবে চলে, রক্ত কি কাজ করে, রক্ত কি ভাবে তৈরি হয়—এই সব।

কিন্তু আরও খবর আছে।

রক্ত কিন্তু ঠিক তরল নয়।

এ আবার কী কথা? ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ছোটে, রক্তের-গঙ্গা বয়ে যায়, রক্তারক্তি কাণ্ড হয়, তবু রক্ত তরল নয়?

যা নয়, তা নয়-ই। আমি তার করব কি?

রক্তের মধ্যে তরল যা, তা হলো শতকরা পঞ্চান্ন-ভাগ। বাকি পঁয়তাল্লিশ ভাগই হলো সেল।

তরল-অংশটার নাম হলো প্লাজ্‌মা।

রক্তের সেলগুলো হলো দু'জাতের। লালকণা,

আর শাদা-কণা। লালকণাদের কাজ-কারবার, হালচাল, কোথায় তারা জন্মায় তা আগেই বলেছি। কিন্তু একটা কথা বলা হয় নি। সেটা হলো—

রক্ত কিন্তু লাল নয়—

সে আবার কেমন কথা ?

অমন টুক্‌টুকে লাল যে রক্ত তা লাল নয় ? তাহলে রক্ত-গোলাপ বলি কেন—রক্ত-জবা ?

ব্যাপার হলো, রক্ত এই লাল-রংটা পেয়েছে হিমোগ্লোবিন নামে একটা পদার্থের কৃপায়।

লালকণাদের সাথে ওটা থাকে মিশে। আর ওর কাজও ভারি মজার। ওই যে অক্‌সিজেন মেশে বলেছি রক্তের সাথে, তা মিশেছে এই হিমোগ্লোবিনের জন্য।

হিমোগ্লোবিন করে কী, অক্‌সিজেন পেলেই চট্‌ করে তাকে লালকণার সাথে মিশিয়ে দেয়। সে কিন্তু নিজে মিশে যায় না, বা নিজে অক্‌সিজেন গিলে ফেলে না। অক্‌সিজেন নিয়ে লালকণাদের সাথে ছুটে ছুটে সেলদের খাইয়ে আসে। এসে আবার অক্‌সিজেন ধরবার জন্য ওৎ পেতে বসে থাকে।

শরীরের মধ্যে এরকম আরও অনেকগুলো জিনিস আছে। তাদের কাজ এর সাথে ওকে মিলিয়ে দিয়ে আস্তে সরে পড়া। এরা না থাকলে আমাদের আজব-কল, দেহে নানারকম গোল পাকিয়ে যেতো।

এই নিঃস্বার্থ কর্মীদের বলে ক্যাটালেটিক্ এজেন্ট। সোজা কথায় ঘটক।

সেপাই-ফৌজের কথা—

শাদাকণারা হলো রক্তের সেপাই। তারা দেখতে লালদের চাইতে একটু বড়ো, আর সংখ্যায়ও কম।

লালকণা তৈরি কারখানার মতো শাদাকণা তৈরির কারখানা শরীরের কেবল একটা জায়গাতেই রয়েছে তা নয়। সারা দেহে ছড়ানো বিশেষ একরকম গ্ল্যাণ্ডের ভেতরে এরা জন্মায়। এদের কাজ হলো বাইরের আক্রমণ থেকে শরীরকে বাঁচানো। রক্তের মধ্যে এমন যদি কিছু ঢুকে পড়ে, যাতে ক্ষতি হতে পারে, শাদাকণারা তক্ষুণি তাকে বেমালুম খেয়ে ফেলে।

আবার হাত-পা কেটে গেলো, অথবা একটা কাঁটা বিঁধে গেলো। তার সাথে রোগের জীবাণু ঢুকে পড়লো শরীরে। ব্যাস্, আর কথা নেই। সেপাইদের সাজ সাজ পড়ে গেলো।

তারপরে শুরু হলো লড়াই। ভয়ংকর লড়াই। ক্ষত জায়গাটাকে ঘিরে ফেললো তারা, দলে দলে, পালে পালে। জীবাণুরা মরলো, শাদাকণারাও মরলো, অগুন্তি, অসংখ্য। মড়ায় মড়ায় পাহাড় জমে উঠলো। জায়গাটা পেকে উঠলো, তার পরে পুঁজ হয়ে মড়ার পাহাড় বেরিয়ে গেল।

মজা হচ্ছে, এরকম লড়াই যখন বাঁধে, তখন রক্তে

শাদাকণার সংখ্যা বহু বেড়ে যায়। যুদ্ধের সময় নতুন নতুন সৈন্য তৈরি করে যেমন যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠানো হয়, এও ঠিক তেমনি।

কাজেই বাঁচতে গেলে রক্তে লাল শাদা দুরকম কণাই থাকা চাই। এবং শরীর সুস্থ আছে কি না বুঝতে হলে দেখতে হবে শরীরের রক্তের মোট ওজন গোটা শরীরের ওজনের কুড়িভাগের একভাগ হলো কি না। না হলেই গোলমাল।

যদি কম হয়?

যদি কম হয়, তবে কি করা?

বহুকাল ধরে ডাক্তাররা এ নিয়ে ভেবেছেন, বহু কম পরীক্ষা করেছেন। অবশেষে একজনের রক্ত আর এক জনের গায়ে ঢুকিয়ে ঘাটতি পূরণ করবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এতে খুব তাড়াতাড়ি ফল পাওয়া যায়— এবং এভাবে বহু রোগীর প্রাণরক্ষাও হয়েছে।

কিন্তু মেশালেই হলো না। রক্তের আবার জাতি-ভেদ আছে। সব রক্ত একই রকম নয়।

রক্ত যে দেবে, আর রক্ত যে নেবে, তাদের রক্ত যদি একই জাতের না হয়, তবেই বিপদ। তখন রক্ত ঢোকোবার সাথে সাথে রোগীর রক্ত তালগোল পাকিয়ে যাবে। তার ফলে হৃদ্‌যন্ত্রের কাজ বন্ধ হয়ে যাবে, ধমনী দিয়ে রক্ত চলবে না। ফলে মুহূর্তের মধ্যে রোগীর মৃত্যু হবে।

কাজেই ঢোকাবার আগে দুজনের রক্তই পরীক্ষা করতে হয়—এক জাতের কিনা, দেখতে হয়।

অবশ্য একরকম রক্ত আছে যা সব রক্তের সাথেই মিশ খায়। তা যদি পাওয়া যায়, তবে তো কথাই নেই। বড়ো বড়ো হাসপাতালে আজকাল রক্তের ব্যাঙ্ক খোলা হয়েছে।

টাকার ব্যাঙ্কে যেমন টাকা জমা থাকে তেমনি রক্তের ব্যাঙ্কে রক্ত। দরকারমতো কাজে লাগিয়ে তা দিয়ে বহু প্রাণ রক্ষা হচ্ছে।

হেড অফিসের খবর—

এটা না জানলে আজব কলের কিছুই জানা হলো না।

হেডঅফিস মানে মাথা, আর তার ভেতর লুকিয়ে আছে দেহের মালিক, মগজ। একথা আগেই বলেছি।

মগজের ইংরেজী নাম হলো ব্রেণ। আমাদের শরীর ও মনের যতো কাজ, সবই করাচ্ছে ওই ব্রেণ। ব্রেণ না থাকলে আমাদের থাকা-না-থাকা সমান হতো। আমাদের হাত, পা, নাক, মুখ, চোখ এসব কোনো কাজেই আসতো না।

দেখছে কে? চোখ? না তো। চোখ তো দেখবার পথ মাত্র। দেখছে মগজ।

খাচ্ছে কে? মুখ? মোটেই না। খিদে পেয়েছে, এই কথাটা ব্রেণ বলে দিলো, আর হুকুম করলো

মুখের পেশীকে, তাই না মুখ খেলো। কাজেই ব্রেণ-ই সব।

ব্রেণ না থাকলে চালক-হীন গাড়ীর যে গতি হয়, আমাদেরও তাই হতো।

ব্রেণ হাসছে, ব্রেণ কাঁদছে, ব্রেণ গান শুনছে, ব্রেণ গান করছে। ভালোবাসছে ব্রেণ, ঘৃণা করছে ব্রেণ। হিংসা করছে ব্রেণ, ক্ষমাও করছে ব্রেণ। ভালোও করছে ব্রেণ, মন্দও করছে ব্রেণ। পাপ-পূণ্য সবই ব্রেণের কাজ।

মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়ে একটা ছ্যাঁদা ঘাড় থেকে মল-দ্বারের উপর পর্যন্ত সোজা নেমে গেছে। ওর ভেতর রয়েছে অসংখ্য নার্ভ, পাকানো সূতোর একগাছা দড়ির মতো। অগুন্তি সেল দিয়ে এটা তৈরি। এর ইংরাজী নাম স্পাইন্যাল কর্ড। আর বাংলা, সুষুম্না-কাণ্ড। বড়ো কড়া নাম।

এই স্পাইন্যাল কর্ড গিয়ে জুড়েছে ব্রেণের সাথে। ব্রেণের শেকড় যেন ওটা।

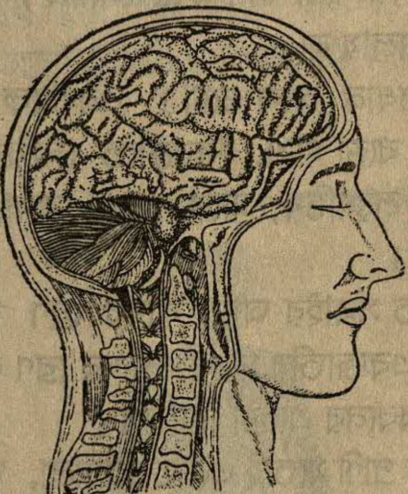
মাস্লিককে দেখা যায় না ?

যায় বৈকি।

তবে একটু মেহনত করতে হবে। খুলিটা খুলে ফেলতে হবে।

খুলে ফেললে দেখা যাবে, ভুরু আর কানের উপর দিয়ে ঘুরিয়ে লাইন টেনে নিলে উপর দিকটায় যতোটা জায়গা থাকে, ততোটা জায়গা জুড়ে রয়েছে ব্রেণ।

জিনিসটা নরম মতো, তার রং ধূসর। এটা দেখতে ঢেউ-খেলানো, উঁচু নীচু—আখরোটের খোল যেমন।



খুলিটা খুলে ফেলতে হবে

এই ঢেউগুলোর জন্যই আমাদের ব্রেণের যতো কেরামতি, এবং এদের জন্যই মানুষের এই শ্রেষ্ঠত্ব।

কারণ, পশু বা আরো নীচু প্রাণীদের ব্রেণ মানুষের ব্রেণের চাইতে অনেক ছোট, এবং একেবারে পালিশ, কোনো ঢেউ নেই।

কী আছে এই ঢেউগুলোর মধ্যে, যার জন্য মানুষের কেরামতি এতো ?

আছে একটা মহামূল্য জিনিস, তার ইংরেজি নাম গ্রে-ম্যাটার।

এটার জন্যই মানুষে পশুতে এতো তফাৎ।

অগুন্তি সেল দিয়ে তৈরি এই গ্রে-ম্যাটার। এখানেও

ওরা দল পাকিয়ে আছে। মানুষকে চালিয়ে নিতে গেলে যতোরকম কাজ দরকার, তা সব কিছু ঐ দল-গুলো নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিয়েছে। কারুর কাজে কেউ নাক গলায় না।

ব্রেণের প্রধান অংশ দুটো। একটাকে বলে গুরু-মস্তিষ্ক, মানে বড়ো মাথা, ইংরেজীতে সেরিব্রাম। আর একটা হলো লঘুমস্তিষ্ক, মানে ছোটো মাথা, ইংরেজিতে সেরিবেল্লাম।

পৃথিবীতে সবাইর আগে যাদের ব্রেণ গজিয়েছিলো, তারা হলো একজাতীয় মাছ। তাদের ব্রেণ বলতে ছিলো শুধু লম্বাটে ধরনের একটা জিনিস।

তারপরে প্রাণী যতোই এগুতে লাগলো, ততোই লম্বা ব্রেণ গোলমতো হতে লাগলো, আর ওর মধ্যে পরিষ্কার দুটো আলাদা ভাগ গড়ে উঠতে লাগলো।

তারপরে মানুষের মধ্যে এসে সমুখের তালটা, সেরিব্রাম যেটাকে বলি, হঠাৎ যেন সেটা মস্তবড়ো হয়ে উঠলো।

এখানেই হলো মানুষের জয়। কারণ, মানুষের 'মনুষ্যত্ব' বলতে যা বুঝি, সবই এই সেরিব্রাম অংশটার জন্য। মাথার সমুখ ও মধ্যভাগের সবটাই জুড়ে আছে এটা। আর ছোটো অংশ যেটা, ঐ সেরিবেল্লাম, সেটা আছে পেছনদিকে।

এর চাইতেও ছোটো, অথচ খু-ব দরকারি আর একটা অংশ আছে ব্রেণের। তার নাম মেডুলা। তার

জায়গা হলো পেছনদিকে, ঘাড় আর মাথা মিশেছে যেখানে, সেখানে সেরিবেল্লামের কাছে।

মেডুলা খুব বড়ো কাজ করে—হৃৎপিণ্ড ও ফুস্‌ফুস্‌ চালায়। কাজেই জীবনে ওর আর ছুটি নেই।

টেলিগ্রাফ অফিস—

মস্ত একটা টেলিগ্রাফ অফিস লুকিয়ে আছে আমাদের



টেলিগ্রাফ অফিস—তার ছড়িয়ে আছে সারা দেহে

শরীরের মধ্যে।

বল্‌লেই হলো ?

হলো ছাড়া কি ? আছে তাই বলছি। বানিয়ে বলতে যাবো কেন ?

ওই যে ব্রেণ, ওটাই হলো টেলিগ্রাফের কেন্দ্র।

আর টেলিগ্রাফের তার ?

সেগুলি ছড়িয়ে আছে সারা দেহে।

টেলিগ্রাফ অফিসে যেমন দুটো করে কল থাকে, একটা খবর ধরবার, আর একটা খবর পাঠাবার, এখানেও আছে তাই।

আবার ওখানে যেমন তার-বাবুটি বসে আছেন চুপ্‌টি করে, খবর বাছাই করছেন, তারপরে ঠিক ঠিক জবাব দিচ্ছেন, এখানেও তেমনি আছে। সে হলো ব্রেণ।

ওখানে যেমন খবরগুলো ছুটে চলে বিদ্যুতে, এখানেও প্রায় তাই, বিদ্যুতের মতো একটা শক্তির সহায্যে।

ব্যাপার হলো—

ব্রেণের সেলগুলোর সাথে আমাদের সারা দেহের যোগাযোগ রয়েছে।

এই যোগাযোগ রক্ষা করছে যারা, তারা হলো নার্ভ।

সুতোর মতো এরা, সরু আছে, আরো সরু আছে; মোটা, আরও মোটা আছে। আবার দড়ির মতোও আছে!

এরাই হলো আমাদের টেলিগ্রাফের তার। এদের বেশির ভাগই স্পাইন্যাল কর্ডের ভেতর দিয়ে ব্রেণে গিয়ে মিশেছে।

কাজেই আমাদের শরীরের প্রায় প্রতি অঙ্গের সাথে যোগ রয়েছে স্পাইন্যাল কর্ডের, আর তার ভেতর দিয়ে ব্রেণের।

কিন্তু কয়েকটি অঙ্গ আছে যাদের নার্ভের সাথে স্পাইন্যাল কর্ডের যোগ নেই।

তারা হলো, চোখ, নাক, কান, জিহ্বা ইত্যাদি। এরা রয়েছে স্পাইন্যাল কর্ডের ওপরে। তাই এদের যোগ সোজা ব্রেণের সঙ্গে।

নার্ভগুলো আবার হু'রকম।

একদলের কাজ, শরীরের খবর ব্রেণে পৌঁছে দেওয়া, আর একদলের কাজ ব্রেণ থেকে সেলেদের কাছে হুকুম বয়ে নেওয়া।

প্রথমগুলোকে বলে 'ঘর-মুখো' নার্ভ।

আর দ্বিতীয় গুলোকে বলে 'বাইর-মুখো' নার্ভ।

যেমন নাকের ডগায় মাছি বসলো। খবর চল্‌লো ব্রেণের কাছে।

কোথা দিয়ে? ওই ঘর-মুখোদের ভেতর দিয়ে।

খবর পেয়ে ব্রেন প্রথমে দেখলো ব্যাপারটা কী? তারপরে বেশ তলিয়ে দেখলো—এ অবস্থায় কী করা যায়। তারপরে, বাইর-মুখো নার্ভের ভেতর দিয়ে হুকুম পাঠালো—'মেরে ফেলো ওটাকে'। অমনি চটাস্ করে পড়লো চাটি নাকের ডগায়।

ওতে অবশ্য মাছিও মরতে পারে, আবার নাকও থেঁত্‌লে যেতে পারে।

তবে কতটুকু জোরে মারতে হবে, ব্রেণ তাও বলে দেয়। তা না হলে তো মহাকেলেঙ্কারী হতো!

কিন্তু এতো যে কাণ্ড হয়ে গেলো তাতে সময় লাগলো কতটুকু ?

ব্যাপারটা হয় কী, কোনো একটা জিনিস দেখলে, ছুঁলে বা কোনোভাবে তার কাছে এলে আমাদের নার্ভের মধ্যে একটা উত্তেজনা সৃষ্টি হয়—ওরা চঞ্চল হয়ে ওঠে। তার ফলে বিদ্যুতের মতো একটা শক্তির সৃষ্টি হয়। সেই শক্তি ঐ উত্তেজনাগুলোকে ঘর-মুখো নার্ভ দিয়ে ব্রেণে পাঠিয়ে দেয়। তখুনি আসল ব্যাপারটা সম্বন্ধে আমাদের চেতনা বা জ্ঞান জন্মে—কোন্‌টা কি ? দেখতে কেমন ? ছুঁতে কেমন ? খেতে কেমন ? এইসব ! আর তখুনি বাইর-মুখো নার্ভ দিয়ে যেখানকার ব্যাপার সেখানে হুকুম চলে যায়,—এই কর, তাই কর।

দৌড়ের পাল্লা—

এইভাবে আমাদের শরীরের মধ্যে প্রতিমুহূর্তে কতো যে খবর দেয়া-নেয়া হচ্ছে তার হিসেব করা যায় না।

তবে হ্যাঁ, এর হিসেব না পেলেও মানুষ আর একটা হিসেব পেয়েছে।

তা হলো, কি বেগে খবর ছোটে, তার হিসেব।

দেখা গেছে রক্ত যাদের যতো গরম, খবর-দৌড়ের পাল্লা তাদের ততো বেশি।

প্রাণী যতোই নীচু থেকে উঁচুতে উঠেছে, রক্ত ততোই গরম হয়েছে, আর খবর চলাচলের বেগ ততোই বেড়েছে।

ব্যাঙের রক্ত মানুষের চাইতে কম গরম। তাই তার দেহে এই দৌড়ের পাল্লা হলো সেকেণ্ডে দুই গজ।

আর মানুষের ? সেকেণ্ডে একশো ত্রিশ গজ, মানে ঘণ্টায় প্রায় দুশো সত্তর মাইল।

ভাগ্যিস্ এমনটা হয়েছিলো। তা না হলে মানুষকে আজ আর এতো বাহাদুরি করে বেড়াতে হতো না।

তার দেহে এতো দ্রুত খবর চলে বলেই মানুষ সবার সেরা। চট্ করে বুঝতে পারে, চট্ করে কাজ করতে পারে, কোন্ মুহূর্তে কি করতে হবে তা তখুনি ঠিক করে ফেলতে পারে। নইলে মানুষকে আর টিঁকতে হতো না। বিরাট বিশাল জন্তু-জানোয়ারগুলোর পাল্লায় পড়ে কবে যে হেজে-মজে যেতো! কারণ, জন্তু-জানোয়ারের দুনিয়ায় দেহের বলে এখনও মানুষ সর্ব-দুর্বল।

তার যদি ছেঁড়ে ?

কী আর হবে ? টেলিগ্রাফের তার ছিঁড়ে গেলে বা জখম হলে যা হয়, তাই হবে। খবর চলাচল বন্ধ হবে, অথবা খবর ঠিকমতো চলবে না।

যে অঙ্গের নার্ভ ছিঁড়ে যায় সেটা অবশ হয়ে অকেজো হয়ে যায়। তাকেই আমরা বলি 'লেগে-যাওয়া'। হাত লেগে-যাওয়া, পা লেগে-যাওয়া কতো লোক তো আমরা দেখতে পাই। ওসব হলো ওই তার ছেঁড়ার ব্যাপার।

পায়ে 'ঝিঁঝিঁ' লেগেছে। এও ঐ নার্ভের গোলমাল। এবারে ছেঁড়েনি, জখম হয়েছে। 'ঝিঁঝিঁ' ধরার ঐ যে ছুঁচ-ফোটানো যন্ত্রণা, ওটা হ'লো জখ্‌মি নার্ভের চিৎকার। বলছে—গেলুম, গেলুম—মলুম, মলুম—বাঁচাও, বাঁচাও !!

ছোটো মাথার কাজ—

সেই যে 'ছোটোমাথা,' সেরিবেল্লাম, আমাদের মাথার পেছন দিকে রয়েছে, তার কাজ কারবারটা এবার একটু দেখি না।

আমরা যে ঠিকমতো মাথা খাড়া করে চলতে পারছি, সাইকেল চালাতে পারছি, ঘোড়া ছুটোতে পারছি, টলে পড়ছি না, এসবই এই সেরিবেল্লামের জন্য।

সেরিবেল্লামের এই ক্ষমতাটাকে চেষ্টা করে ফুটিয়ে তুলতে হয়। তা না হলে মানুষ জন্মেই হাঁটতে পারতো, সাইকেল ধরেই ছুটতে পারতো। সেরিবেল্লামে চোট লাগলে, অথবা ওখানটায় অসুখ হলে মানুষ ঠিকমতো চলাফেরা করতে পারে না, মাতালের মতো টলতে থাকে।

কিভাবে সেরিবেল্লাম এই কাজটা চালায় ? কাকে দিয়ে চালায় ?

এই কাজে ওর কর্মী হলো চামড়া, চোখ, পেশী আর কানের মধ্যে বিশেষ একটা যন্ত্র। এসব অঙ্গগুলির যেকোনো একটা যদি জখম হয়, অসুস্থ হয়ে পড়ে, নষ্ট

হয়ে যায় তবেই বিপদ। চলাফেরা তখন বিষম দায় হয়ে পড়ে।

কিন্তু আসল ব্যাপার হলো কান। কানের মধ্যেই রয়েছে টাল সামলাবার আসল যন্ত্র। তিনটে খুব খুদে নল একত্রে জুড়ে আছে কানের মধ্যে। তার মধ্যে রয়েছে একটা তরল পদার্থ। নার্ভের তার দিয়ে সেরিবেল্লামের সাথে এর যোগ রয়েছে।

ঐ যে তরল পদার্থ, ও-ই হলো সব।

ওটায় একটু নাড়াচাড়া পড়লেই খবর ছুটে যায় সেরিবেল্লামের কাছে। আর তখুনি পেশীর উপর হুকুম চলে আসে, কোন্‌দিকে চলতে হবে, কোন্‌দিকে টাল সামলাতে হবে।

বিশ্বাস হয় না? চোখ বুজে পাঁইপাঁই করে কয়েক পাক ঘুরে সোজা হয়ে দাঁড়ানো যায়? সোজা হাঁটা যায়? ঘুরে পড়ে যাই না?

কেন অমন হয়?

পাক খাওয়ার ফলে কানের সেই তরল পদার্থে এলোমেলো ঢেউ জেগে ওঠে, তাই সে সেরিবেল্লামকে ঠিকমতো খবরটা দিতে পারে না। তাই সেরিবেল্লামও পেশী আর চোখকে ঠিক মতো বলে দিতে পারে না—এই অবস্থায় কি করতে হবে। তাই আমাদের অবস্থা হয় চালকহীন চলতি গাড়ির মতো!

দিনের বেলা আমরা যে হাঁটা-চলা করি, বা

সাইকেল চালাই, তাতে চোখের কাজ থাকে অনেকখানি।

কিন্তু রাত্রের অন্ধকারে? তখন কানই হলো একমাত্র ভরসা। প্রথমটায় অন্ধকারে চলতে বেশ বেগ পেতে হয়। তারপরে অবশ্য অভ্যাস হয়ে যায়। অর্থাৎ, সেরিবেল্লামের ঐ ক্ষমতাটা ধীরে ধীরে ফুটে ওঠে।

আমাদের শরীরের এমন কতগুলো ব্যাপার আছে, ব্রেণ যার খবর রাখে না। তাদের বলে প্রতিফলন-ক্রিয়া, ইংরাজিতে রিফ্লেক্স্ অ্যাক্সন্।

যেমন, ঘুমিয়ে আছি, মশা কামড়ালো। অমনি হাত চলে গেলো সেখানে। গরম লাগলো, ঘেমে উঠলাম; ঠাণ্ডা লাগতেই আবার গায়ে কাঁটা। আবার সাপ দেখেই দে-দৌড়। অথচ দেখি বাচ্ছাটা সাপ নিয়ে খেলছে, মোটেই ভয় পাচ্ছে না। এককণা বালি ঢুকলো চোখে, অমনি জল এসে ভাসিয়ে দিলে চোখ।

এরকম বহু ব্যাপার আছে। রিফ্লেক্স-এর ব্যাপার-গুলো ভারি মজার। অন্য সময়ে বলা যাবে।

আয়, ঘুম আয়—

ঘুম ছিলো তাই রক্ষে,—তাই বেঁচে আছি।

ঘুম হলো মাথার বিশ্রাম। ওই ওর খাদ্য। তাই ঘুম না হলে মানুষ পাগল হয়ে যায়, মরেও যায়।

দেখা গেছে, না খেয়ে মানুষ যতোদিন বাঁচে, না ঘুমিয়ে বাঁচে তার অনেক কম।

আমরা খাচ্ছি যা, তার থেকে কিছুটা কিছুটা শরীর সব সময় জমিয়ে রাখছে। বেশ কিছুদিন না খেয়েও ওই কাজেই জমানো পুঁজি দিয়ে চালিয়ে নেয়া যায়।

কিন্তু বাড়তি খাদ্য বলতে ব্রেণের কিছুই নেই। কাজেই তার বিশ্রাম চাই—ঘুম।

তাই না, ভালো ঘুম হলে শরীরটা বেশ তাজা লাগে ?

আর ঘুম না হলে ?

সে আর বলে কাজ নেই। মেজাজ তিরিক্ষি, কাজ-কর্মে মন নেই, হাঁফিয়ে-পড়া, ঝিমিয়ে পড়া, কেমন যেন কিরম একটা যাচ্ছেতাই ব্যাপার! অথচ পেটপুরে খাচ্ছি-দাচ্ছি বেশ।

ঘুম না হলে ব্রেণের সেলগুলো মুষড়ে পড়ে। তারপরে মরে যায়। তখন আমাদের প্রাণ নিয়ে টানাটানি পড়ে।

কাজেই—আয় ঘুম, আয়!

বড্ড ঘুম পাচ্ছে যে,

পাবে না ? কম ভেবেছি, আর কম বকেছি ? ঘুমের কি দোষ ? ব্রেণ হাঁপিয়ে পড়েছে, বিশ্রাম চাইছে, তাই তো ঘুম পাচ্ছে।

উঠি এবার—আচ্ছা ?

তবে হ্যাঁ, যাবার বেলা একটা কথা বলে যাই।

আজব-কল তো দেখলাম। চামড়া তুলে, হাড়-মাংস ঘেঁটে, খুলি ভেঙ্গে দেখলাম তো প্রায় সবটাই। তবুও

সব দেখা হলো না। আরও অ-নে-ক আছে। সময় কম, তাই সবটা দেখাতে পারলাম না।

কিন্তু যতটুকু দেখেছি, তাতেই বিস্ময়ের আর শেষ থাকেনা! কী অপূর্ব ব্যবস্থায়, কী অপূর্ব নিয়মে চলেছে আমাদের এই দেহ, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত। কে একে বানালো, কার হুকুমে এ চলছে, তা তো জানিনে। তবে এটুকু জানি—এমন একটি অপূর্ব দেহের মধ্যে আমি স্থান পেয়েছি, সেই আমার ক-তো ভাগ্য। যদি মানুষের না হয়ে পশুর দেহে স্থান পেতাম? যদি পৃথিবীতে মানুষ সৃষ্টি না-ই হতো? তবে পৃথিবীকে এমন সুন্দর করে গড়ে তুলত কে? এতো আবিষ্কার করতো কে? এতো সুর, এতো গান, এতো ছন্দ, এতো রং ছড়িয়ে দিতো কে? তুমি সুন্দর—আমি ধন্য!!—এ কথা অমন করে বলতে পারতো কে?

আমি মানুষ, সে আমার কতো, ক-তো ভাগ্য!

———

প্রাণ-এর কথা

পৃথিবীতে প্রাণ কি করে এলো, তা আজ-ও কেউ বলতে পারেনি।

যে মানুষ বুদ্ধির বলে আজ এতো অঘটন ঘটিয়ে তুলেছে, আকাশের বুক চিরে কতো খবর যোগাড় করছে, টেনে-টুনে পৃথিবীর পেটের সব কথা বার করে আনছে, কতো অদ্ভুত যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করছে, প্রাণ বাঁচানোর কতো অস্তুদ আবিষ্কার করছে, সেই মানুষ আজ-ও বলতে পাচ্ছে না প্রাণ কি করে এলো! বলতে পারা দূরের কথা, প্রাণ যে কি বস্তু, কোথা হতে আসে, আবার কোথায় চলে যায়, তা আজ-ও সে বুঝে উঠ্‌তে পারেনি।

সুখ, দুঃখ, হাসি, কান্না, আনন্দ, ভালবাসা, ঘৃণা, ক্ষমা, আহার, নিদ্রা, বংশবিস্তার, এই নিয়ে পৃথিবীর বুকে প্রাণের খেলা চলেছে অবিরত।

এরি মাঝে হঠাৎ কী ঘটে গেল! যে হাসছিল, সে আর হাসছে না, যে কথা কইছিল, সে আর কথা কইছে না, যে নড়ছিল, সে আর নড়ছে না, তার শ্বাসটুকু পর্যন্ত নেই, চোখের দৃষ্টি স্থির হয়ে গেছে, শরীরের তাপটুকু পর্যন্ত নেই। অথচ গোটা মানুষটাই তো এখনও রয়েছে চোখের সামনে।

সে থেকেও নেই, এ কেমন? সবই আছে, অথচ কিছুই নেই! দেহ থেকে প্রাণ বেরিয়ে গেছে, তাই

নাকি এমন। যা পড়ে আছে, তাই শুধু দেখছি, আর যা চলে গেল, তা দেখতে পেলাম না।

মানুষের বুদ্ধি বারে বারে এইখানে এসে ফিরে গিয়েছে, কোন কিনারাই করতে পারেনি। প্রাণ কি, কি করে তার সৃষ্টি, কোথা থেকে আসে, আর কোথায়-ই বা যায় এ প্রশ্নের মীমাংসা আজ-ও হল না। প্রাণ চিরদিনের মতো রহস্যের অন্ধকারে ঢাকা রয়ে গেল।

কোথা থেকে প্রাণ এলো, তা আমরা জানি না বটে, কিন্তু সবাইর আগে কোথায় প্রাণ দেখা দিয়েছিল, তা আমরা জেনেছি।

দেখা দিয়েছিল জলে।

সেদিন পৃথিবীর অবস্থা ছিল অতি ভয়ংকর। সে কথা পরে বলছি।

সেই ভয়ংকর পৃথিবীর বুকে কী করে যে প্রাণের প্রথম বিন্দুটি টিঁকে ছিল তা ভাবতেও অবাক লাগে। শুধু কি টেঁকা? সে বংশ-বৃদ্ধি শুরু করল। এক বহু হয়ে চল্‌ল।

সেই যে শুরু হল, আজ-ও তা থামেনি। স্রোতের মতো বয়ে চলেছে একটানা। আর, তাই না আজ পৃথিবীর বুকে এতো গাছগাছালি, এতো পাখ-পাখালি, এতো পোকামাকড়, এতো পশু, এতো মানুষ, প্রাণের এতো লীলাখেলা। আর তাই না পৃথিবী আজ এতো সুন্দর।

কি করে, কি ভাবে, ধীরে ধীরে প্রাণের বিকাশ ঘটেছিল পৃথিবীতে, কি করে প্রাণ এগিয়ে চলেছে সুন্দর হতে আরো সুন্দরের দিকে, সেই কথাই বলছি এখন।

দুই

প্রথম প্রাণ

জন্মসময়ে পৃথিবীর যে চেহারা ছিল তাতে এ কথা ভাবাই যায়নি যে সেখানে কোনো প্রাণের সৃষ্টি হতে পারে, সেই পৃথিবী এমন রূপ-রস-গন্ধে ভরা এমন সুন্দর পৃথিবী হয়ে দাঁড়াতে পারে।

কিন্তু এমন অনেক ব্যাপার আছে যা কোন বিশ্বাস-অবিশ্বাসের ধার ধারে না। অমনিতেই ঘটে যায়, আর তখন আমরা মাথা চুল্‌কে বলি—'তাই তো!' তারপরে কেন হল, কি করে হল, সেই কারণগুলি খুঁজে বেড়াই! এখানেও ঘটল তাই।

ঘুরপাক-খাওয়া জ্বলন্ত সূর্যের গা থেকে ছোট্ট একটা টুকরো তো একদিন গেল ছুটে। ছুটে গিয়েও সে কিন্তু বেশী দূরে পালাতে পারল না। সূর্যের টানে তাকে থমকে দাঁড়াতে হল। তারপরে সূর্যের টান থেকে বাঁচতে গিয়ে শুরু হল তার ডিগবাজী খাওয়া আর সূর্যের চারদিকে ঘোরা।

এই ছোট টুকরোটাই হল আমাদের পৃথিবী।

তার ঘুরে-মরা আজও সমানে চলেছে। কোনদিন যে থামবে তা মনে হয় না।

সেদিনকার সেই পৃথিবী ছিল সূর্যের মতই আগুনে, দাউ-দাউ করে জ্বলছে, আর বোঁ-বোঁ করে ঘুরছে।

বহু, বহু বছর কেটে গেল। জ্বলন্ত পৃথিবী দিনের পর দিন ঠাণ্ডা হতে লাগল। তখন ধীরে ধীরে ওর গায়ে একটা সর পড়তে লাগল, দুধের সরের মতো। কিন্তু ভেতর তার তখনও বেজায় গরম আর পাতলা।

সেই সময় চারদিক ছিল ভীষণ অন্ধকার, আর আকাশে ছিল ঘন-কালো মেঘ। সেই ঘন মেঘের পর্দা চিরে সূর্যের আলো পৃথিবীতে পৌঁছতে পারত না।

তারপরে একদিন নামল বৃষ্টি! কিন্তু সেই বৃষ্টির জল পৃথিবীতে পৌঁছবার আগেই পৃথিবীর তাপে বাষ্প হয়ে উপরে উঠে যেত।

কেটে গেল আরও বহু, বহু বছর।

এতদিনে পৃথিবীর সরটা অনেকটা পুরু হয়ে উঠেছে, আর তাপও অনেকটা কমেছে।

তখন বৃষ্টির জল পৃথিবীর গায়ে দাঁড়াতে লাগল। বছরের পর বছর তখন চলেছিল—শুধু একটানা বৃষ্টি। গোটা পৃথিবী জলে থৈ-থৈ করে উঠল। এর ফলে পৃথিবী তাড়াতাড়ি জুড়োতে লাগল। কিন্তু খানিক নীচে তখনও আগুনের তোলপাড়।

সেই তোলপাড় মাঝে মাঝে পিঠের সরটাকে ঝেড়ে-ঝুড়ে ঠেলে-ঠুলে বেরুতে চাইত। যেখানটায় সরটা একটু কম পুরু, সেখান দিয়েই ঠেলে বেরুত আগুন। এতে পৃথিবীর কোনো জায়গা বসে যেতে লাগল, আবার কোনো কোনো জায়গা ঠেলে উঁচু হয়ে উঠতে লাগল।

এমনি ধারা ভাঙ্গা-গড়ার পালা চলেছিল বহু, বহুকাল। এমনি করেই যত সমুদ্র, পাহাড় আর ডাঙ্গার সৃষ্টি হল।

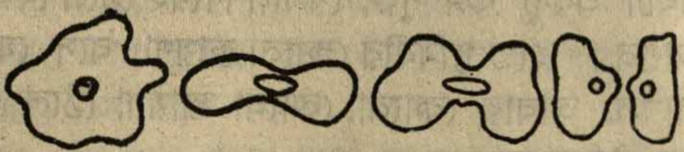
তখনও কিন্তু সুর্যের আলো মেঘ চিরে পৃথিবীতে পৌঁছতে পারেনি এতোই ঘন মেঘ।

বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন যে এমনি একদিনে পৃথিবীতে প্রথম প্রাণের জন্ম হয়েছিল।

সেই প্রাণ বেঁচে থাকত আমাদের মতো সুর্যের আলোর তাপে নয়, নীচ থেকে পৃথিবীর গরমে।

ঘন-লালার মতো এই প্রথম প্রাণ জলে ভেসে বেড়াত। এদের চেহারার কিছুই ঠিক ছিল না। এক-এক সময় এক-এক রকম হতো। কিন্তু একটা ব্যাপার ঠিক ছিল। তা হল, ওদের দেহের ঠিক মাঝখানটায় ফুটকি-মতো একটিমাত্র বিন্দু। ওটাই ছিল ওদের প্রাণ-কেন্দ্র। মাঝে মাঝে দেহের ঠিক মাঝখান দিয়ে সরু হতে হতে ওরা দুই ভাগে ভাগ হয়ে যেত, আর মাঝের সেই বিন্দুটা-ও খানিকটা এদিক, খানিকা ওদিক কেটে যেত। অর্থাৎ দেহটা

ভাগ হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে প্রাণ-বিন্দুটাও ভাগ হয়ে যেত।



এই ভাবেই চল্‌ত তাদের বংশবিস্তার

এইভাবেই চল্‌ত তাদের বংশবিস্তার।

এদের বিষয়ে এর বেশী খবর যোগাড় করা যায়নি। কারণ, গায়ে হাড়-গোড় ছিল না বলে পৃথিবীর বুকে এরা কোন চিহ্নই রেখে যেতে পারে নি।

তারপরে একদিন এক আশ্চর্য ব্যাপার ঘটে গেল! আকাশের মেঘগুলি হালকা হয়ে উঠল, আর ফাঁক দিয়ে চিরে বেরুল সুর্যের আলো।

পৃথিবীতে প্রথম সুর্যের আলো পড়ল। এক পলকে সব পাল্‌টে গেল। আলোয় আলোয় চার-দিক ঝল্‌মল্ করে উঠল। আরম্ভ হল রাত্রি-দিন, আরম্ভ হল ঋতুর খেলা, হেসে উঠল চাঁদ, ঝক্‌মক্ করে উঠ্‌ল তারায়-ভরা রাতের আকাশ। আর পৃথিবীতে প্রাণ-বিকাশের ইতিহাস লেখা শুরু হল এখান থেকেই।

কি করে সেই ইতিহাস লেখা সম্ভব হলো?

ইতিহাস তো আর গাল-গপ্পো নয়, যে যা-খুশি-তাই বলে যাবে! ইতিহাসের প্রতিটি কথা খাঁটি হওয়া

চাই। কাজেই ইতিহাস লিখতে গেলে দলিল-পত্র চাই, প্রমাণ চাই।

প্রমাণ ছাড়া ইতিহাস লেখা যায় না। কিন্তু সেই অনাদি-অতীতের প্রাণীদের ইতিহাস, তারা দেখতে কেমন ছিল, কোথায় জন্মেছিল, স্বভাব কেমন ছিল, কার পরে কে এলো, এইসব খবর মানুষ পাবে কি করে? কোথাই বা তার দলিল, কোথাই বা তার প্রমাণ? তবু-ও তো মানুষ সেই ইতিহাস প্রায় লিখে তুলেছে। কি করে, তাই বলছি।

আজ পৃথিবীর যে চেহারা, লক্ষ লক্ষ বছর আগে তেমনটি ছিল না, এ আমরা আগেই দেখেছি।

আবার লক্ষ বছর পরে পৃথিবীর চেহারা আজকের মতো থাকবে না, এটাও ঠিক।

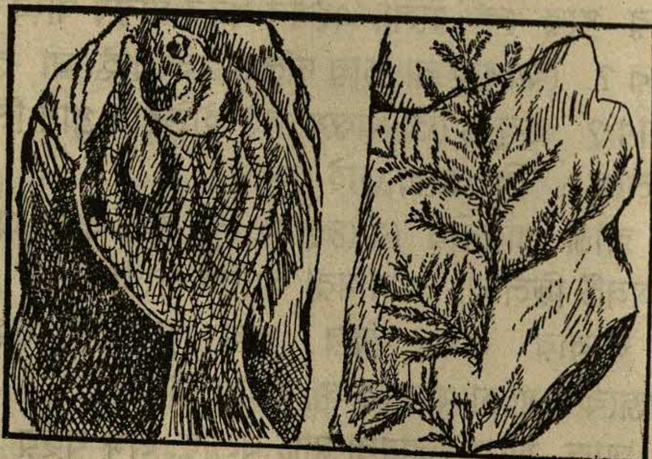
আজ যাকে আমরা মাটি বলছি, লক্ষ বছর পরে হয়তো তা পাথর বনে যাবে।

আবার আজ যেখানে পাহাড়, তখন হয়তো সেখানে থৈ থৈ করবে একটা সমুদ্র। আবার আজকে যেটা সমুদ্র, সে দিন হয়তো তার জল শুকিয়ে যাবে, আর সেখান দিয়ে ফুঁড়ে বেরুবে একটা মস্ত পাহাড়।

এখন, এই মাটির মধ্যে যে সব হাড়গোড়, গাছ-পালা, আর সমুদ্রের জলে যে সব জীব, যাদের হাড়-গোড় পচা সম্ভব নয়, ওই সাথে জমে, কেউবা কঠিন পাথরের রূপ পাবে,—কেউবা পচে শেষ হয়ে যাওয়ার আগে মাটির বুকে ছাঁচের মতো ছাপ রেখে যাবে।

তারপরে, লক্ষ বছর পরে যদি কেউ জানতে চায়, লক্ষ বছর আগে পৃথিবীর প্রণীরা দেখতে কেমন ছিল, তবে ওখান থেকেই তার জবাব মিলবে।

স্নুতরাং পৃথিবীর পাহাড়-পর্বতগুলোকে আমরা একখানা বই বলতে পারি।



কেউবা ছাঁচের মতো ছাপ রেখে যাবে

জীবন-বিকাশের ইতিহাসে এই বই-ই হল আমাদের দলিল, এই হল আমাদের প্রমাণ।

যাদুঘরে গেলেই এই সব দলিলপত্র দেখা যায়। কতো বড় বড় ভীষণ চেহারা-ওলা জন্তু-জানোয়ারের হাড়গোড় সব সেখানে সাজানো আছে। তারা এতো প্রাচীনকালে জন্মেছিল যে তাদের খোঁজ আমরা কিছুতেই পেতাম না, যদি প্রকৃতির নিয়মে তাদের হাড়গোড়গুলি পাথর বনে না যেত।

শুধু কী জন্তু-জানোয়ার ?

কতো রকমের পোকা-মাকড়, কতো রকম গাছের পাতা সেখানে দেখা যাবে। ঠিক যেমনটি ছিল, তেমনটি পাথর বনে আছে!

এরাই হলো আমাদের পাথরের বইএর এক-একখানা ছেঁড়া পাতা। ইংরাজীতে এদের ফসিল (Fossil) বলে। বাংলায় বলতে পারি জীবশিলা। নামটা মনে রাখা ভাল। পরে কাজে লাগবে।

এমনি-ধারা এখানে-ওখানে খুঁজে-পাওয়া টুক্‌রো পাতা কুড়িয়ে-বাড়িয়ে বিজ্ঞানীরা পৃথিবীতে জীবন বিকাশের একটা ইতিহাস লিখে চলেছেন। সে লেখা আজও শেষ হয় নি। নতুন নতুন ফসিল রোজই পাওয়া যাচ্ছে। তাই সেই বইতে কাটাকুটি চলছে অবিরত।

কিন্তু এ পর্যন্ত যেটুকু লেখা হয়েছে, তাতে দেখা যাবে কী করে পৃথিবীর বুকে অতি নগণ্য একটি ক্ষুদ্র প্রাণ ধাপে ধাপে উঠতে উঠতে শেষ অবধি মানুষ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তিন

যাত্রা হল শুরু

ধাপে ধাপে প্রাণ এগিয়ে চল্‌ল,—ধাপে ধাপে আমরা যেমন সিঁড়ি বেয়ে উঠি। প্রাণের যাত্রা হল শুরু।

প্রথম ধাপে যারা উঠেছিল, তাদের খবর আমরা

জেনেছি। দেহে হাড় ছিল না বলে পৃথিবীতে তারা কোন চিহ্ন রেখে যেতে পারে নি।

এর পরের ধাপের যারা, তারা এলো পৃথিবীতে সুর্যের আলো পড়বার পরে। পাহাড়ের গায়ে, পাথরে বা শক্ত মাটিতে আমরা এদের খোঁজ পাই। সুর্যের আলো, আর পৃথিবীর জল, এই ছিল এদের সম্বল। গুগ্‌লি গোছের ছোট ছোট পোকা, কাঁকড়া, আর একরকম শেওলা,—এরাই ছিল তখনকার শ্রেষ্ঠ প্রাণী। তাদের দেহের শক্ত খোলগুলিই মাটির বুকে সাক্ষী রেখে গেছে। এরাও কিন্তু জল ছেড়ে উপরে উঠতে পারতনা।

তৃতীয় ধাপে এলে দেখা যায় যে আগের ধাপের প্রাণীদের অনেক উন্নতি হয়েছে। চেহারা হয়েছে অনেক বড়, আর দেহের খোল-ও হয়েছে অনেক শক্ত ও পুরু।

প্রকাণ্ড বড় বড় কাঁকড়া, ইয়া ইয়া গুগ্‌লি আর আট-দশ হাত লম্বা মাছ আর বিছা। সেই দুনিয়ায় তারাই ছিল সবচেয়ে বড় প্রাণী।

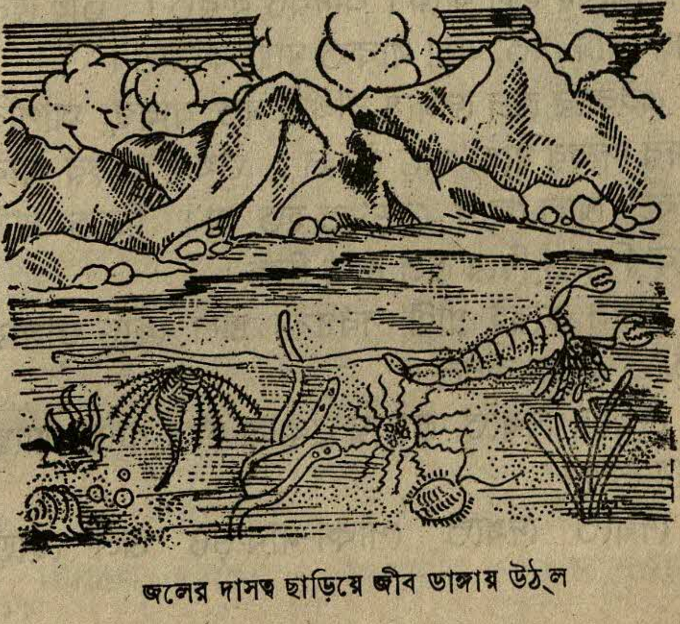
হাজার হাজার বছর কেটে গেল, জলের মধ্যে আরও অনেক প্রাণী দেখা দিল। কিন্তু মজা হল, জল ছেড়ে এরা কেউ ডাঙ্গায় উঠতে পারত না। আর যদি কখনও বা উঠে পড়ত, অমনি দম আটকে মরে যেত। আজও এমন অনেক জলের প্রাণী দেখা যায়, যাদের ডাঙ্গায় তুল্‌লেই মরে যায়।

আমরাও কি জল ছাড়া বাঁচতে পারি? গাছপালা পশুপাখী-ও কি পারে? তবে তফাৎ এই যে, মাঝে



জলের মধ্যে আরও অনেক প্রাণী দেখা দিল

মাঝে জল খেলেই আমরা দিব্যি বেঁচে থাকি, তাদের মতো রাতদিন জলে ডুবে থাকতে হয় না!



জলের দাসত্ব ছাড়িয়ে জীব ডাঙায় উঠ্‌ল

এই যে জলের দাসত্ব ছাড়িয়ে জীব ডাঙ্গায় উঠ্‌ল, এটাই হল জীবন-বিকাশ ইতিহাসের সবচাইতে বড় কথা। এটা যদি না ঘটত তবে পৃথিবীতে প্রাণী বলতে যাদের দেখছি তারা কেউ-ই থাকত না। এই পরিবর্তনটা যে কি করে ঘটল, তা বলা কঠিন, তবে মনে হয়, এটা এমনি হয় নি, হয়েছে দায়ে পড়ে। তাই বলছি—

চতুর্থ ধাপে—এ ধাপে প্রথম যারা উঠ্‌ল, তারা হল একরকম কচুরীপানা।

সমুদ্রের জল ওঠা-নামা করত, সেই সাথে এরাও ওঠা-নামা করত। ভাটার টানে জল যখন নেমে যেত, এরা ডাঙ্গায় আটকে শুকিয়ে মরত।

এমনি করে কিন্তু বেশী দিন গেল না। বাঁচতে তো সবারই ইচ্ছা করে! এদেরও করত। তাই জল যখন নেমে যেত, এরা থাকত মাটি কামড়ে।

এইকরে জল জমিয়ে রাখার মত ব্যবস্থা আপনি এদের দেহের মধ্যে গড়ে উঠ্‌ল। তখন এদের আর কেবল জলে ভেসে বেড়াতে হত না। ভিজে মাটি থেকে শিকড় দিয়ে জল শুষে নিত।

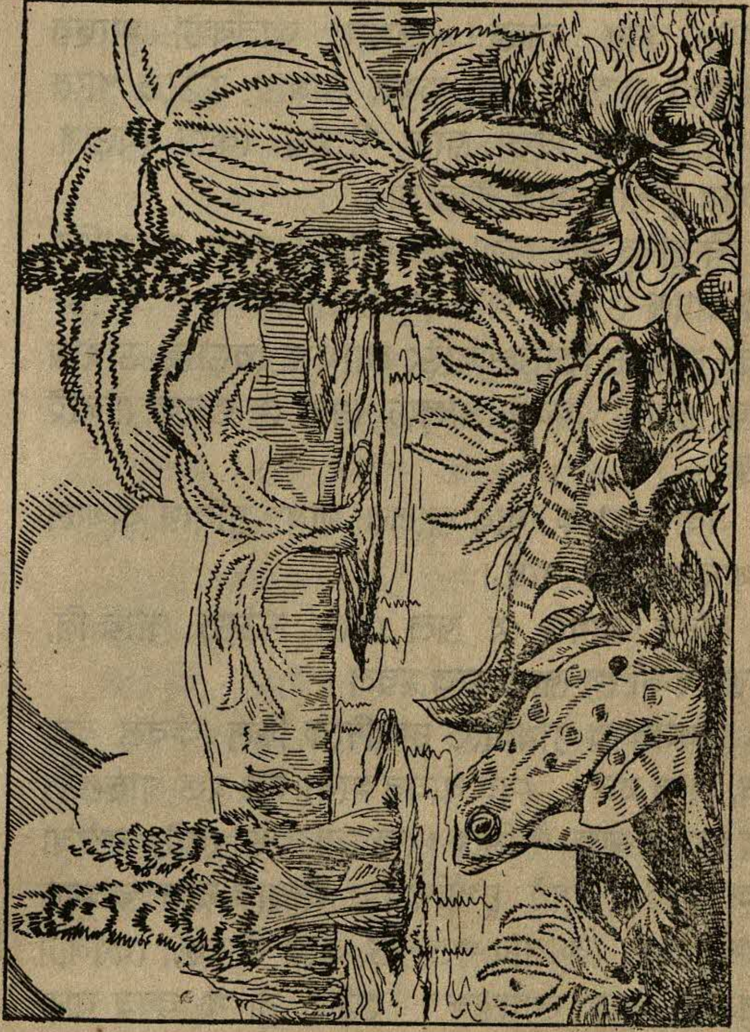
এমনি করেই প্রাণী সর্বপ্রথম জল ছেড়ে ডাঙ্গায় উঠ্‌তে আরম্ভ করল।

দেখতে দেখতে জলের কোল ঘেঁষে গাছে গাছে ছেয়ে গেল।

দেখতে দেখতে পোকা-মাকড়ও জল ছেড়ে

ডাঙ্গা-মুখো হলো। তাদের দেহের মধ্যে শ্বাস-প্রশ্বাসের যন্ত্র গড়ে উঠল।

তখন জলের চাইতে বাতাসের উপর তারা বেশী নির্ভর করতে লাগল।



জলের কোল ছুঁয়ে গাছে গাছে ছেয়ে গেল

ব্যাঙের জীবনে এ ব্যাপারটা বেশ ভালভাবে

দেখা যায়। ব্যাঙ ডিম পাড়ে জলে, ডাঙ্গায় ডিম শুকিয়ে যায় বলে।

ঘন-লালার মতো একটা পদার্থের মধ্যে ডিমগুলো লুকোনো থাকে।

কিছুদিন বাদে ডিম ফুটে বাচ্চা বেরয়, সবাইর একটা করে ল্যাজ। দেখতে অনেকটা মাছের বাচ্চাদের মতো। ওরা তখন ডাঙ্গায় উঠতে পারে না। মাছের মতো জলে সাঁতার কেটে বেড়ায়, ডাঙ্গায় তুল্‌লে আর বাঁচে না।

কিছুদিন বদে দেখা যায় ব্যাঙের বাচ্চা ব্যাঙাচির সেই ল্যাজ-ও নেই, আর সে জলে-ও নেই। ল্যাজ-কাটা ব্যাঙাচি তিড়িং-বিড়িং লাফিয়ে বেড়াচ্ছে ডাঙ্গায় আর চেহারা এমনই পাল্‌টে গেছে যে তাকে চেনাই দায়।

এবার তাকে ধরে জলের মধ্যে চুবিয়ে রাখলে দেখবে সে মরে গেছে।

দুদিন আগেও যে জল ছেড়ে উঠতে পারে নি, আজ কিনা সে জলে ডুবে মরল!

তখনকার পৃথিবীতে চারদিকে ছিল কেবল বন, বন, আর বন। সেই বনের মধ্যে মস্ত মস্ত গাছগুলি সব ভূতের মতো দাঁড়িয়ে। কোনো সাড়া নেই, কোনো শব্দ নেই। সেই চুপনিঃসার আঁধার বনে রাক্ষুসে পোকাগুলি, কোনটা পত্‌পত্‌ করে উড়ছে, কোনটা থপ্‌-থপ্‌ করে লাফাচ্ছে। হঠাৎ সাঁ সাঁ করে ঝড়

ছুটে এলো। ভূতুরে গাছগুলি ভয়ে কেঁপে কেঁপে উঠল। তারপর মড়মড় করে ভেঙ্গেচুরে পড়ল, সমুদ্রের জল ফুঁসে ফেঁপে দারুণ গর্জনে ডাঙ্গার গায়ে মাথা খুঁড়তে লাগল, যেন ডাঙ্গাকে আর আস্ত রাখবে না, খান্ খান্ করে ভেঙ্গে গিলে নেবে!

পঞ্চম ধাপ—প্রাণী তো জল ছেড়ে ডাঙ্গায় উঠ্ল। কিন্তু ভরসা করে তখনও বেশীদূর এগুতে পারে নি, থাকত জলের কোল ঘেঁষে। কোনো রকম বে-কায়দা দেখলেই জলের মধ্যে ঝাঁপ দিত।

এ যেন হাঁটি-হাঁটি—পা-পা—শিশুর দু'পা হেঁটেই মায়ের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়া।

এ সময়টা কিন্তু বেশীদিন থাকে না, শিশুরও না, আর যাদের কথা বলছি, তাদেরও না। মাথা খাড়া করে শিশু যেমন ক্রমেই এগিয়ে চলে, তখনকার প্রাণীরাও তেমনি এগিয়ে চল্ল।—

একটা নতুন যুগ দেখা দিল।

সরীসৃপ যুগ—

সরীসৃপ তাদের-ই বলে যারা জলেও থাকে ডাঙ্গায়-ও থাকে। কিন্তু জলের চাইতে ডাঙ্গার দিকেই টান বেশী।

আগেকার প্রাণীদের মতো এরাও ডিম পাড়ে,—তবে জলে নয়, ডাঙ্গায়।

এই ডিমের ব্যাপারেই একটা মস্ত বড় তফাৎ দেখা দিল এই যুগে,—এদের ডিমের খোলসটা হল

বেশ শক্ত। তাই মাছ বা ব্যাঙের ডিমের মতো এদের ডিমগুলির ডাঙ্গায় শুকিয়ে মরবার ভয় থাকল না। এক কথায়, এই সরীসৃপ জাতটা তখনকার পৃথিবীতে সর্বশ্রেষ্ঠ জীব হয়ে দাঁড়াল।

জল ছেড়ে ডাঙ্গায় বেঁচে থাকতে হত বলে, এদের দেহের যন্ত্রপাতিও ধীরে ধীরে সেই ভাবে গড়ে উঠল।

তারপরে যতোই দিন যেতে লাগল, ততোই তারা উঁচু ডাঙ্গার দিকে উঠতে লাগল।

সাপ, গো-সাপ, টিকটিকি, গিরগিটি, কুমীর, এরা সবই ঐ সরীসৃপ জাতের।

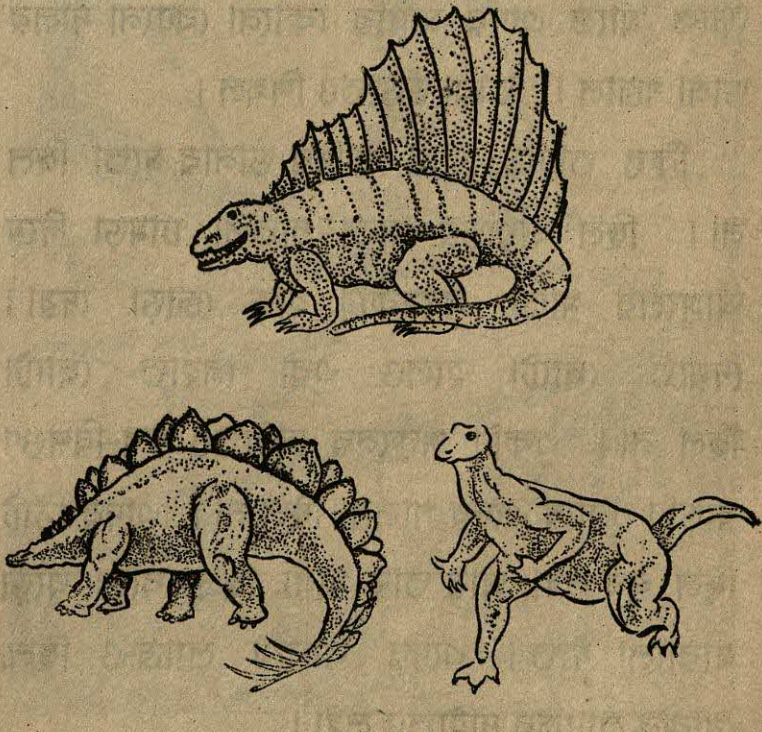
তবে ওদের এখনকার জাত-ভাইদের দেখে তখনকার তাদের চেহারা আন্দাজ করতে গেলে বিষম ঠকতে হবে কিন্তু!

বিরাট ছিল তাদের দেহ, একশো-দেড়শো ফুট, বা তার-ও বেশী। তাদের মাথা ছিল খুব ছোট। কারণ, মগজ যাদের এতটুকু, তাদের বড় মাথা দরকার কী? পেট ছিল তাদের খুব বড়ো কারণ, একমাত্র কাজ যাদের কেবল খাওয়া আর খাওয়া, তাদের বড়-পেট দরকার বৈকি! আর ল্যাজ ছিল যেমনি লম্বা, ঠ্যাং ছিল তেমনি ছোটো। কিন্তু এই ল্যাজ আর ঠ্যাং-এ জোর ছিল দারুণ।

কতগুলো আবার ল্যাজ আর পেছনের ঠ্যাং-এ ভর করে সোজা হয়ে দাঁড়াত।

তারা এটা শিখেছিল কিন্তু দায়ে পড়ে। কারণ,

রাত-দিন তো কেবল খাই, খাই আর খাই। কিন্তু এত খাবার পাবে কোথায়? কাছে-পিঠে যা ছিল, সবই তো খেয়ে ফর্সা। হঠাৎ চোখে পড়ল, যা খেতে চাইছে, তা রয়েছে সেই উঁচু গাছের মগডালে। চল্‌ল চেষ্টা, অবশেষে দাঁড়াতে শিখে গেল। আর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঐ উঁচু গাছের মগডালের কচিপাতা দিব্যি চিবিয়ে খেতে লাগল।



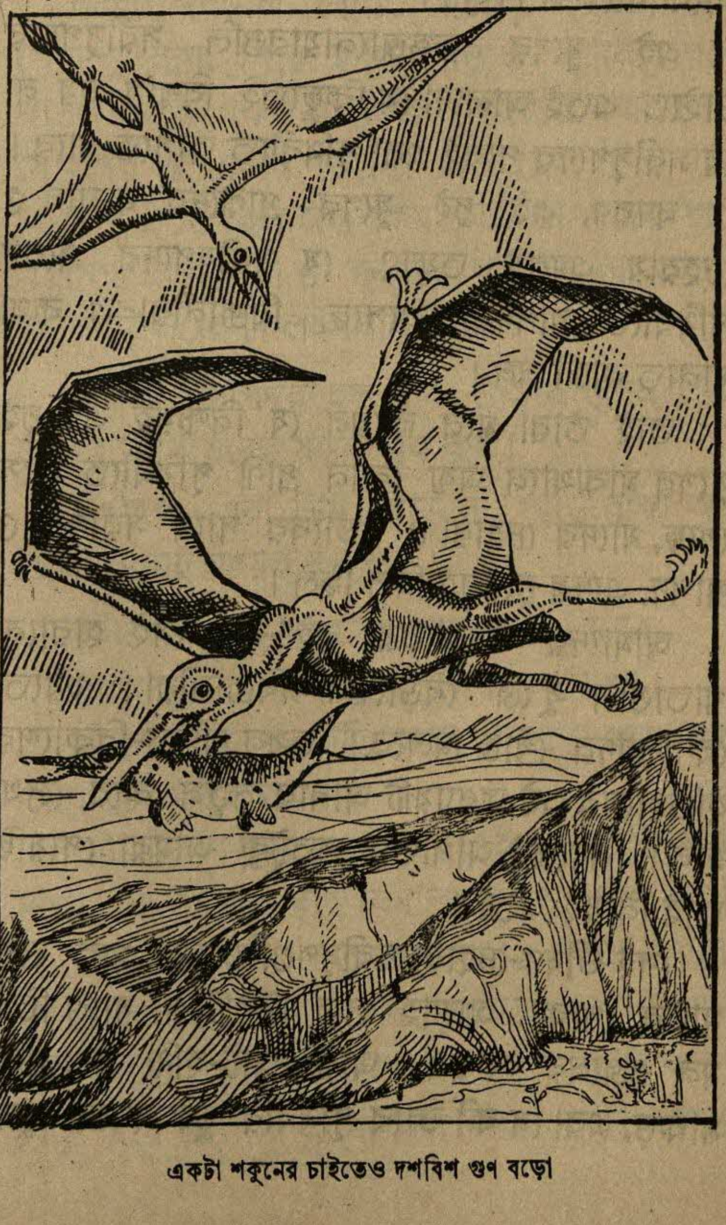
বিরাট ছিল তাদের দেহ

আর একটা দল, তারা ছিল খানিকটা নীচু জাতের। অর্থাৎ তারা এদের মতো এতটা এগুতে পারে নি, না চেহারায়, না স্বভাবে। তারা এদের মতো দাঁড়িয়ে গাছের ডাল নাগাল পেত না।

তাই তারা চেষ্টা শুরু করল গাছে উঠবার। শিখেও গেল। তারা এ-গাছ থেকে ও-গাছে লাফিয়ে বেড়াত, আজকালকার কাঠবিড়ালীর মতো। এই লাফালাফির ভেতর দিয়েই উড়বার চেষ্টা চল্‌ল। আস্তে আস্তে এদের মধ্যের কোনো কোনো দলের ডানা গজাল। তারা উড়তেও শিখল।

কিন্তু তাদের ডানা পাখির ডানার মতো ছিল না। ছিল বাদুড়ের মতো পাতলা চামড়া দিয়ে আঙুলের মতো কয়েকটা হাড় জোড়া দেয়া। দেখতে ছোটো হলেও এরা নেহাত ছোটো ছিল না। একটা শকুনের চাইতেও দশ-বিশগুণ বড়ো। গায়ে এদের পালক ছিল না। এদের ঠোঁট ছিল খুব লম্বা, আর তার মধ্যে ছিল বড়ো বড়ো ধারালো দাঁত। এদের আবার ল্যাজ-ও ছিল, গোরুর ল্যাজের চাইতেও লম্বা।

এরই একটা দল শেষ পর্যন্ত পাখি হয়ে দাঁড়ালো।



একটা শকুনের চাইতেও দশবিশ গুণ বড়ো

ষষ্ঠ ধাপ—শ্বাপদ যুগ

এরপরে পৃথিবীতে একটা নতুন যুগ দেখা দিল, যাকে বলে শ্বাপদ যুগ।

এই যুগের জন্তুজানোয়ারগুলি সরীসৃপদের চাইতে এতই আলাদা যে কিছুতেই বিশ্বাস হয় না যে সরীসৃপদের পরেই এরা পৃথিবীতে আসতে পারে।

কারণ, এই দুই যুগের প্রাণীদের স্বভাবে ও চেহারায় এমনই তফাৎ, যে সরীসৃপদের পরেই পৃথিবীতে শ্বাপদরা এসেছে, বিজ্ঞানীরা এ কথা মানতে রাজী নন।

তাই তাঁরা মনে করেন যে নিশ্চয়ই এই দুই যুগের মাঝখানে অন্য কোন প্রাণী পৃথিবীতে এসে গেছে, যাদের চেহারা ও স্বভাবের সাথে সরীসৃপ ও শ্বাপদ, এদের দুয়েরই মিল ছিল।

আমাদের "পাথরের বই"-এর সেই হারানো পাতাগুলি খুঁজে বেড়াচ্ছেন বিজ্ঞানীরা। হয়তো কোনোদিন খোঁজ মিলবে। তখন জীবন-বিকাশের ইতিহাসের এই অধ্যায়টি আবার নতুন করে লেখা হবে। কাজেই আপাতত যতটুকু আমরা পেয়েছি তাই নিয়েই এগুই।

সেই ভীষণ-চেহারা সরীসৃপগুলি, চার হাত লম্বা মাটির পোকা, আড়াই হাত টিকটিকি, সাড়ে তিন মন ওজনের কচ্ছপ, আর আট-ইঞ্চি ঠ্যাং-ওলা মাকড়, এরা যে কী ভাবে পৃথিবীর বুক থেকে ধুয়ে

মুছে শেষ হয়ে গেল, বংশে বাতি দিতেও কাউকে রেখে গেল না, তা ভেবে আশ্চর্য হতে হয়।

কুকুর, বেড়াল, গোরু, ছাগল, ঘোড়া, মোষ শেয়াল, বাঘ, সিংহ হাতি প্রভৃতি জানোয়ারকে শ্বাপদ বলে। কিন্তু যে যুগের শ্বাপদদের কথা বলছি সে যুগের শ্বাপদদের চেহারা ছিল ঢের, ঢের বড়ো, আর দেখতেও ছিল অন্যরকম। এই শ্বাপদদের সাথে সরীসৃপদের চেহারা ও স্বভাবে কতোই না তফাৎ, তা একটু নজর দিলেই বোঝা যায়।

প্রথমতঃ—শ্বাপদরা হল পাকা ডাঙ্গার জানোয়ার। জলের সাথে এদের সম্পর্ক খুব কম।

দ্বিতীয়তঃ—এরা ডিম পাড়ে না, পাড়ে বাচ্চা আর তারা জন্মেই মায়ের দুধ খায়।

তৃতীয়তঃ—এরা জন্মালো গায়ে লোম নিয়ে।

প্রাণীদেহে এই কিন্তু প্রথম লোম দেখা দিল।

জীবন-বিকাশের ইতিহাসে এটা বড়ো বড়ো করে লিখে রাখবার মতো কথা।

এটা যদি না ঘটত, তবে এরাও হয়তো সরীসৃপদের মতো একদিন ধুয়ে মুছে বেমালুম লোপ পেয়ে যেত।

কারণ, পৃথিবীর মেজাজ তখনও ঠাণ্ডা হয়নি। হঠাৎ কখনও ভীষণ গরম, আবার কখনও এমন দারুণ শীত পড়ত যাতে কম্বলের মতো মোটা একটা কিছু গায়ে জড়ানো না থাকলে বেঁচে থাকা অসম্ভব

হতো। সরীসৃপদের গায়ে লোম ছিল না। তাই তারা এই হঠাৎ-গরম ও হঠাৎ-ঠাণ্ডা সইতে পারেনি, তাই মরে শেষ হয়ে গেল।

আর শ্বাপদদের গায়ের লোম, তাদের ঢেকে-ঢুকে কম্বলের মত জড়িয়ে রাখল। শীত আর গরম বেশী কায়দা করতে পারল না। তারা বেঁচে গেল।

তারপরে শ্বাপদরা তাদের স্বভাবে আর একটা নতুন জিনিস নিয়ে এসেছিল,—যা তখনকার পৃথিবীতে একেবারেই নতুন, একেবারেই হঠাৎ,—বাৎসল্য।

বাৎসল্য মানে, সন্তানের উপর স্নেহ-ভালোবাসা। টিক্‌টিকি তার বাচ্ছার দিকে ফিরেও চায় না, সাপ, গো-সাপ, কুমীর কেউ না।

কিন্তু গোরু তার বাছুরের জন্য কেমন করে! কুকুরের কোল থেকে ছানা কেড়ে নিলে সে কেমন কেঁদে কেঁদে মরে। বেড়াল তার ছানা মুখে নিয়ে কেমন লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়ায়।

এ-থেকে এই বোঝা যায়, ছেলেপুলে নিয়ে সংসার গুছিয়ে বসবার ইচ্ছা উঁকি-ঝুঁকি দিচ্ছে জীবজগতে। যদিও এই ইচ্ছাটা বেশী দিন টেঁকে না, বাচ্ছা বড় হলে কেউ আর কারুর কথা ভাবে না, এবং কেউ কাউকে চেনে-ও না, তবু জীবন-বিকাশের ইতিহাসে এটা একটা মস্তবড়ো কথা।

এর থেকে এই বোঝা যায় যে জীবজগতে বুদ্ধির বিকাশ শুরু হয়েছে।

কী করে এই বুদ্ধি প্রাণীর মনে কোথা থেকে এসে বাসা বাঁধল, সে গোপন রহস্য আজও আমরা জানতে পারি নি।

তবে এইটুকু বুঝেছি যে, প্রাণের সাথে মন আর বুদ্ধি যদি হাত না মেলাতো তবে শুধু দেহকে সম্বল করে প্রাণ সেই ভয়ংকর পৃথিবীর বুকে বেশী দিন টিঁকে থাকতে পারতো না।

শুধু পৃথিবীর অবস্থা যে ভয়ংকর ছিল তাই নয়, প্রতিমহূর্তে তখনকার প্রাণীকে কতোরকম বিপদের মুখোমুখি হতে হতো।

অসংখ্য শত্রু ছিল তার চারদিকে ঘিরে। যে যাকে পারছে মারছে। যে যাকে পাচ্ছে খেয়ে ফেলছে।

এই অবস্থায় বুদ্ধি এসে প্রাণকে বলে দিল কী করে আত্মরক্ষা করতে হবে, কী করে বিপদ এলে বাঁচতে হবে, কী করে সংসার গুছিয়ে বসে সন্তানদের বাঁচিয়ে রাখতে হবে।

সুতরাং প্রাণীর মনে বুদ্ধির উদয়, জীবন-বিকাশের ইতিহাসের আর একটা মস্তবড়ো কথা। আর বুদ্ধি যদি দেখা না দিত, তবে পৃথিবীতে মানুষ সৃষ্টি কখনো সম্ভব হতো না।

চার

মানুষ

পৃথিবীতে প্রথম মানুষ এসেছিল মাত্র তিন লক্ষ বছর আগে। মাত্র তিন লক্ষ ? মাত্র বৈকি ! পৃথিবীর বয়স তো এখন হলো প্রায় দুশো কোটি বছর, আর প্রথম প্রাণ এসেছিলো প্রায় পঞ্চাশ কোটি বছর আগে। কাজেই 'মাত্র' বলব বৈকি ! এতো কেবল সেদিনের কথা !

সরীসৃপ-যুগ আর শ্বাপদ-যুগের মাঝখানটায় যেমন একটা ফাঁক দেখা যায়, তেমনি শ্বাপদ-যুগ আর মানব-যুগের মধ্যেও একটা ফাঁক আছে বলে অনেক পণ্ডিত মনে করেন।

তাঁদের ধারণা জন্তু-জানোয়ার থেকে মানুষ একটানা বেরিয়ে আসতে পারে না। নিশ্চয়ই এই দুই যুগের মধ্যে এমন কোন প্রাণী এসে গেছে, যারা ঠিক জানোয়ারও নয়, ঠিক মানুষও নয়। তাই তাঁরা লেগেছেন 'পাথরের বই'-এর সেই হারানো পাতার খোঁজে।

ওদিকে ডারউইন নামে মস্তবড়ো এক পণ্ডিত বলেছেন, মানুষ এসেছে বানর থেকে। অর্থাৎ বানরই উন্নত হতে হতে মানুষ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ নিয়ে তর্ক চলেছে অনেক। তবে বানরের চেহারা, স্বভাব, হালচাল যে অনেকটা মানুষের মতো, এ কথা

তো অস্বীকার করা যায় না। তাতো আমরা চোখেই দেখতে পাই। অবশ্য তাদের সব কিছুই যে মানুষের মতো নয় তাও ঠিক—মিলও আছে যেমন, গরমিলও রয়েছে অনেক।

সব দিক বিচার করলে দেখা যায়, যে বানরই হোক, আর যাই হোক, শ্বাপদ-যুগের পরেই মানব-যুগ আসাতে কোন বাধা নেই। শ্বাপদ-ই উন্নত হতে হতে মানুষ হয়ে দাঁড়িয়েছে। মানুষকে বলা যায় শ্রেষ্ঠ-শ্বাপদ।



মস্ত বড়ো পণ্ডিত—ডারউইন

বুদ্ধি-বিকাশ ও বাৎসল্য, যে দুটি অতি সামান্য ভাবে দেখা দিয়েছিল শ্বাপদদের মনে, তাই পরিপূর্ণ ভাবে ফুটে উঠেছে মানুষের মধ্যে।

মানুষ এসেছে বানর থেকে, ডারউইন যখন একথা বল্‌লেন, সারা পৃথিবীতে হৈ-চৈ পড়ে গেল। কী সাংঘাতিক কথা! কোথায় বানর, আর কোথায় মানুষ! পাগল না খ্যাপা। চরম অপমান জুটেছিল সেদিন ডারউইনের কপালে।

এর কারণ আছে। যেমন চলেছে, তেমনি চলুক,—বেশ আছি। সাধারণ মানুষের এই হলো মনের কথা। নতুন কিছু শুনলে বা দেখলেই মানুষ আঁত্‌কে ওঠে, ভয় পায়, তার মধ্যে অকল্যাণ আর বিপদের সংকেত দেখতে পায়। আর তাই না সেই নতুনকে স্বীকার করতে চায় না, টুঁটি টিপে মারতে চায় তাকে।

মানুষের এতোকাল বিশ্বাস ছিল যে ভগবানের খাস-কারখানায় সে তৈরী, আর সেখান থেকেই সোজা তাকে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে।

এই নিয়ে মানুষ সন্তুষ্ট ছিল, আর এই নিয়ে গর্বও ছিল তার।

তাই যখন সে শুন্‌ল মানুষ বানরের ঘরের লোক, তখন তার রাগের সীমা রইল না। চরম অপমান করে ডারউইনের মুখ বন্ধ করতে চাইল। মানুষের জাত মারতে চায়, এতো বড়ো কথা!

এমনি ঘটনা পৃথিবীতে এই প্রথম নয়। আরও ঘটেছে এর আগে।



মিলও আছে যেমন, গরমিলও রয়েছে অনেক

এককালে মানুষ জানতো পৃথিবী এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে, আর সূর্য তার চারদিকে ঘুরছে।

এই বিশ্বাস নিয়ে মানুষ বেশ সুখেই ছিল।

কিন্তু হঠাৎ একদিন গ্যালিলিও নামে একজন পণ্ডিত কাঁচ ঘষে ঘষে একটা যন্ত্র বানিয়ে ফেল্‌লেন, যা দিয়ে বহুদূরের জিনিস খুব কাছে দেখা যায়। আজকের দিনে যাকে আমরা দূরবীন বলি, এ হলো সেই যন্ত্র।



গ্যালিলিও

তাই চোখে লাগিয়ে তিনি তাকালেন আকাশের দিকে। বহু পরীক্ষা, বহু পরিশ্রম করে তিনি বল্‌লেন—ভুল, সব ভুল। সূর্য নয়, ঘোরে পৃথিবী। সূর্য শুধু এক জায়গায় দাঁড়িয়ে পাক খাচ্ছে।

আর যায় কোথা? রাজার দরবারে তাঁর বিচার হলো এবং তাকে জেলে পাঠানো হলো।

ওদিকে ব্রুণো নামে একজন মহাপণ্ডিত ছিলেন সেই দেশে। তিনি দেখলেন গ্যালিলিও যা বলেছেন, তার সবটুকুই সত্যি। অথচ মিথ্যা যারা আঁকড়ে আছে, তারাই তাঁকে জেলে পাঠালো? অসহ্য বোধ হল তাঁর কাছে।

তিনি বল্‌লেন, গ্যালিলিও সত্য বলেছেন, আর রাজা অন্যায় করেছেন, দেশের লোক অবিচার করেছে।

ব্যাস্! ব্রুণোকে ধরে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারা হলো।

কিন্তু এতো করেও সত্যকে চেপে রাখা গেল না।

কারণ, তা যায়নি, যায় না। একদিন সত্য মাথা তুলে দাঁড়াবেই দাঁড়াবে।

তাই ডারউইনের কথামতো বহু বিজ্ঞানী লেগে গেলেন মানুষের পূর্বপুরুষদের খোঁজে।

সে কী কম কথা? প্রথমত মাটির তলায় ছাড়া তো তাদের খুঁজে পাওয়া যাবে না। তারপরে, কোন্ দেশের কোন্ মাটির তলায় কোথায়, তারা ঘুমিয়ে আছে, তাও বা কে জানে?

তৃতীয়ত, সেই পূর্বপুরুষেরা সংখ্যায় ছিল খুব কম, তায়, হাজারটা মৃত-দেহের মধ্যে মাত্র দু-একটা ফসিল হয়ে দাঁড়ায়। সেই ফসিল খুঁজে পাওয়া বা যায় কোথায়? আর সেকি সোজা কথা!

কাজেই নানা রকম সমস্যা দেখা দিল।

কিন্তু মানুষ দমবার নয়। এগিয়ে চল্‌ল তার চেষ্টা।

সেই চেষ্টার ফলে আজ পর্যন্ত বহু ফসিল পাওয়া গেছে পৃথিবীর নানা দেশে নানা অবস্থায়।

আরও কতো বেরুবে কে জানে ?

কিন্তু এতো যা পাওয়া গেল, তাতে মানুষের একখানা পুরো ইতিহাস লেখা আজও সম্ভব হলো না।

যা পাওয়া গেল, তা যেন বই-এর কতগুলি ছেঁড়া পাতা, এলোমেলো ছড়িয়ে আছে। কোন্‌টা আগে, কোন্‌টা পরে, কে বা মধ্যে, তাই নিয়ে লেগেছে মহা ভাবনা। জোড়াতালি দিয়ে হয়তো দাঁড়াল একরকম। পরেই যে খবর পাওয়া গেল, তাতে সব ভেস্তে গেল।

হয়তো পাওয়া গেল একখানা চোয়ালের ফসিল। তারপরে আর এক জায়গায় দুটো দাঁত। আর বহু দূরে মাথার একটা খুলি। এখন, চোয়াল যার, দাঁত তার কিনা, আবার চোয়াল ও দাঁত যার খুলির মালিক সে কিনা, তাও তো দেখতে হবে ?

কাজেই, এ কাজ খুব সোজা নয়। এতে যেমন লাগে বিদ্যা-বুদ্ধি, তেমন দরকার পরিশ্রম আর ধৈর্য।

এখন, বিজ্ঞানীরা লেগেছেন দু'রকম কাজে।

প্রথম হলো, যা পাওয়া গেছে, তাকে সাজিয়ে-গুছিয়ে তোলা। তারপরে নতুন নতুন ফসিল খুঁজে গরমিল পূরণ করা।

এই ভাবে চলেছে তাঁদের কাজ।

এই পরীক্ষার ফলে আজ পর্যন্ত যতটুকু জানা গেছে, তাতে ডারউইন যা বলে গেছেন, তা যে ঠিক, তা প্রায় প্রমাণ হয়েছে। অর্থাৎ পৃথিবীতে মানুষ হঠাৎ আসে নি, এসেছে বানর থেকে।

আগেই বলেছি যে পৃথিবীর নানা জায়গায় নানা রকম ফসিল পাওয়া গেছে।

যা পাওয়া গেছে, তা থেকে এই বোঝা যায় যে তখনকার পৃথিবীর নানা জায়গায় আমাদের এই পূর্বপুরুষরা ছড়িয়ে ছিল। সব জায়গার জলবায়ুর অবস্থা তো এক নয়। তখনও ছিল না, এখনও নেই। এই জলবায়ুর জন্যই এক-এক দেশের প্রাণীদের চেহারা এক-এক রকম হয়ে ওঠে।

কাজেই নানান দেশে পাওয়া ফসিলগুলির মধ্যে নানান রকম দেহের গড়ন-চিহ্ন পাওয়া গেছে।

তবুও বিজ্ঞানীরা এর ভেতর থেকে সময়-অনুসারে এইসব মানুষদের শ্রেণী ভাগ করে ফেলেছেন। এবং কারা কখন পৃথিবীতে এসেছিল, কতোকাল ছিল, যে দেশে তারা জন্মেছিল, সে দেশের তখনকার চেহারা, জলবায়ু প্রভৃতি কেমন ছিল, এইসবও জেনে ফেলেছেন।

সেই কথাই বলছি।

মানুষের সর্বপ্রথম পূর্বপুরুষ যারা, তারা বানরও ছিল না, মানুষও ছিল না। তারা ছিল বনমানুষ আর মানুষের মাঝামাঝি একরকম জীব।

উরোপে জার্মানী বলে একটা দেশ আছে। সেই দেশের হিডেল্‌বুর্গ নামে একটা জায়গায় ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে একদিন একটা খনি খুঁড়বার সময়ে চোয়ালের একখানা ফসিল পাওয়া যায়।

তাই নিয়ে অনেক বিচার-বিবেচনা করে বিজ্ঞানীরা ঠিক করলেন, এই চোয়ালের যে মালিক তার চেহারা ছিল বনমানুষ আর মানুষের মাঝামাঝি আর এরাই হল মানুষের আদি-পিতা।

বিজ্ঞানীরা এদের নাম দিয়েছেন হিডেল্‌বুর্গ মানুষ।

বুঝবার সুবিধার জন্য আমরা এদের বলব আধ-মানুষ।

এরা সংখ্যায় খুবই কম ছিল। তার উপর তখনকার ভীষণ-চেহারা জন্তু-জানোয়ারদের সাথে এরা পেরে উঠত না। তাই তাদের ভয়ে সবসময়ে লুকিয়ে বেড়াত। কাজেই এদের ফসিল পাওয়া গেছে খুব কম। তবুও সামান্য যে দু'একখানা


আধ-মানুষ

পাওয়া গেছে তাই দিয়ে বিজ্ঞানীরা এদের চেহারা ও স্বভাব খানিকটা অনুমান করেছেন।

এরা দেখতে ছিল মস্তো বড়ো বানরের মতো। কিন্তু বানরদের মতো ল্যাজ ছিল না, এই যা। এরা গাছে উঠতে পারত না।

এদের গায়ে ছিল বড়ো বড়ো লোম, আর মুখের মধ্যে ছিল মূলোর মতো দাঁত।

এদের কপাল ছিল খুব ছোটো, পেছন দিকে চাপা, আর মুখের নীচের দিকটা ছিল ঝুলোনো। আর থুত্‌নি ছিল না একদম।

এরা কিন্তু আমাদের মতোই দু'পায়ে হেঁটে বেড়াত। তবে ঘাড় তুলে মুখ সোজা করে চলতে পারত না।

কারণ, ওদের ঘাড় ছিল খুব খাটো আর মোটা।

এরা কথা বলতে পারত না। জঙ্গলের যে সব জায়গায় ভীষণ-চেহারা-ওলা শ্বাপদরা থাকত, তার ধারও এরা মাড়াত না।

কারণ, এরাই ছিল সেই দুনিয়ার সবচাইতে দুর্বল প্রাণী।

কতোকাল এরা পৃথিবীতে ছিল বলা যায় না। তবে খুব বেশীদিন যে এরা টিঁকে থাকতে পারেনি, তা জানা গেছে।

একদিন এরাও পৃথিবী থেকে লুপ্ত হয়ে গেল।

যাবে ছাড়া কী?

তখনকার পৃথিবীর অবস্থা তো ছিল অতি ভয়ংকর! শুধু বরফ, বরফ আর বরফ! সেই বরফ-ঢাকা পৃথিবীর দারুণ শীতের মধ্যে বেচারাদের বেঁচে থাকতে হতো। তার উপরে—চারদিকে শত্রু।

কাজেই বেশী দিন টিঁকে থাকা তাদের সম্ভব হলো না।

হাজার হাজার বছর কেটে গেল।

পৃথিবীতে একদল নতুন মানুষ দেখা দিল। বিজ্ঞানীরা এদের নাম দিয়েছেন 'নিয়ানডারথাল্ ম্যান্'।

নিয়ানডারথাল্ মানুষ বলতে কিন্তু কোন একটা বিশেষ জাতের মানুষ বোঝায় না। জার্মানীর নিয়ানডারথাল্ নামে একটা জায়গায় এদের ফসিল পাওয়া গিয়েছিল বলেই এই নাম। যেমন হিডেলবুর্গ মানুষ।


প্রায়-মানুষ

আমরা বলব এদের 'প্রায়-মানুষ'।

এদের ফসিল পরীক্ষা করে বিজ্ঞানীরা বুঝতে পেরেছেন যে আধ-মানুষের পরেই এরা পৃথিবীতে এসেছিল।

দেখতে-শুনতে এরা আধ-মানুষদের চাইতে

থানিকটা ভাল হলেও, আমাদের চাইতে ছিল ঢের কুচ্ছিত।

এদের গায়েও বড়ো লোম ছিল। এদের কপাল ও থুত্নি আধ-মানুষদের চাইতে একটু উঁচু হলেও, আমাদের তুলনায় ছিল ঢের থ্যাবড়া।

এরা কথা বলতে পারত কিনা জানা যায়নি, তবে বুদ্ধিতে এরা ঢের এগিয়ে গিয়েছিল।

এরা মরা লোকদের মাটির নীচে পুঁতে রাখত, আমরা যেমন আজকাল কবর দেই। জন্তু-জানোয়ারদের ভয়ে এরা লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়াত না। পাথর ঘষে অস্ত্র বানিয়ে তাই দিয়ে লড়াই করত তাদের সাথে।

এরাই প্রথম আগুন জ্বালাতে শিখল। পাথরে পাথর ঠুক্তে ঠুক্তে হঠাৎ একদিন আগুনের ফুল্কি দেখা দিল। ব্যাপারটা কি বুঝল না বটে, তবে বুঝল যে ফুল্কিগুলো গরম, তার আলো আছে, তাপ আছে, আর কাছে ধরলে শুক্নো জিনিস জ্বলে ওঠে।

তাই দেখে এরা ভাবল এ জিনিসটা কাজে লাগতে পারে। তাই শুক্নো পাতা-টাতা জড়ো করে তাতে আগুন ধরাল, আর দিনের পর দিন সেই আগুন জিইয়ে রাখল গুহার মধ্যে।

এই করে তারা আর একটা মজার ব্যাপার আবিষ্কার করে ফেল্ল। দেখল, জন্তু-জানোয়ারগুলো

আর গুহার কাছে এসে হামলা করছে না। তারা ভয় পেয়ে দূরে সরে যাচ্ছে।

যে সব জন্তু-জানোয়ার এরা শিকার করত, তাদের চামড়া শুকিয়ে কাপড়ের কাজ চালাত।

এর থেকে বোঝা যায় যে এদের লজ্জা-বোধ জেগেছে।

আগুন আবিষ্কার করলেও এরা রান্না করতে জানত না। খেত সব কাঁচা।

তারপরে, এরা ঘর-সংসার গুছিয়ে বসতে শুরু করল।

সংসারে থাকত একজন পুরুষ আর জনকয়েক মেয়েছেলে। আর থাকত ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা।

ঘরে পুরুষই ছিল কর্তা। তার দাপটে সবাই স্থির। যাকে খুশি সে মারত, যাকে খুশি তাড়িয়ে দিত, আর যাকে খুশি রাখত।

আবার ছেলে যখন বড়ো হয়ে উঠত, হয় সে আলাদা হয়ে যেত, নয় তো বুড়ো বাপকে মেরে-ধোরে তাড়িয়ে দিয়ে নিজেই সংসারের কর্তা হয়ে বসত।

কাজেই দেখা যাচ্ছে, যে বাৎসল্য অতি সামান্য ভাবে শ্বাপদের মধ্যে উঁকি-ঝুঁকি দিচ্ছিল তাই অনেকটা উন্নত ভাবে দেখা দিয়েছে এদের মধ্যে।

কিন্তু সমাজ বেঁধে বাস করবার পক্ষে এও যথেষ্ট নয়। এমনি মারামারি হানাহানি করে তো বেশী দিন চলে না।

চল্‌লও না। ক্রমেই এরা সংখ্যায় কমতে লাগল। কমতে কমতে একদিন পৃথিবী থেকে লোপ পেয়ে গেল।

প্রায় লক্ষাধিক বৎসর এরা পৃথিবীতে টিঁকে ছিল। এরাই প্রথম পাথরের ব্যবহার শুরু করল বলে এই সময়টাকে 'প্রস্তর যুগ' বলা হয়। প্রস্তর মানে পাথর।

এরপরে যারা এলো, আমরা তাদের বলব 'আদি-মানুষ'। বিজ্ঞানীরা বলেন 'প্যালিওলিথিক্ ম্যান্'। নামটা একটু কড়া গোছের। কিন্তু তাতে আমাদের কিছু এসে যাবে না, কেবল একটু চেষ্টা করে মনে রাখলেই হলো।



আদি-মানুষ

এরাও এর আগের দলের মতো প্রস্তর-যুগের মানুষ।

আধ-মানুষ আর প্রায়-মানুষদের চেহারাতে যে বানর-ভাব, আর বুদ্ধিতে যে মোটা ভাবটা ছিল, তা এরা একদম কাটিয়ে উঠল, এবং তাদের ছাড়িয়ে অনেকদূর এগিয়ে গেল। আজকালকার মানুষ আমরা, এই আদি-মানুষদের থেকে সোজা উঠে এসেছি।

কাজেই এরা যে সময় পৃথিবীতে বাস করত তাকে আমরা আজকের দিনের সভ্যতার ছোটবেলা বলতে পারি।

এদের আর আমাদের চেহারা একরকম না হলেও, আমাদের সাথে এদের মিল অনেক।

এদের কপাল ও থুতনী অনেকটা উঁচু হয়ে উঠেছিল, আর ঘাড়ও গড়ে উঠেছিল অনেকটা সরু ও লম্বা হয়ে। এরা মাথায় ছিল প্রায়-মানুষদের চাইতে ঢের উঁচু, আর মুখের ঢং-এ গোল-ভাবটা কেটে আমাদের মতো অনেকটা লম্বাটে-ভাব এসে গিয়েছিল।



পাথর দিয়ে খুব সুন্দর অস্ত্র বানাতে পারত

এরা পাথর দিয়ে খুব সুন্দর অস্ত্র বানাতে পারত। বড়ো বড়ো জানোয়ারদের সাথে লড়াই করে এরা তাদের মেরে ফেলত। আধ-মানুষ বা প্রায় মানুষদের মতো জানোয়ারদের আর ভয় করত না।

এদের আরও অনেক গুণ ছিল। এরা খুব সুন্দর ছবি আঁকতে আর মূর্তি খোদাই করতে পারত।

কোথায় যে এসব তারা শিখেছিল কে জানে ?

গুহার গায়ে আঁকা ছবি, আর হরিণের শিং ও

পাথর খোদাই-করা মূর্তি, যা এরা রেখে গেছে, তা দেখলে সত্যিই অবাক হতে হয়।

ছুঁচের ব্যবহারও এরা জানত এবং হাড়ের ছুঁচ দিয়ে কাপড়-চোপড় শেলাই করত।

তবে এও ঠিক যে, অনেক-কিছুই ওরা তখনও শিখে উঠতে পারে নি। তার মধ্যে সবচেয়ে বড়ো হলো বাড়ী ঘর তৈরী, বাসন-কোসনের ব্যবহার। রান্না-বান্নাও ওরা জানত না। কাজেই আমাদের তুলনায় ওরা অনেক অসভ্য ছিল।

এই মানুষের দল পঁচিশ-হাজার বছর পৃথিবীতে বাস করে গিয়েছে।

কিন্তু একদিন কোথা থেকে আর একদল নতুন মানুষ এসে জুটল এবং এদের হটিয়ে দিল।

ফলে হলো, এই নতুন মানুষদের ভয়ে এরা গভীর বনে ঢুকে পড়ল।

তারপরে হয়ত একটি একটি করে শ্বাপদদের পেটের মধ্যেই চলে গেল।

এই নতুন মানুষদের আমরা 'খাঁটি মানুষ' বলব। ওঁরা বলেন 'নিওলিথিক্ ম্যান্'।

এদের আগমনের সাথে সাথে পৃথিবীতে একটা নতুন যুগ শুরু হলো। তাকে বলে 'নতুন প্রস্তর যুগ'।

এটা ঘটেছিল আজ থেকে প্রায় বারো হাজার বছর আগে। লাখ লাখ বছরের হিসাব পেরিয়ে ক্রমেই আমরা হাজারের কোঠায় এসে পৌঁছচ্ছি। আমাদের হারিয়ে-যাওয়া পূর্ব-পুরুষরা ক্রমেই আমাদের কাছের মানুষ হয়ে উঠছে।



খাঁটি-মানুষ

এরা যখন পৃথিবীতে এসেছিল, পৃথিবীর চেহারা তখন অনেক পাল্‌টে গেছে। সেই বরফ-ঢাকা ঠাণ্ডা পৃথিবী আর নেই।

সূর্যের তাপে বরফ গলতে শুরু করেছে, এবং পৃথিবী অনেক গরম হয়ে উঠেছে।

এতে মস্ত সুবিধা হলো এদের।

আগের মানুষেরা এই বরফ আর ঠাণ্ডার জন্যই বেশী চলা-ফেরা করতে পারেনি। কাজেই তারা দূর-দূরান্তরে ছড়িয়ে পড়তে পারেনি।

এই অসুবিধাটা কেটে গেল এই যুগে।

মানুষ এমনিতেই এক জায়গায় বসে থাকতে চায় না। তাই যেই বরফ কাটল আর শীত কমল, অমনি এই নতুন মানুষেরা নানা দিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। নতুন নতুন জায়গায় গিয়ে নতুন অবস্থার সাথে বোঝা-পড়া করে তারা বাঁচবার চেষ্টা করতে লাগল। কিছু মরল, কিছু টিঁকে গেল।

মানুষের চেহারার রকম-ফের হয় যে দেশে সে বাস করে প্রধানত সেই দেশের জল-বায়ুর জন্য। এ কথা আগেই বলেছি।

সুতরাং এদের এক এক দলের চেহারা ক্রমে ক্রমে এক এক রকম হয়ে উঠতে লাগল। কেউ বা হলো ফর্সা, কেউ কালো, কেউবা বাদামী। আবার কারুর চুল হলো কটা, আর চোখ নীল, এই সব।

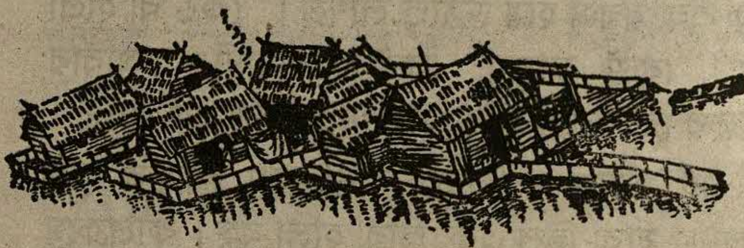
এই ভাবে পৃথিবীতে নানারকম জাতির সৃষ্টি হলো। যারা ছিল এক, তারা হলো বহু। কালক্রমে এরা ভুলেই গেল যে একদিন এরা এক জাতি ছিল এবং ভাইয়ের মতো একই জায়গায় বাস করত।

কথাটা যদি মনে থাকতো তবে কতোই না ভালো হতো। মানুষে মানুষে আজ যে এতো হানাহানি মারামারি হচ্ছে, হয়তো এমনি ধারা হতো না। যাক্‌গে সে কথা।

এই মানুষদের চেহারা ছিল সুন্দর। কপাল উঁচু, উঁচু থুত্‌নি, পাতলা উঁচু নাক, লম্বা সরু ঘাড়। তা ছাড়া এদের গায়ের লোম-ও অনেক কমে এসেছিল। এক কথায়, দেহের যে গড়নকে আমরা সুন্দর গড়ন বলি, তা এরা পেয়েছিল।

বুদ্ধিতেও এরা অনেক এগিয়ে গিয়েছিল। গুহা ছেড়ে এরাই প্রথম ঘর-বাড়ী তৈরী করে বাস করতে শুরু করল।

জলা-জায়গায় বা হ্রদের মধ্যে মাচা বেঁধে তার উপর এরা ঘর-বাড়ী তৈরী করত। জন্তু-জানোয়ারদের হঠাৎ আক্রমণ থেকে বাঁচবার জন্যই বোধহয় এটা করত।



এরকম বাড়ী-ঘরের খোঁজ পাওয়া গেছে

পৃথিবীর নানা দেশে শুকনো হ্রদের মধ্যে এ রকম বাড়ী-ঘরের খোঁজ পাওয়া গেছে। আবার নানা-রকম সুন্দর বাসন-কোসন, অস্ত্রপাতিও সে সব জায়গায় পাওয়া গেছে।

জলা-জায়গায় মাচা বেঁধে বাস-করা লোক এখনও পৃথিবীর নানা দেশে দেখা যায়। আমাদের দেশেও আছে বৈকি।

যতোই দিন যেতে লাগল, ততোই এদের উন্নতি হতে লাগল।

এরা শিকার করা কমিয়ে দিয়ে চাষ-আবাদ ধরল। ক্রমে গোরু, ঘোড়া, কুকুর—এই সব ধরে পোষ মানিয়ে নিজেদের কাজে লাগাতে লাগল।

পশু পোষ মানানোর ব্যাপারে এরা যথেষ্ট বুদ্ধি-

বিবেচনার পরিচয় দিয়েছিল, তা একটু নজর করলেই বোঝা যায়।



ছিল ভয়ানক বুনো, আর চেহারাও ছিল অন্যরকম

হাতি, বাঘ, ভালুক, এসবের ধার না মাড়িয়ে এরা নজর দিল গোরু, ঘোড়া, কুকুর এই সবের দিকে। অবশ্য তখনকার গোরু, ঘোড়া, কুকুর প্রভৃতি এখনকার এদের মতো মোটেই ছিল না। ছিল ভয়ানক বুনো, আর চেহারাও ছিল অন্যরকম।

যেমন, কুকুর ছিল প্রায় নেকড়ের মতো।

হাতির গায়ে ছিল বড়ো বড়ো লোম আর দাঁত দুটো অসম্ভব বড়ো।

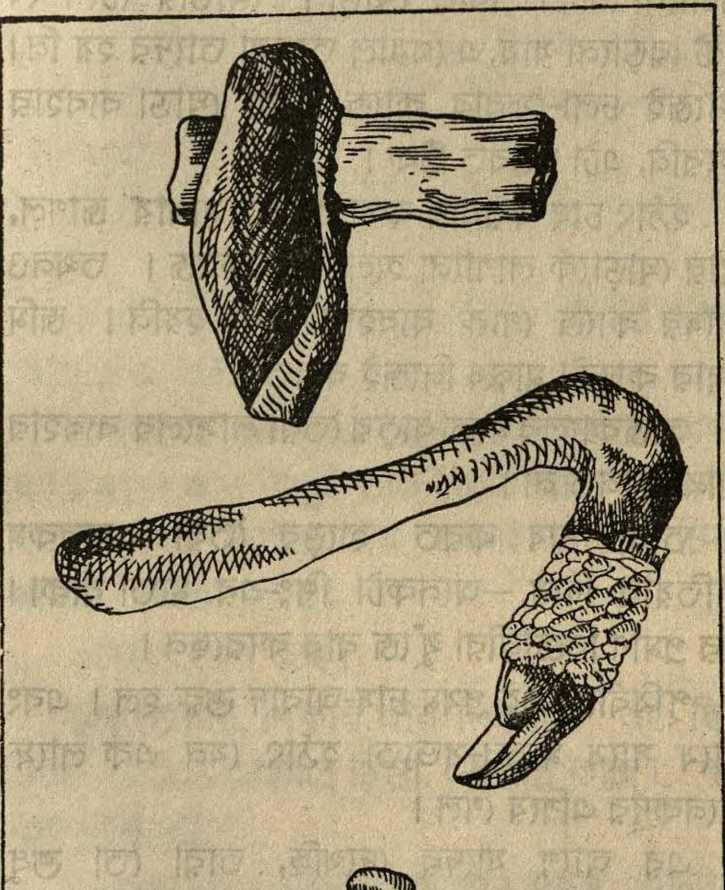
ঘোড়ার নাকি কাটা-খুর ছিল গোরুর মতো, আর দেখতে ছিল বড়ো গোছের রামছাগলের মতো।

তবু কেমন করে যেন এই নতুন মানুষরা বুঝতে পেরেছিল যে বনে যতো পশু আছে তার মধ্যে এরাই শেষ পর্যন্ত মানুষের সবচাইতে বেশী কাজে লাগবে।

তাদের বিচার যে ভুল হয়নি তা আমরা এখন বেশ দেখতে পাচ্ছি।

এই সময়টাই মানুষ সম্ভবত দুধ-খাওয়া আবিষ্কার করেছিল। বোধহয় বাছুরকে দুধ খেতে দেখে তাদেরও দুধ-খাওয়ার ইচ্ছা হয়েছিল। প্রথম যেদিন এদের কেউ একজন খানিকটা দুধ খেয়ে নিয়েছিল, সেই দিন হয়তো মস্তো হৈ-হৈ কাণ্ড বেঁধে গিয়েছিল। মাটির বাসনে এরা দুধ জমিয়ে রাখত, এবং ঘি, মাখন পর্যন্ত তৈরী করতে পারত, এমন প্রমাণও পাওয়া গেছে।

পশু পুষতে গিয়ে তাদের ভাবনা হল কি করে এদের খুব বেশী কাজে লাগানো যায়।



তারা চাষ করত এইরকম হাতিয়ার দিয়ে

গোরু থেকে তো দুধ পাওয়া গেল। কুকুর দিয়ে খানিকটা শিকার, আর বাকীটা পাহারার কাজে চালানো গেল। কিন্তু ঘোড়া? ঘোড়ায় চেপে যে ছুটে বেড়ানো যায়, এ খেয়াল তখনো তাদের হয় নি। কাজেই চলা-ফেরার কাজে তারা ঘোড়া ব্যবহার করেনি, এটা সম্ভবত ঠিক।

হঠাৎ চাষ করবার কথা তাদের মাথায় জাগল, আর ঘোড়াকে লাগানো হলো সেই কাজে। তখনও চাষের কাজে গোরু ব্যবহার করা হয়নি। জমি চষার কাজটা মানুষ নিজেই করত।

আজকালের মতো ধাতুর তৈরী লাঙ্গলের ব্যবহার তারা জানত না।

তারা চাষ করত হাড়ের তৈরী একরকম হাতিয়ার দিয়ে,—অনেকটা শিং-এর মতো বাঁকা। এর প্রমাণ বিজ্ঞানীরা খুঁজে বার করেছেন।

পৃথিবীতে এই প্রথম চাষ-আবাদ শুরু হল। এবং সাথে সাথে মানব-সভ্যতা হঠাৎ যেন এক লাফে অনেকদূর এগিয়ে গেল।

এর আগে যাদের দেখেছি, তারা তো শুধু শিকারই করতো।

পৃথিবীতে মানুষ আজ পর্যন্ত যতো কিছু আবিষ্কার করেছে, তার মধ্যে চাষ-আবাদই হল সর্বশ্রেষ্ঠ।

এর ফলে কী হলো?

হলো এই যে শিকারের খোঁজে এদের আর দিন-ভোর বনে-বাদাড়ে ঘুরে বেড়াতে হলো না। চাষের ফসল ঘরে তুলে ধীরে সুস্থে নিশ্চিন্তে বসে খাবার সুযোগ পেল। জীবনের বিপদ ও ঝুঁকি কমে গেল। কারণ, শিকারে গিয়ে জন্তু-জানোয়ারদের হাতে তো অনেকেরই প্রাণ যেত।

এই ভাবে তাদের জীবনে অবসর ও বিশ্রাম এলো।

দেহের কাজ কমল বটে, কিন্তু এইবার মাথার কাজ শুরু হলো।

মানুষ যতোক্ষণ কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকে, ততোক্ষণ কাজ ছাড়া আর কিছুই তার মাথায় আসে না। আর যখনই কাজ ফুরিয়ে যায় তখনই রাজ্যের চিন্তা মাথায় এসে জড়ো হয়।

এদেরও হলো তাই।

শুধু শিকার, শিকার আর শিকার। এই ছিল এতো কালের একমাত্র চিন্তা, একমাত্র কাজ। পশু মার আর খাও।

তারপরে চাষ করতে শুরু করে দেখল, একবার ফসল ঘরে তুলতে পারলে অনেকদিন বসে খাওয়া যায়।

হাতে কোন কাজ নেই, এখন কী করা ?

ঠিক এই অবস্থাতেই ওদের মাথায় নানা চিন্তা

ঢুকতে শুরু করল। চারদিকের সব কিছু চোখ মেলে, মন দিয়ে খুব ভালো করে দেখতে লাগল।

যতোই দেখে ততোই ভাবে, কতো ভাবনা মাথায় আসে!

এটা কী, ওটা কী, সেটা কেন ? এই সব। ঠিক যেমন ছোট ছেলে কথা বলতে শুরু করেই 'কী' আর 'কেন'র চোটে বাপ-মাকে অস্থির করে তোলে। শিশু যে চোখে পৃথিবীকে দেখে, এরাও সেই চোখেই পৃথিবীকে দেখেছিল।

এই ভাবে তাদের মাথার কাজ শুরু হলো।

প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীতে মানুষের চিন্তা-ভাবনা এই প্রথম, এবং চাষ-আবাদের আবিষ্কারই এই চিন্তা-ভাবনার সুযোগ এনে দিয়েছিল।

সুতরাং চাষ-আবাদকে মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কার বলা চলে।

এই ভাবে নতুন মানুষরা নানা দিকে তাদের বুদ্ধি আর মাথা খাটাতে লাগল।

এই ভাবে তারা তাদের জীবনকে আরও সহজ, আরও সুন্দর করে গড়ে তুলবার সাধনায় লেগে গেল।

ফুলের কুঁড়ি যেমন একটির পর একটি করে পাঁপড়ি মেলে, এদের মনের কুঁড়িও তেমনি এক একটি করে পাঁপড়ি মেলে চলল।

এই নতুন মানুষরা আর একটা নতুন জিনিস আবিষ্কার করল।

তা হল রান্না।

এ যাবৎ পৃথিবীতে যতো রকম মানুষ এসেছে, তারা সবাই খেত কাঁচা বা পচা। রান্না করতে কেউ জানতো না।

এরা কিন্তু কাঁচা-পচা ছুঁত না।

এদের প্রধান খাদ্য ছিল মাংস। নানান রকমের মাংস খেত এরা—কুকুর, ঘোড়া, গোরু, শেয়াল এই সব। কিন্তু মজা হল, খরগোশ এরা কখনও খায়নি, তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। অথচ খরগোশের মাংস কতো না ভালো, তা তো আমরা জানি।

না খাওয়ার কারণ হলো, এদের মাথায় কি করে যেন ঢুকেছিল যে খরগোশ খেলে মানুষ খরগোশের মতো ভীরু ও দুর্বল হয়ে যায়!

এরা লবণের ব্যবহার জানত, তারও প্রমাণ পাওয়া গেছে।

কাপড়-চোপড়ের জন্য এরা পশুর চামড়া ব্যবহার করত না। গাছের ছালে কাপড় বানিয়ে তাই পরত।

আজকাল তো গাছের ছালের আঁশ থেকে রকমারি বাহারে-কাপড় তৈরী হচ্ছে। এই আবিষ্কারের গোড়াতে কিন্তু প্রায় বারো হাজার বছর আগের এই নতুন মানুষের বুদ্ধির দান আছে।

ধীরে ধীরে ধাতুর ব্যবহারও এরা শিখে ফেলল।

বন-বাদাড়ে, পাহাড়-পর্বতে ঘুরে ঘুরে হঠাৎ এক দিন সোনা আবিষ্কার করে ফেল্‌ল।

সোনা বলতে আমরা যা বুঝি, তা হল পরিষ্কার করা সোনা।

খনি থেকে ধাতু যখন প্রথম বেরয়, তখন আমরা তাদের যে রূপে চিনি, তেমনটি কিন্তু থাকে না। নানা রকম ময়লা তাতে মেশানো থাকে। তারপরে অনেক করে তাকে ধোলাই করে, পরিষ্কার করে তবে বাজারে ছাড়া হয়। সোনাও তাই।

কাজেই এই মানুষেরা যে সোনা পেয়েছিল, তা ছিল ময়লা মেশানো। নোংরা মতোন।

তবুও তারা কী করে যেন বুঝে ফেল্‌ল যে জিনিসটা খুব ভালো, সুন্দর ও দামী।

এই থেকেই বোঝা যায়, ওদের বুদ্ধি কতোদূর এগিয়েছিল!

আস্তে আস্তে দেখা গেল ওরা সোনা গালিয়ে গয়না বানানো শুরু করেছে। এতোদিন ওরা যে গয়না পরত, তা ছিল হাড়ের। সোনা চেনার পর থেকে হাড়ের গয়না বাতিল হয়ে চল্‌ল।

আবিষ্কারের নেশা এদের আরও এগিয়ে নিল।

একটার পর একটা নতুন ধাতু এরা খুঁজে বার করতে লাগল।

শুধু খুঁজে বার করেই থামল না। তাদের ব্যবহারও শিখে ফেল্‌ল।

সোনার পরে এরা আবিষ্কার করল তামা।

তামাকে গালিয়ে পিটিয়ে এরা অস্ত্র বানাতে শুরু করল। পাথর বা হাড়ের অস্ত্র, যা এরা এতোদিন ব্যবহার করে এসেছিল, তাতে বোধহয় সুবিধা হচ্ছিলো না।

যা হোক, খাঁটি তামার অস্ত্র দিয়ে কিন্তু তেমন যুৎ হল না। খাঁটি তামা বেশ নরম তো। কাজেই অস্ত্রের ধার থাকত না, বটে যেত।

তখন এরা থম্‌কে গেল। ভাবল, কী করা ?

তারপরই দেখা গেল এদের সমাজে কাঁসার ব্যবহার।

এ একটা আশ্চর্য ব্যাপার !

কাঁসা নিজে কোন ধাতু নয়। তামার সাথে টিন মিশিয়ে কাঁসা বানাতে হয়। কী করে যে এরা টিন আবিষ্কার করল, আর কী করেই বা তাকে তামার সাথে মিশিয়ে কাঁসা বানাল, তা ভেবে পাওয়া যায় না। এটা একটা পরম আশ্চর্য আবিষ্কার !

কাঁসার অস্ত্রপাতি, কাঁসার বাসন-কোসন এইসব তারা পুরোদমে বানিয়ে চল্‌ল। বিজ্ঞানীরা নানা দেশে এদের কাঁসা তৈরীর কারখানা খুঁজে পেয়েছেন।

এইভাবে মানব-সভ্যতার একটি প্রধান অঙ্গ, ধাতু সর্বপ্রথম পৃথিবীতে আবিষ্কৃত হল।

এই মানুষরা পূজা-অর্চনাও করত। যতোসব বিদঘুটে চেহারার পুতুল ছিল এদের পূজার দেবতা।

যা-ই পূজা করুক, এর থেকে এই বোঝা যায় যে মানুষের মনে ভক্তির উদয় হয়েছে।

এই ভক্তিভাব থেকেই পরে মানুষের মনে ধর্মভাব জেগেছিল।

কিন্তু এটা হলো কী করে?

আগেই বলেছি, শিকার ছেড়ে চাষ-আবাদ আরম্ভ করবার ফলে এদের জীবনে বিশ্রাম ও অবসর এসেছিল।

সেই বিশ্রাম ও অবসর এদের আদিম মনে যতো রাজ্যের প্রশ্ন ও জিজ্ঞাসা এনে দিয়েছিল।

চোখ তুলে ও মন খুলে এরা যখন পৃথিবীর দিকে তাকালো, তখন একটা জিনিস এরা খুব ভালো করে বুঝল;—তা হল এই, মানুষের শক্তির বাইরেও একটা শক্তি আছে। মানুষের শক্তির শেষ আছে, কিন্তু এই শক্তির শেষ নেই। এই শক্তির কিনারা পাওয়া যায় না। অস্ত্র দিয়ে তো মানুষ মারা যায়, পশু মারা যায়, কিন্তু এ শক্তিকে ঠেকানো কী দিয়ে?

ঝড় যখন আসে আকাশ ভেঙ্গে, বাজ যখন ফেটে পড়ে বুক কাঁপিয়ে, বান যখন ছুটে আসে সব ভাসিয়ে, আগুন যখন ধেয়ে চলে সব পুড়িয়ে, তখন তাকে সামলানো কী দিয়ে? কার আছে অমন শক্তি?

তখনই তার আদিম মনে জেগে উঠল ভয়।

এই ভয় গুহার মুখে জানোয়ার দেখা ভয় নয়। কারণ, সে শত্রুকে তো দেখাই যাচ্ছে।

কিন্তু এই যে শত্রু, একে তো দেখা যায় না, ছোঁয়া যায় না। এ তো নাগালের বাইরে। অস্ত্র সেখানে মিছে।

তখনই মানুষ এই দেখতে-না-পাওয়া শক্তি বা শত্রুর কাছে মাথা নোয়াল, হার মানল।

নানারূপে তাকে কল্পনা করে, নানা ভাবে তাকে তুষ্ট করতে চাইল।

তার মনে ভক্তির উদয় হলো।

কাজেই দেখা যাচ্ছে, ভয় আর বিস্ময় থেকেই মানুষের মনে প্রথম ভক্তি জন্মে ছিল।

এই হলো মানুষের ধর্ম-বিশ্বাস, পূজা ইত্যাদির গোড়ার কথা।

এমনি করে মানুষ এগিয়ে চলেছে।

কতো না দুঃখ, কতো না কষ্ট, কতো না বিপদ তার যাত্রাপথ ঘিরে ছিল। সব ডিঙিয়ে, সব জয় করে মানুষ তার পথ কেটে নিয়েছে।

তিন লক্ষ বছর আগে মানুষ যখন প্রথম পৃথিবীতে এসেছিল, তখন সে ছিল পৃথিবীর সর্ব-দুর্বল প্রাণী। সেদিন কতো ভয়ে, কতো দুরু দুরু বুকে সে পৃথিবীর মাটি আঁকড়ে ছিল।

তারপর যুগের পরে যুগ কেটে গেল।

এক-এক দল মানুষ লোপ পেয়ে নতুন নতুন দল দেখা দিল।

এমনি করে আজ থেকে প্রায় বারো হাজার বছরের মাথায় এসে মানুষের জীবন-স্রোত যেন হঠাৎ মোড় ফিরে দাঁড়াল।

প্রাণের যে ক্ষীণ স্রোতটি শেষপর্যন্ত মানুষের ভেতর দিয়ে বিকাশের পথ খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছিল, হঠাৎ যেন সেই মরা-স্রোতে বানের ডাক এসে গেল! ফুলে, ফেঁপে, দুকূল ভাসিয়ে প্রাণের বন্যা ছুটে চল্‌ল নতুন যুগের "খাঁটি মানুষ"দের ভেতর দিয়ে।

সেই স্রোত আজও বয়ে চলেছে আজকে-দিনের মানুষ, আমাদের মধ্যে।

পাঁচ

কথা শেষ

পৃথিবীর বুকে প্রাণ কি ভাবে বিকাশ পেয়েছিল, কি ভাবে এক-কোষ-ধারী অতি নগণ্য প্রথম প্রাণ ধাপে ধাপে বিকশিত হতে হতে আজকের মানুষে এসে রূপ পেল, তারই একটা মোটামুটি কাহিনী এতোক্ষণ বলা গেল।

কিন্তু যতো অল্প কথায় বলা হল, গল্পটি কিন্তু মোটেই ততো অল্প নয়।

এটি ঘটতে লেগেছিল, খুব বেশী নয়, মাত্র পঞ্চাশ কোটি বছর!

এই পঞ্চাশ কোটি বছরের যাত্রাপথে প্রাণকে যে কতো মার খেতে হয়েছে, কতোবার সে ধুয়েমুছে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার মুখে এসেছে, কতো রকমের কতো ঘটনাই না ঘটেছে, তা তো আমরা দেখেছি।

যদি ক্রমবিকাশে আমরা বিশ্বাস করি, তবে এ কথা মানতেই হবে যে প্রাণের বিকাশ এখনও পূর্ণ হয়নি। হয়তো আরও মহৎ, আরও সুন্দর কোনো প্রাণী গড়ে তুলবার জন্যে আজও সে পথ খুঁজে বেড়াচ্ছে।

কাজেই পঞ্চাশ কোটি বছর আগের জলে-ভাসা সেই প্রথম প্রাণ, আর আজকের দুনিয়ার আমি, দু-ই যে এক প্রাণ-ডোরে বাঁধা, এ কথা তো অস্বীকার করা যায় না।

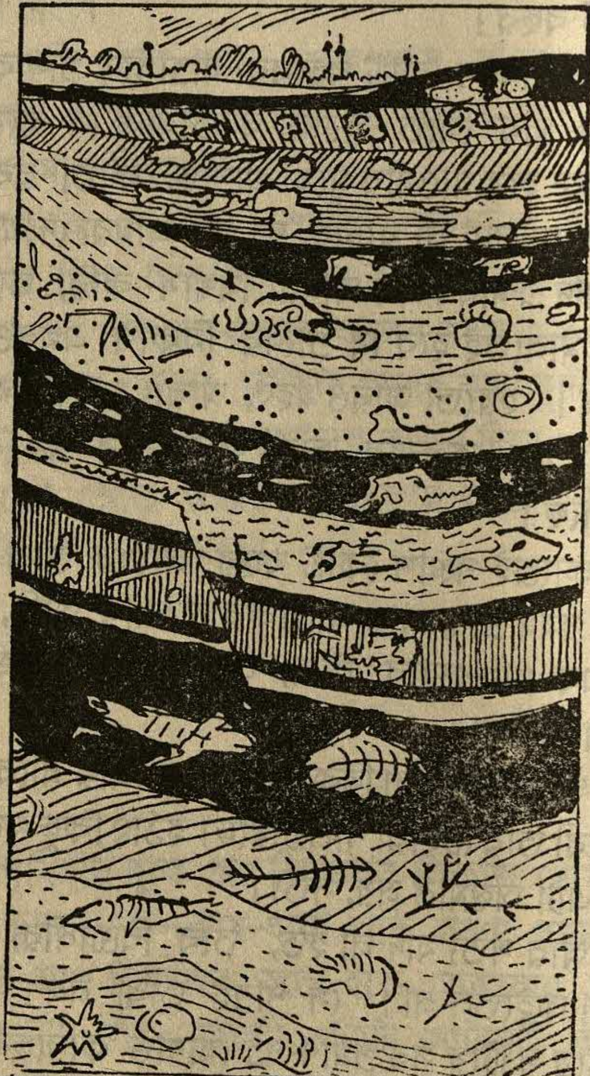
ধীরে ধীরে প্রাণ বিকাশ পেয়েছে, আর ধীরে ধীরে পৃথিবী তার চেহারা পালটিয়েছে। হঠাৎ কিছু ঘটেনি।

এটা অনুমান নয়, সত্য।

আর সত্য যদি না হত, তবে বিজ্ঞানীরা ছেড়ে কথা কইতেন না। সে পাত্রই তাঁরা নন! তাঁরা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব প্রমাণ-পত্র যোগাড় করেছেন। সে কতো প্রমাণ, কতো রকমের। তার সব আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। গুটিকতক মাত্র বলছি।

ফসিল কাকে বলে, তা আমরা আগেই জেনেছি।

মাটির তলায় এই ফসিল পাওয়া যায়। পৃথিবীর

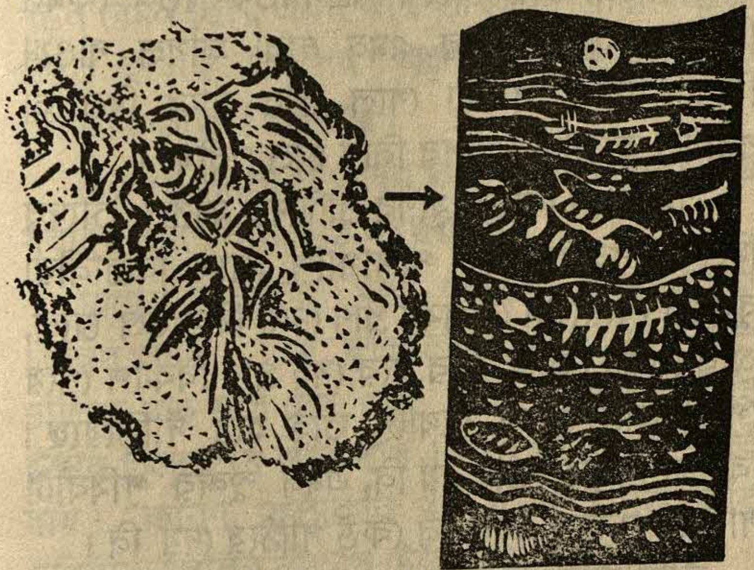


মাটি স্তরে স্তরে সাজানো—পড়তে হবে তলা থেকে উপরে

মাটি স্তরে স্তরে সাজানো আছে আমাদের পায়ের নীচে প্রায় পঞ্চাশ মাইল পর্যন্ত।

এর কোন স্তরের কতো বয়স, কোন যুগে কোন স্তরটা সেই সময়কার প্রাণীদের পিঠে ধরে রেখেছিল, এইস-ব খবর বিজ্ঞানীরা জেনে ফেলেছেন।

আজ আমাদের ঠিক পায়ের তলায় যে মাটি, সেটা হল সবচাইতে নতুন, আর তার নীচে পঞ্চাশ মাইলের মাথায় যে মাটি, সে হল সব-পুরোণো।



মাটির কোন্ স্তরে ওটা পাওয়া গেল্

কাজেই পৃথিবীর জন্ম ও প্রাণের ইতিহাস পড়তে হলে সেই উল্‌টো থেকে শুরু করতে হবে। উপর থেকে নীচে নামলে চলবে না, তলা থেকে উপরে উঠতে হবে।

মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে যখনই কোন ফসিল পাওয়া

গেছে, বিজ্ঞানীরা প্রথমেই দেখেছেন, মাটির কোন স্তরে ওটা পাওয়া গেল।

তার পরে দেখেছেন সেই স্তরটা কোন যুগের এবং কতোকাল সেই স্তর টিঁকেছিল।

তারপরে চলে ফসিল পরীক্ষা।

কিসের ফসিল, ফসিলের মালিকের চেহারা কেমন ছিল, তার দেহের যন্ত্রপাতির গড়ন কেমন ছিল, এর আগের স্তরে এমন ধারা ফসিল পাওয়া গিয়েছে কিনা, পাওয়া গেলে তার সাথে মিল বা গরমিল কতটুকু, এইসব নিয়ে চলে পরীক্ষা।

এই ভাবে বিভিন্ন যুগের প্রাণীদের ফসিল, তাদের মিল ও গরমিল সব পাশাপাশি রেখে বিজ্ঞানীরা বুঝতে পেরেছেন যে প্রথম প্রাণ দেখা দিয়েছিল জলে, আর কোটি কোটি বছর ধরে সেই প্রাণ বিকাশ পেয়ে পেয়ে, আজকে যা দেখছি, তাই হয়ে দাঁড়িয়েছে। কোনো কিছুই হঠাৎ হয় নি, এমন সুন্দর পৃথিবীটা সাজিয়ে গুছিয়ে একদিনে কেউ পাঠিয়ে দেয় নি!

তাঁরা আরও দেখেছেন যে প্রাণী ক্রম-বিকাশের পথে যতোই এগিয়েছে, ততোই তার চেহারা উন্নত হয়েছে, আর দেহের যন্ত্রপাতির গড়ন ততোই জটিল হয়ে উঠেছে। মাটির অনেক নীচের তলার ফসিল আর তার উপরের তলার ফসিল মিলিয়ে তাঁরা এটা দেখতে পেয়েছেন। অর্থাৎ গোড়ায় যা আটপৌরে ছিল, পরে তা বেনারসী হয়ে দাঁড়িয়েছে!

আদিমকাল থেকে আজ পর্যন্ত যতো প্রাণী পৃথিবীতে এসেছে তাদের দেহের কতকগুলি অত্যন্ত দরকারী যন্ত্রের মধ্যে আশ্চর্য রকম মিল খুঁজে পাওয়া গিয়েছে। যেমন, মাথা, হৃদযন্ত্র, ফুস্‌ফুস্‌, পাকস্থলী, মল-মুত্র ত্যাগের যন্ত্র, এই সব।

কিন্তু দেখা যায় যে গোড়ার দিকে এই সব যন্ত্রের গড়ন যেমন ছিল, এখন আর তা নেই। প্রাণী যতোই উন্নত হয়েছে এই সব যন্ত্রপাতির জটিলতা ও রকমারি ততোই বেড়েছে।

মেরুদণ্ডওয়ালা প্রাণীদের মধ্যে শ্বাস নেবার যন্ত্র সবাইর আগে গড়ে ওঠে মাছের দেহে।

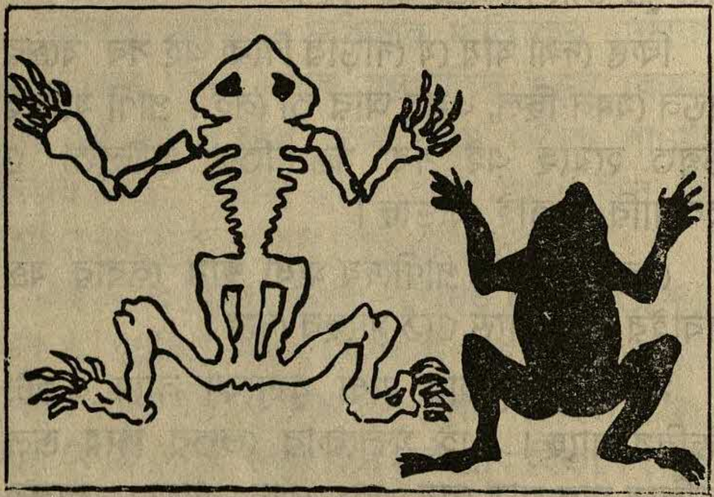
মাছের কান্‌কোর মধ্যে ফুল্‌কো নামে একটা জিনিস আছে। এই ফুল্‌কোর ভেতর দিয়ে জল চালিয়ে মাছ শ্বাস নেয়, এবং বেঁচে থাকে। জলের উপরে তুল্‌লে সে আর শ্বাস নিতে পারে না,—মরে যায়। কারণ, ফুল্‌কোর যা গড়ন তাতে করে পৃথিবীর উপরের বাতাস টেনে নেয়া সম্ভব নয়।

অবশ্য কৈ, মাগুর, শোল প্রভৃতি কয়েক রকম মাছ আছে যারা জল ছাড়া ডাঙ্গাতে বেশ কিছু সময় টি`কে থাকতে পারে। তাদের ফুল্‌কো সাধারণ মাছের চাইতে অনেকটা উন্নত।

আমাদের শ্বাসযন্ত্র হল ফুস্‌ফুস্‌। সে আছে আমাদের বুকের পাঁজরের মধ্যে লুকিয়ে। আমরা

নাক দিয়ে যে শ্বাস টেনে নিই, তাই আবার ফুস্‌ফুস্‌ ঘুরে নাক দিয়ে বেরিয়ে আসে।

স্মুতরাং দেখা যাচ্ছে যে মাছের ফুল্‌কো আর ডাঙ্গার প্রাণীদের ফুস্‌ফুসের গড়নে তফাত অনেক।



চম্‌কে উঠতে হয়……

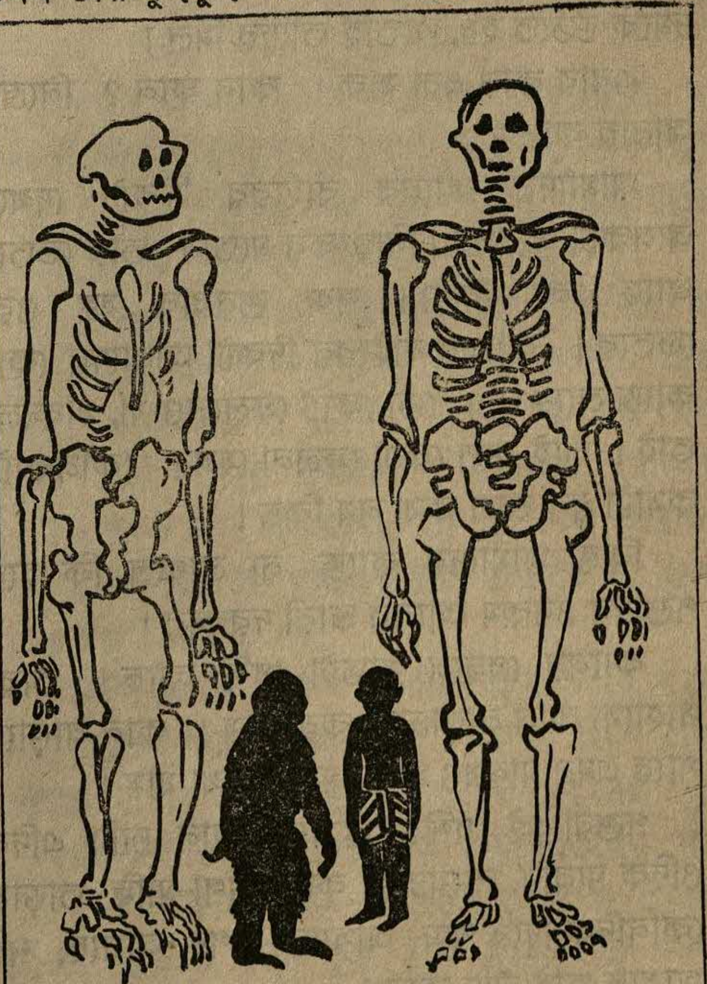
কাজেই জলের প্রাণী ক্রমবিকাশের ফলে ডাঙ্গার প্রাণী হয়ে দাঁড়িয়েছে, এ কথা দাঁড়ায় কোথায় ?

দাঁড়ায় বৈকি। না দাঁড়িয়ে যো আছে ? প্রমাণ আছে যে!

ব্যাঙ।

যতো ঘেন্নাই না করি, জীবন-বিকাশের ইতিহাসে ব্যাঙের ভারী মান। সে ভারী কুলীন। জল আর ডাঙ্গার মাঝে সে-ই হল সাঁকো।

এই ব্যাঙের বাচ্ছা ব্যাঙাচি যখন জলে থাকে, তখন তার ফুস্‌ফুস্‌ থাকে না, থাকে মাছের মতো



......এতোই মিল

ফুল্‌কো। আবার সে-ই যখন ডাঙ্গায় ওঠে তখন ঐ ফুল্‌কোই ফুস্‌ফুস্‌ হয়ে দাঁড়ায়।

ব্যাঙের কথা বড় কথা। একটা ব্যাঙের কঙ্কাল আর একটা মানুষের কঙ্কাল পাশাপাশি রাখলে চমকে উঠতে হয়, এতোই তাদের মিল।

এবার কান ধরা যাক। কার কান? নিজের, আবার কার?

আমাদের কানের বাইরের দিকটা দেখতে অনেকটা আধখানা ঝিনুকের মতো। তার ভেতরে আছে একটা ছ্যাঁদা। শব্দ শুনবার যন্ত্র ওরই ভেতরে। কানের বাইরের দিকটা আমাদের কোন কাজে লাগে না। ওটা কেটে ফেল্‌লেও যা, থাকলেও তাই। তাই বলে কেটে ফেলনা যেন! 'কানকাটা' কথাটা খুব ভাল কথা নয় কিন্তু!

কিন্তু আমাদের কাজে না লাগলে কি হবে, পশুদের ওরকম কানের ভারী দরকার।

কানের পেছনে সাতটা পেশী আছে। তারই সাহায্যে কান নাড়াচাড়া করা যায়। কান নাড়াতে পারে এমন মানুষও মাঝে মাঝে দেখা যায়।

পশুরা এই পেশীর সাহায্যে কান দুটো এদিক ওদিক ঘুরোয়, নাড়াচাড়া করে, মশা-মাছি তাড়ায়, কোনদিক দিয়ে শব্দ আসছে, বিপদ আসছে, শত্রু আসছে তাই আঁচ করে।

যে কারণে পশুদের কান ঘোরানো দরকার, সে দরকার আমাদের আর নেই। আমরা সে অভ্যাস ছেড়ে দিয়েছি, তাই পেশীগুলোও অকেজো হয়ে গেছে।

কান দুটো শুধু আমাদের মাথার সাথে লেগে থেকে যেন কানে কানে বলছে—"শুন হে মানুষ ভাই, তোমাতে পশুতে তফাত বড় নাই।"

মানুষের দেহে এখনও এমন বহু যন্ত্র আছে, যা নাকি আর কোনই কাজে লাগে না। রুশ দেশের বিজ্ঞানী মেশনিকফ্ এই রকম প্রায় একশোটির একটি লিষ্টি তৈরী করেছেন।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে আজকের এই পৃথিবীতে যা দেখছি তা একদিনে ঘটে নি। কোটি কোটি বছর ধরে তিল তিল করে পৃথিবী গড়ে উঠেছে আর তার সাথে সাথে প্রাণের ক্রমবিকাশ ঘটেছে। গোড়ায় যা একরকম ছিল কালক্রমে তা বহুরকম হয়েছে, যা অসুন্দর ছিল তা সুন্দর হয়েছে, যা চলনসই ছিল তা জটিল হয়েছে।

পঞ্চাশ কোটি বছর আগে লালার মতো যে প্রথম প্রাণ সমুদ্রের গরম বুকে ভেসে বেড়াত, তিন লক্ষ বছরের মাথায় এসে সে প্রথম মানুষের রূপ পেল।

তারপরে তিন লক্ষ বছরের ক্রমবিবর্তনের পথ বেয়ে সেই আদিম মানুষ আজকে দুনিয়ার সুন্দর মানুষে পরিণত হয়ে বুক ঠুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে।

আজ সে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণী।

কিন্তু এই বিকাশের পথে প্রাণকে কী প্রচণ্ড বাধা ডিঙোতে হয়েছে, কতো না যুদ্ধ জয় করতে হয়েছে।

পায়ে পায়ে তাকে লড়তে হয়েছে। লড়তে হয়েছে দুমুখো লড়াই। পাগলা পৃথিবীর সাথে, আবার নিজেদের মধ্যে।

প্রাণ বারে বারে চরম আঘাত পেয়েছে প্রকৃতির হাতে। কখনও প্রচণ্ড গরম, কখনও প্রচণ্ড শীত। কখনও পৃথিবীর বুক ফেটে আগুন বেরোনো, কখনও বরফের পাহাড় নেমে আসা। এরই মধ্যে সেই আদিম প্রাণ পথ করে নিয়েছে। এই প্রচণ্ড ফাটা-ফুটি, আগুন, বরফ, ঝড়, জল, এর ফলে কতো প্রাণীই না নিঃশেষ হয়ে গেছে। আজ ফসিল ছাড়া তাদের আর কোন চিহ্নই আমরা খুঁজে পাই না। তবু প্রাণ মরে নি। প্রকৃতি পারে নি তাকে নিঃশেষ করতে। প্রাণের স্রোত বয়েই চলেছে। কিন্তু কী করে প্রাণ টিঁকে রইল ?

সে এক আশ্চর্য ব্যাপার !

মার খেতে খেতে যেমন মার খাওয়া সহ্য হয়ে যায়, কাজ করতে করতে যেমন কাজ করবার শক্তি বাড়ে, তেমনি প্রকৃতির হাতে মার খেতে খেতে প্রাণীর সহনশক্তি গেল বেড়ে।

বহু প্রাণী মরল বটে, কিন্তু টিঁকেও গেল কিছু। মার খাওয়ার ফলে তারা আরো শক্ত সমর্থ হয়ে উঠল এবং পুরোদমে বংশবৃদ্ধি করে চল্‌ল। এই নতুনের দল নতুন শক্তি নিয়ে পৃথিবীতে এলো।

আবার নতুন করে বিপদ ঘনিয়ে এলো। আবার বহু মরল।

এইভাবে পৃথিবীতে বারে বারে বিপদ ঘনিয়ে এসেছে।

বারে বারে প্রাণ মুছে যাওয়ার মুখে এসেছে, কিন্তু যায় নি।

যে সব প্রাণী টিঁকে গেছে, দেখা গেছে তারা নতুন চেহারায়, নতুন রূপে পৃথিবীতে নতুন প্রাণের বন্যা বইয়ে দিয়েছে।

প্রকৃতির হাতে মার না খেলে এমনটি বোধহয় হত না।

বড়ো হতে হলে, সার্থক হতে হলে দুঃখ-বিপদকে জয় করে আসতে হবে—হেরে গেলে চলবে না তো।

এখানে শেষ হলেও হতো। কিন্তু তা হয় নি।

একদিকে প্রকৃতির সাথে যুদ্ধ, অন্যদিকে নিজেদের মধ্যে।

কোনো প্রাণীই কোনো দিন অপরকে বন্ধুভাবে দেখে নি। লড়াই, কেবলই লড়াই—কে কাকে খাবে, কে কার খাবার কেড়ে নেবে, কে ভোগ করবে এই পৃথিবী। যেমনটি চলেছে আজও। কামান, বন্দুক, ট্যাঙ্ক, হাইড্রোজেন বোমা, আর সেই দিনের নখ, দাঁত, বিষ, পাথরের নুড়ি আর তীর-ধনুক, এ তো একই কথা, একই জিনিসের রকমফের—সেই আটপৌরে থেকে বেনারসী!

এই করে, দুর্বল যারা, অসমর্থ যারা, ভীরু যারা, তারা আর এক দফা মরেছে। দলকে দল পৃথিবীর বুক থেকে মুছে গেছে। আর বুদ্ধিমান, সবল, সাহসী বীরের দল পৃথিবী ভোগ করেছে।

বারে বারে এমনি ঘটনা ঘটেছে পৃথিবীতে। এমনি করে বারে বারে অপদার্থের ছাঁটাই হয়েছে।

এ তো এখনও হচ্ছে। উনিশশো ছিঃল্লিশে সেই যে বড় আকাল হয়ে গেল দেশে, তা তো আমরা ভুলিনি। "ফেন দাও, ফেন দাও গো" বলে কতো মানুষ সেদিন পথে নেমেছিল। শুধু ফেন খেয়েই দিন কাটিয়েছে কতো লোক। কতো লোক মরেছে, আবার মরেওনি অনেক। মরল যারা তারা লড়াইতে হেরে গেল, প্রকৃতি তাদের ছাঁটাই করল।

এই ছাঁটাই চলেছে প্রতি মুহূর্তে, প্রতি স্তরে—কী উদ্ভিদজগতে, কী পশুজগতে, কী মানুষের মধ্যে।

দশটা চারাগাছ একই জায়গায় জন্মালো। পাঁচটা দিব্যি বড় হয়ে উঠল। আর পাঁচটা শুকিয়ে মরল। কেন? অপদার্থের ছাঁটাই হলো। তারা যুদ্ধে হেরে গেল।

তিন ভাই একসঙ্গে বড় হচ্ছে, একই অবস্থায়। একজন হল বিদ্যায় বুদ্ধিতে দশের এক, আর দুজন যেখানে ছিল, সেখানেই থেকে গেল। এখানেও সেই অপদার্থের ছাঁটাই।

এই মারামারি হানাহানির মধ্যে আর একটা ব্যাপার লক্ষ্য করা গেছে। সেও ভারী মজার।

সবলের হাতে দুর্বল তো আর বাঁচে না! কিন্তু তারও তো বাঁচবার সাধ হয়। তাই দুর্বল আর চুপ করে মার না খেয়ে চেষ্টা করতে লাগল বাঁচবার। আর এই চেষ্টাই তাকে শেষ পর্যন্ত বাঁচিয়ে দিল। এই চেষ্টার ফলে পশু ও পাখি জগতে কোন কোন প্রাণীর চেহারায় এমন পরিবর্তন ঘটেছে যা ভাবলেও অবাক হতে হয়।

হরিণকে আজ যেমনটি দেখছি তেমনটি সে ছিল না। বাঘের চাঁটি খেয়ে খেয়ে প্রায় সাবাড় হয়ে এলো যখন, তখন শুরু হল তার নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা। তার আত্মরক্ষা রূপ পেল তার পালানোর মধ্যে। ক্রমে তার দেহ হালকা আর ঠ্যাংগুলো সরু আর ভারী জোরালো হয়ে উঠল। তখন আর তাকে পায় কে? ছুট্, ছুট্, দে ছুট্! ভারী জব্দ হল বাঘ।

আবার বাঘের হল আর এক ফ্যাসাদ। গোড়ায় তার গায়ের রং আজকের মতো ছিল না। নলবনে লুকিয়ে লুকিয়ে সে শিকার ধরত। কিন্তু যাকে সে খাবে, সে তাকে প্রায়ই দেখে ফেলত আর পালিয়ে যেত। ব্যাচারা করে কী? খাবার তো আর জোটে না। শুধু ঘাঁস চিবিয়েইতো বাঘের পেট ভরে না। তখন তারও চেষ্টা চল্‌ল আত্মগোপনের এবং তার ভেতর দিয়ে আত্মরক্ষার। ক্রমে তার গায়ে নলবনের

কালো ছোপ ধরা দিল। তখন—"এক যে ছিল বাঘ, গায়ে তার ডোরা ডোরা দাগ।" বাঘ হল ডোরা-কাটা। তখন তাকে চেনে কার সাধ্যি!

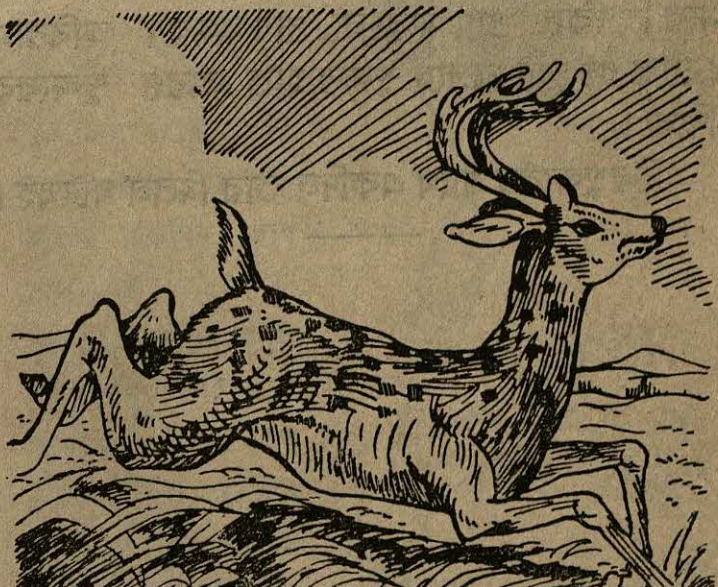


একদিকে মারবার......

এখানে বাঘ হরিণকে পাল্‌টা দিল।

টিয়াপাখির রং নাকি প্রথমটায় সবুজ ছিল না। বহু টিয়া বাজ-চিলের পেটে চলে যাওয়ার পরে তার রং সবুজ হয়ে উঠেছে। "তখন সবুজ বনে সবুজ টিয়া, চিনবে তাকে কী দিয়া ?"

এমন আরও অনেক আছে। সিংহ থাকে খড়বনে, শুক্‌নো মরুভূমির মতো জায়গায়। তাই তার রং অমন ধূসর—যাতে দূর থেকে চেনা না যায়। চার-দিকের রং-এর সাথে তার রং একদম মিশে যায়।



........আর একদিকে বাঁচবার চেষ্টা

কাজেই দেখতে পাচ্ছি, একদিকে মারবার, আর-দিকে বাঁচবার চেষ্টা, তার ভেতর দিয়েই প্রাণ বয়ে

চলেছে স্রোতের মতো। যেখানেই সে বাধা পেয়েছে, সেখানেই ফুলে ফেঁপে উঠে নানা শাখায় ভাগ হয়ে নানা পথে নানা দিকে ছড়িয়ে পড়েছে, নয় তো মুখ ঘুরিয়ে ভিন্ন চেহারায় ভিন্ন পথ ধরেছে। কোনো বাধা, কোনো বিপদ তাকে ঠেকাতে পারেনি—সব পেরিয়ে, সব ডিঙিয়ে, সব অতিক্রম করে তার চরম লক্ষ্যের দিকে সে এগিয়ে চলেছে।

এই যাত্রাপথের শেষ কোথায় জানি না। তবে এইটুকু দেখেছি এবং জেনেছি যে প্রাণী জন্মে, প্রাণী মরে; কিন্তু প্রাণ মরে না, প্রাণ অমর। অবিরাম স্রোতে সে ছুটে চলেছে সুন্দর হতে আরও সুন্দরের দিকে।

চিরসুন্দরের সাথে একদিন তার মিলন ঘটবেই।

চাঁদের দেশ

অনেকদিন পরে গোপালদার আবার দেখা পেলাম। ছাতাটি মাথায় দিয়ে গোপালদা হন্‌হন্‌ করে চলেছে।

গোপালদা—অ গোপালদা—

কে শোনে কার ডাক? যতোই ডাকি, গোপালদার চলার বেগ ততোই বেড়ে যায়।



এটাই হল গোপালদার নিয়ম।

এমনিতে রাতদিন হৈ হৈ করে বেড়াচ্ছে, এবাড়ী ওবাড়ী ঘুরে গল্পগুজব করে মাত করে রাখছে। তারপরে হঠাৎ একদিন তার দেখা নেই। একটানা দশ-পনেরো দিন পর্যন্ত গোপালদা নেই তো নে-ই। এ রকম বেমালুম হারিয়ে যাওয়া আর কখনও দেখিনি। তারপরে হঠাৎ একদিন দেখা গেল গোপালদা ছাতা মুড়ি দিয়ে হন্‌হন্‌

করে চলেছে—কি শীত, কি গ্রীষ্ম, কি বর্ষা—ছাতা ত চাই। পরিচিত কারুর সঙ্গে দেখা হলেই তার চলার বেগ দ্রুত হয়ে ওঠে। আর ছাতাটা কাত হতে হতে তার মুখখানা একেবারে ঢেকে দেয়।

এ অবস্থায় যতোবারই তাকে ধরে ফেলেছি, ততোবারই এক গাল হেসে বলেছে, আরে! তোমার কথাই ভাবছিলাম। বুঝলে যাবখন্ ওবেলা। জানলে, একটা ভারী জরুরী খবর আছে—ওদের সব বল—আচ্ছা?

এই বলেই আবার ছুট্!

আজও তাই।

বুঝলে ভাই, একটু 'ইয়ের' মধ্যে ছিলাম কিনা—তাই কটাদিন তোমাদের সাথে দেখা-টেকা করতে পারিনি। ভারী একটা জরুরী খবর আছে—যাবখন্—গোকুল-টকুলদের বল—আচ্ছা?

গোপালদার 'জরুরী খবর'!

যতোবার গোপালদা ফেরারী হয়েছে, ততোবারই এক-একটা 'জরুরী খবর' নিয়ে এসেছে—সে অদ্ভুত সব গল্প!

কোনোবার বলেছে সুন্দরবনে বাঘ শিকারের গল্প, কোনোবার বলেছে ডুবো জাহাজে পৃথিবী ভ্রমণের গল্প, কখনো বলেছে কতো অজানা দুর্গম দেশ আবিষ্কারের গল্প।

গল্পগুলি তার যেমন অদ্ভুত, তেমনি জমাট। আর মজা হলো, গল্পের মধ্যে বিজ্ঞানের নানা কথা এমনভাবে মিশে থাকে যে শেষ না শুনে ওঠাই যায় না।

সবাইকে জানিয়ে এলাম—গোপালদাকে পাওয়া গেছে

—বিকেলে আসবে 'জরুরী খবর' নিয়ে। ঠিক হলো গোকুলদের বাড়ীতেই বসব।

বিকেলে সব হাজির—গোকুল, নকুল, গনেশ, গোবরা, সব।

এমন সময় গোপালদা এলো।

আমাদের নিয়ম মতো আমরা দাঁড়িয়ে একসঙ্গে তিনবার "গোপালদা কী—জয়" বলতে গোপালদা বসল। খুব গম্ভীর। এতো গম্ভীর তাকে তো আগে কখনও দেখিনি। ব্যাপার কি? আমরা এ ওর মুখের দিকে চাইছি।

এমন সময় গোকুল ফস্ করে জিজ্ঞেস করে বসল—আচ্ছা গোপালদা, তোমার খবর কি বলতো? ছিলে কোথায় এ্যাদ্দিন?

গোপালদা তার মুখের দিকে খানিক তাকিয়ে আরও গম্ভীর হয়ে বললে—চাঁদে।

চাঁদে মানে?—আমরা সবাই বলে উঠলাম।

চাঁদে মানে চাঁদে! ছিলাম চাঁদে, বলব হাসপাতালে? তোমাদের একটু 'ইয়ে' থাকা দরকার।

গোপালদা একটু রেগেই বলে ফেল্লে।

ওর কথা ছেড়ে দাও গোপালদা! এখন বলো তোমার জরুরী খবর—আমি বল্লাম।

তাই বলতেই তো এলাম ভাই—আর তোমরা কিনা শুরুতেই—যত্তো সব—

গোপালদা বিগড়ে গেলে ভারী মুস্কিল—কথা বলানো দায়। তাই মিনতি করে বল্লাম—বলে যাও তুমি গোপালদা আমরা কথাটি কইব না।

একটু কেসে নিয়ে গোপালদা শুরু করলো—

কবে, কোথায়, কখন, তা আমায় শুধিও না, বলতে পারব না আগেই বলে রাখছি—মানা আছে।

সেদিন বিকেলে একটু হাওয়া খেতে বেরিয়েছি বুঝলে—মাথাটা বড় টিপ্‌ টিপ্‌ করছিল! হঠাৎ দেখি কী—বেজায় ভীড়। আমার যেমন অভ্যাস, ভীড় দেখলেই নাক গলানো। নাক গলিয়ে শুধালাম—হ্যাঁ মশায়, হয়েছেটা কি? ভদ্রলোক শুধু বল্‌লে—চাঁদ।

এই একটু আগেই আমার মুখে চাঁদ শুনে তোমরা যেমন চমকে উঠেছিলে, আমিও ঠিক তেমনি চমকে উঠেছিলাম। চাঁদ কিরে বাবা!

শুধোলাম—কোথায়?

একটা আঙুল তুলে ভদ্রলোক বললেন—ওই ঘরে।

ঘরে চাঁদ?—বলে কিরে বাব্বা!

ঠেলেঠুলে ঘরের মধ্যে ঢুকতেই একটা লোক এসে আমায় ধরে ফেললে। তারপরে নিয়ে গেল আর একটা ঘরে।

সেখানে নিয়ে উল্টেপাল্টে সে কী পরীক্ষা! বলা নেই, কওয়া নেই—সে কী কাণ্ড! ওজন নিল, বুক পরীক্ষা হল, পেট টিপে দেখল, নাড়ী দেখল—আরও কতো! তারপরে লোকটি চুপিচুপি আমার কানে কানে বললে—ঠিক আছে, হয়ে যাবে। আমি বললাম—কি?

সে আমার হাতে এক টুকরো কাগজ গুঁজে দিয়ে বললে—পড়ে দেখুন।

পড়ে দেখি—আসছে কাল পৃথিবী থেকে প্রথম মহাকাশযান চন্দ্রলোকে যাচ্ছে মানুষ নিয়ে। স্বাস্থ্য পরীক্ষায়

পাশ করলে যে কেউ যেতে পারে। লোকটি জানালে আমি পাশ করেছি।

কেমন যেন ঠেকল। তবুও জিজ্ঞেস করলাম—খরচা? মানে, ইয়ে—ঐ টিকিট-ফিকিট বাবদ?

সে বললে—নিখরচা। ফুটো কড়িও লাগবে না, চাই কি, খোরাক শুদ্ধ।

বিনা পয়সায় চাঁদে বেড়ানো, যায় খোরাক সমেত! বলো তো ভাই, এমন লোভ কি সামলানো যায়? একটু ভাবলাম। তারপরে—কপাল ঠুকে রাজী হয়ে একটা কাগজে সই করে দিয়ে বাড়ী চলে এলাম।

গোকুল বল্লে—সে কী! ফস্ করে রাজী হয়ে গেলে? বাড়ীতে একবার জিজ্ঞেস্‌ও করলে না? করলে কী!

ভুরু কুঁচকে গোপালদা বল্লে—ঐ তো, ঐ তো তোমাদের দোষ! মেলা কথা বাড়িও না। যা বলছি শুনে যাও।

বাড়ী গিয়ে খুব ভাবলাম। কাউকে কিচ্ছু বললাম না। যাব কি যাব না, এই ভাবতে ভাবতে রাতটা কাটল। গোটা দুপুরটা বসে ভাবলাম। তারপরে হঠাৎ মন ঠিক করে ফেললাম। বাড়ীর সবাইকে বললাম—আমি কয়েক দিনের জন্ম একটু হাওয়া বদলাতে যাচ্ছি। আজ বিকেলেই বেরুব। এক বন্ধুর সঙ্গে যাচ্ছি কিনা, তাই সঙ্গে কিছুই নেবো না।

যথা সময়ে জায়গা মত হাজির হলাম।

দেখলাম আরও দুটি ভদ্রলোক বসে আছেন—তাঁরাও যাবেন।

একটু সাহস হল। গাড়ী দাঁড়িয়ে ছিল। আমাদের তোলা

হল সেই গাড়ীতে। সাঁ করে গাড়ী ছুটে চলল। যেখানটায় আমাদের নামানো হল—সে একটা মস্ত জায়গা। ঢোকার মুখেই বড় বড় করে লেখা—'কসমোপোর্ট' (Cosmoport)।

নকুল জিজ্ঞেস করলে—কসমোপোর্ট কি দাদা ?

একটু হেসে গোপালদা বললে—'এয়ার পোর্ট' কাকে বলে জানো তো ? ঐ যেখানে এরোপ্লেন ওঠানামা করে ? ঠিক তেমনি মহাশূন্য ভ্রমণের বেলায় কসমোপোর্ট। এটা অবশ্য আমিও জানতাম না। জিজ্ঞেস করে জেনেছি।

ঢুকে দেখি, সে এক ব্যাপার ! কতো বড় জায়গা জুড়ে সে যে কতো দালান—ছোট, বড়, উঁচু নীচু—কতো ! প্রতিটি বাড়ীর সামনে কী সুন্দর ফুলের বাগান, আর চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে মস্ত চওড়া সিমেন্ট কংক্রিটের সব রাস্তা। খুব চটপটে একটি লোক এগিয়ে এলেন। শুনলাম, তিনি এখানকার বড় ইঞ্জিনিয়ার। খুব খাতির করে আমাদের নিয়ে গেলেন একটা ঘরের মধ্যে।

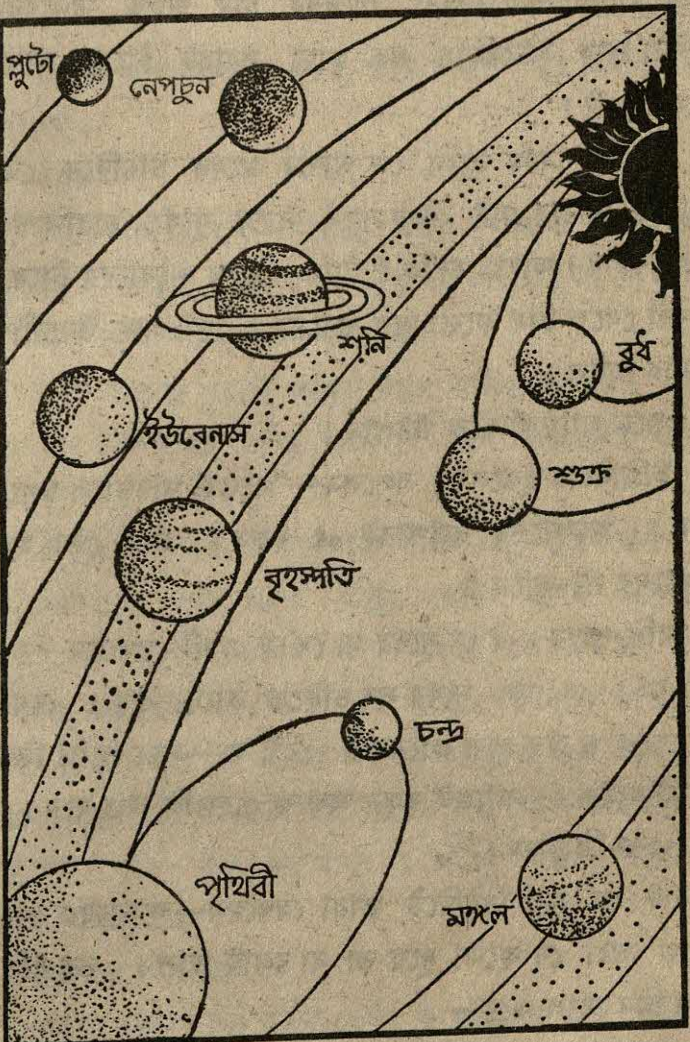
সেখানে ঢুকে যা দেখলাম—তা আর কী বলব তোমাদের !

দেখলাম গোটা আকাশটা যেন ঘরের ছাদে লট্‌কে রয়েছে।

ইঞ্জিনিয়ার বল্‌লেন—মহাশূন্যে যাত্রা করবার আগে আকাশ সম্বন্ধে কিছুটা আপনাদের জানা দরকার—তাই আপনাদের প্রথমেই এখানে এনেছি। এটাকে ইংরেজীতে বলে 'প্ল্যানেটারিয়াম' (Planetarium)। ঘরের মধ্যে আমরা একটা নকল আকাশ বানিয়ে রেখেছি—যাতে করে আকাশের হালচাল কিছুটা বুঝে নিতে পারেন !

জানেন তো, আমরা হলাম সৌরজগতের বাসিন্দা। অর্থাৎ সূর্যের সংসারে আমরা বাস করি।

ঐ দেখুন সূর্য! আর ঐ যে দেখছেন, সূর্যকে ঘিরে



ডিমের মত পথে নয়টা গোলা ডিগবাজী খাচ্ছে আর ছুটছে—ওদের বলে গ্রহ। আমাদের পৃথিবী একটা গ্রহ।

ঐ দেখুন পৃথিবী। ঐ যে পৃথিবীর চারধারে ছোট্ট একটা বলের মত কি ঘুরছে না—দেখছেন? ওটা হল আমাদের চাঁদ! চাঁদ হল উপগ্রহ, গ্রহের সন্তান। ভাল করে দেখুন—প্রত্যেকটা গ্রহেরই চাঁদ আছে দেখবেন। পৃথিবী আর ইউরেনাস গ্রহ ছাড়া সবারই চাঁদের সংখ্যা একের বেশী।

চাঁদের নিয়ম হলো, সে আপন গ্রহের চারদিকে তো ঘোরেই, আবার সেই গ্রহর সাথে সাথে সূর্যের চারদিকেও ঘুরে বেড়ায়। আমরা যাচ্ছি ঐ চাঁদে—মানে আমাদের চাঁদে। পৃথিবী থেকে চাঁদ কতো দূরে জানেন? দুই-লক্ষ উনচল্লিশ হাজার মাইল।

শুনে আমি আঁৎকে উঠলাম।

ইঞ্জিনিয়ার বুঝলেন। বললেন—"এতেই ঘাবড়ালে চলবে কেন? আকাশের ব্যাপারই এ রকম। চাঁদ তো হল আমাদের সব-কাছে।

বলি শুনুন—ঐ যে সূর্যের গা ঘেঁষে গ্রহটি দেখছেন—ওর নাম বুধ। ও হল সূর্যের সব চাইতে কাছের গ্রহ। অথচ সূর্য থেকে ও কত দূরে জানেন? বেশী না—মাত্র সাড়ে তিন কোটি মাইল! কাজেই বুঝুন অন্যান্য গ্রহগুলি কত দূরে।

এ-ও কিছু নয়।

ঐ যে সব মিটমিটে তারা দেখছেন—আমাদের কাছ থেকে ওরা যে কতো দূরে তা না বলাই ভাল। তবু বলি, বুঝে নিন ভাল করে—

আলো চলে সেকেণ্ডে একলক্ষ ছিআশী হাজার মাইল বেগে। এই বেগে ছুটেও সূর্যের আলো পৃথিবীতে পৌঁছতে

লাগে সাড়ে-আট মিনিট। আর এমন সব তারা আছে যার আলো পৃথিবীতে পৌঁছয় বহু লক্ষ বছরে। কাজেই চাঁদ তো একেবারে আমাদের হাতের গোড়ায়! সেই চাঁদেই আমরা যাব।

একটা কথা জিজ্ঞেস করব, স্যার? আমি খুব বিনীতভাবে বললাম।

বলুন—

চাঁদে আমরা আদপে যাচ্ছি কেন? আর ঐ যে সব গ্রহ দেখালেন, ওখানে যাওয়ার কোন চেষ্টা বা হচ্ছে না কেন?

বলি তবে—ইঞ্জিনিয়ার বললেন।

ঠিক চাঁদের জন্যই আমরা চাঁদে যাচ্ছি, তা নয়। এটা হল ঐ আকাশের রহস্য জানবার পথে আমাদের প্রথম ধাপ।

ঐ আকাশ চিরদিন মানুষকে পাগল করে রেখেছে। এ শুধু আজকের কথা নয়। মানুষ যেদিন প্রথম এসেছিল পৃথিবীতে সেইদিন থেকে তার সব চাইতে বেশী ভয় আর বিস্ময়ের বস্তু ছিল আকাশ। এই আকাশের দিকে তাকিয়ে, তার বিচিত্র রূপ দেখে সেই আদিম মানুষের মনে কতো না কল্পনা, কতো ছবি, কতো ভয়, কতো প্রশ্ন জেগে উঠেছিল—সেইদিন থেকে শুরু হয় মানুষের আকাশ জয়ের সাধনা—স্বর্গের সিঁড়ি রচনা।

রামায়ণ পড়েছেন?

লঙ্কার রাজা রাবণ নাকি চেষ্টা করেছিলেন স্বর্গে উঠবার সিঁড়ি বানাবেন। সত্য হোক, মিথ্যা হোক, ওর ভেতর দিয়ে আমরা দেখতে পাই মানুষের আকাশ জয়ের প্রথম

কল্পনা। সেই দিক দিয়ে আমরা হলাম রাবণের সগোত্র! রাগ করলেন?

রাগ আর কী করবো! জানলে, আমি থ' হয়ে শুনছি, আর গা আমার কাঁটা দিয়ে উঠছে! ইঞ্জিনিয়ার বলে চলেছেন—

বস্তুতঃ আকাশের দিকে তাকিয়ে মানুষের মনে যে আদিম প্রশ্ন জেগেছিল, তা থেকেই শুরু হয় মানুষের সকল রকম জ্ঞানের সাধনা! বিজ্ঞান-চর্চার মূল-ও ওখানে।

হাজার হাজার বছর আগে মানুষ খালি চোখে আকাশ পরীক্ষা করেছে। তাদের ক্লান্তিহীন সাধনার ফলে অনেক জেনেছি আমরা।

তারপরে এলেন পাডুয়ার (ইতালী) অঙ্কের মাষ্টার গ্যালিলিও। প্রায় চারশো বছর আগে তিনি এমন এক যন্ত্র বানিয়ে ফেললেন, যা দিয়ে বহু দূরের জিনিস হাতের গোড়ায় বড় করে দেখা যায়। নাম তার টেলিস্কোপ বা দূরবীন।

এই দূরবীন আবিষ্কার মানুষকে এক লাফে বহুদূর এগিয়ে নিয়ে গেল। দূরবীনের যুগ চলেছে বহুকাল—আজও চলছে। বড় বড় সব দূরবীন তৈরী হয়েছে—যাতে আজ লক্ষ লক্ষ মাইল দূরের জিনিসও চোখের গোড়ায় ধরা পড়ে।

আজ কিন্তু মানুষ দূরবীন ছেড়ে সরাসরি মহাকাশ জয় করবার সাধনায় নেমে পড়েছে।

কেন জানেন?

পৃথিবীকে যে আবহাওয়া ঘিরে রেখেছে, তার মধ্যে আছে ধূলিকণা—জলীয় বাষ্প, এইসব। দূরবীন তা ছোটোকে বড়ো করে দেখায়? তাই আকাশের দিকে দূরবীন তাক

করলে সেই ধূলিকণা, জলীয় বাষ্পকণা সব বড় বড় হয়ে দেখা দেয়। আর সেইগুলো আমাদের চোখের সামনে একখানা পর্দার মত ঝুলতে থাকে। তাই, যা দেখতে চাই, তা ঠিকমত দেখতে পাই না, দেখবার ভুল-ভ্রান্তি ঘটে। কাজেই ঠিক ঠিক খবর সব সময় পাওয়া যায় না। গবেষণায় গলদ থেকে যায়।

এখন পৃথিবীর এই আবহাওয়ার সীমানার বাইরে যদি কোন আস্তানা গাড়তে পারি, তবে কি চমৎকার হয় বলুন তো? সব পরিস্কার দেখবো—আরও কাছ থেকে দেখবো, ঠিকমত দেখবো, স্পষ্ট দেখবো। তাই তো আমাদের চাঁদে যাওয়ার চেষ্টা।

তাছাড়া আগেই বলেছি, চাঁদে যাওয়া হল আমাদের যাত্রাপথের প্রথম ধাপ। আমাদের আসল লক্ষ্য হল গ্রহ-গ্রহান্তরে ঘুরে বেড়ানো। অন্যসব গ্রহগুলো স্বচক্ষে দেখা। সে সব জায়গায় কোন প্রাণী আছে কিনা, মানুষ আছে কিনা, তাদের হালচাল কেমন, দরকার হলে সেখানে গিয়ে থাকা চলবে কিনা, সেইসব পরীক্ষা করা।

মঙ্গলগ্রহ নিয়ে তো মহা হৈ-চৈ।

একদল বলছে, সেখানে জল আছে আলবৎ, মানুষও আছে—আর একদল বলছে, নেই, আলবৎ নেই।

কেন মিছে ঝগড়া? গিয়ে দেখলেই তো হয় বাপু। কিন্তু সেই যাওয়া তো আর চাট্টেখানি কথা নয়, একটু পরেই তা বুঝবেন।

তাই আমরা ঠিক করেছি—পৃথিবী থেকে অতদূর একটানা যাওয়ার পথে একটা ষ্টেশান বানানো দরকার—

যেখানে থেমে বিশ্রাম নেয়া যাবে, তেল জ্বালানী নেয়া যাবে। বেরুবার আগে সেখানে বসে আকাশ পরীক্ষা করা যাবে। চাঁদকেই আমরা সেই ষ্টেশান করব।

তাছাড়া, আরও নানাভাবে আমরা চাঁদকে কাজে লাগাতে পারি। তবে তার আগে ওখানে পাকাপাকি ভাবে আস্তানা গড়ে তুলবার ব্যবস্থা করতে হবে।

চাঁদে হাওয়া নেই, জল নেই বলে প্রথমটায় অবশ্য খুব অসুবিধা হবে। কিন্তু হাওয়া জল বানাতে কতক্ষণ ?

তারপরে মানুষ সেখানে বাস করবে, পৃথিবীতে যেমন আমরা বাস করছি। চাঁদে বহু দামী ধাতু, দুষ্প্রাপ্য রাসায়নীক দ্রব্য পাওয়া যায়। ওখান থেকে মানুষ তা সংগ্রহ করে পৃথিবীতে পাঠাবে। বিরাট বিরাট কল কারখানা ওখানে গড়ে উঠবে। তা চালাতে বিদ্যুৎ লাগবে না— সূর্যের আলোতেই চলবে। ওখানে তো আর বাতাস নেই যে রোদকে মিইয়ে দেবে—ঝিমিয়ে দেবে—ছড়িয়ে দেবে— তাই ওখানে রোদ বড় সাংঘাতিক। যন্ত্রের সাহায্যে চাঁদের মানুষ সেই সৌরতেজ পৃথিবীতে পাঠাবে—তাতে আবার এখানের কল-কারখানা চলবে, আলো জ্বলবে—রান্না হবে।

আরও কত কিছু পাঠাবে মানুষ চাঁদ থেকে পৃথিবীতে !

আমি জিজ্ঞেস করলাম—পাঠাবে তো বলছেন, কিন্তু পাঠাবে কি করে ?

ইঞ্জিনিয়ার বললেন—যে ভাবে আপনাদের মহাকাশ-যানকে পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করা হয়েছে, সেই ভাবে।

চাঁদে যাওয়ার চাইতে ফিরে আসতে খরচা কম। কারণ

চাঁদের আকর্ষণ বা টান পৃথিবীর টানের ছয় ভাগের এক ভাগ মাত্র। কাজেই পৃথিবীর টান কাটিয়ে উপরে উঠতে যে শক্তি খরচ হবে, চাঁদ থেকে পৃথিবীতে ফিরে আসতে হবে তার ছয় ভাগের এক ভাগ মাত্র।

কাজেই দেখছেন, চাঁদে যাওয়া আমাদের কতো দরকার, কতো জরুরী!

জরুরী তো বটেই। কিন্তু, সে তো খুব সহজ কথা মনে হচ্ছে না—সময় লাগবে অনেক। বারে বারে মানুষকে যেতে হবে চাঁদে। তারপরে সব বুঝে-শুনে, ঠিক-ঠাক করে নিয়ে গুছিয়ে-টুছিয়ে বসতে···

বহুদিন, বহুবছর কেটে যাবে—তাই বলছেন তো—আর তদ্দিন কি হবে? তাই না?

—আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে ইঞ্জিনিয়ার বললেন। শুনুন তবে।

বসে নেই আমরা। এরি মধ্যে একটা কৃত্রিম মহাকাশ গবেষণাগার তৈরী করে পরীক্ষা করা হয়ে গেছে স্কাইলারের কথা শুনেছো তো?

সেই স্কাইলার নানা রকম জটিল যন্ত্রপাতি নিয়ে ওটা উঠেছিল আকাশ ছাড়িয়ে মহাকাশে। ওর ভেতরের আবহাওয়া তৈরী করা হয়েছিল একেবারে পৃথিবীর মতন করে, যাতে ওর মধ্যে মানুষ দিব্যি আরামে বসে কাজ-কর্ম করতে পারে। তারা গোটা আকাশটাকে তন্ন-তন্ন করে পরীক্ষা করেছিল, আর সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষার ফলাফল, ম্যাপ ফটো পাঠিয়ে দিয়েছিল পৃথিবীর মুল কেন্দ্রে। সূর্যের আলো থেকে তৈরী হচ্ছিল এর বিদ্যুৎ শক্তি আপনাতেই, বেশ চলছিল অনেক

দামী ও অজানা খবর মহাকাশ থেকে পৃথিবীতে চলে এসেছিল। তার পরে একদিন ওর যন্ত্রপাতিতে গোলমাল ধরা পড়ল। মূল কেন্দ্র



থেকে নির্দেশ পাঠিয়ে শূন্যে বসেই তা মেরামত করা হল। কিন্তু টিকলনা. ভেঙ্গে পড়ল টুকরো টুকরো হয়ে। তা ভাঙ্গুক গে। আবার আমরা বানাব আরো ভালো করে। আবার তুলব আকাশ ছাড়িয়ে মহাকাশে। কারণ আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানটার একটা স্টেশান আমাদের চাই-ই-চাই। চাঁদের বুকে গুছিয়ে বসবার আগে পর্যন্ত এই স্কাইল্যাবই skylab) হবে আমাদের স্কাই লেবরেটরী, মানে, মহাকাশ গবেষণাগার। বুঝলেন এবার? তাছাড়া আর একটা ব্যাপার আছে। গাঁয়ের যোগীর যেমন ভিক্ষা মেলে না, তেমনি চাঁদ এতো কাছে হওয়া সত্বেও আজ পর্যন্ত আমরা ওর বিশেষ কোন

খবর জোগাড় করতে পারিনি—অথচ কোটি মাইল দূরের যে নক্ষত্র তার নাড়ি নক্ষত্র প্রায় আমাদের জানা হয়ে গেছে।

এর কারণ অবশ্য আছে। চাঁদের যদি নিজের আলো থাকতো তবে এমন হতো না। চাঁদের 'আলো' যাকে আমরা বলি, সে হচ্ছে আসলে সূর্যের আলো, ঠিক্‌রে পড়েছে চাঁদের গায়ে। নক্ষত্রদের পরীক্ষা করে মানুষ তাদের ঘরের খবর জেনেছে। কারণ, ও-আলো ওদের নিজেদের আলো!

চাঁদের একটা পিঠ চিরদিন অন্ধকার, তা জানেন তো? সে পিঠটা আমরা দেখতে পাই না কখনও। সেখানকার খবরও তো জানতে হবে?

কাজেই এবার মোটামুটি বুঝলেন, কেন চাঁদে যাওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে।

আপনারাই হলেন কিন্তু সেই মহাকাশ অভিযানের প্রথম যাত্রী।

এর আগেও আমরা চাঁদে মহাকাশযান পাঠিয়েছি—তবে মানুষ যায়নি। কল-কবজার এমন ব্যবস্থা করা হয়েছিল যাতে ঐ মহাকাশযানগুলি আপনাতেই চলতে পারে, আপনাতেই ফটো তুলে পৃথিবীতে পাঠাতে পারে, আপনাতেই ওখানকার সমস্ত খবর পৃথিবীতে পৌঁছতে পারে। সেই মহাকাশযান-গুলোকে কিন্তু ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করা হয়নি। তারা কাজ শেষ করে জ্বলে পুড়ে শেষ হয়ে গেছে।

এই হল আমাদের প্রথম যন্ত্র যা মানুষে চালাবে, মানুষ বয়ে নিয়ে যাবে, আবার তাদের নিয়ে ফিরে আসবে।

মনে রাখবেন, সমস্ত পৃথিবী আপনাদের দিকে তাকিয়ে থাকবে—আপনারা স্বর্গ জয় করতে যাচ্ছেন—।

জানলে ভাই, আমি যেন কেমন হয়ে গেলাম। মনে হল আমি আর তোমাদের গোপালদা নই। আদিম পৃথিবীর সেই প্রথম মানুষ থেকে আজকের মানুষ পর্যন্ত সব যেন আমার মধ্যে ভীড় করে দাঁড়িয়েছে। রাবণ রাজা যেন তাঁর দশ মুখ, আর বিশ চোখ দিয়ে আমায় আশীর্বাদ করছেন। যেন বলছেন—বন্ধু, ওঠো, জাগো। আমার যা স্বপ্ন ছিল, তা তুমি সার্থক কর। আমার স্বর্গের সিঁড়ি সম্পূর্ণ কর। আমি পারিনি, তুমি পারবে। মানুষ তোমাকে ডাকছে। পৃথিবীর সমস্ত মানুষের হয়ে তুমি জাগো,—ওঠো,—এগিয়ে চলো—

তাহলে, চলুন এবার, আমরা রকেটের কাছে যাই—

বহুদূর হতে যেন কার কণ্ঠস্বর শুনলাম!

ইঞ্জিনিয়ার কথা বলছেন। কি আশ্চর্য—এত কাছে তিনি, অথচ কথাগুলো যেন কত দূর থেকে ভেসে আসছে! মাথাটা বড় ঝিম্ ঝিম্ করছিল—বুঝলে ভাই—কেমন যেন 'ইয়ে' হয়ে গিয়েছিলাম।

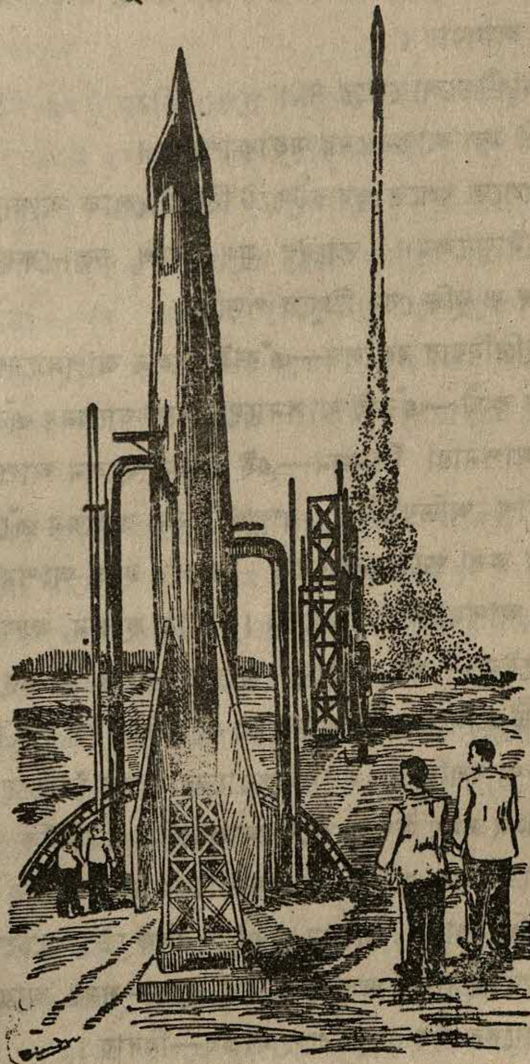
এতক্ষণ সেই 'প্ল্যানেটারিয়াম' মানে, 'আকাশ-ঘরের' মধ্যে বসেই কথা হচ্ছিল।

বেরুতে বেরুতে ইঞ্জিনিয়ার ঘড়ি দেখলেন, বললেন—আর আধঘণ্টা—তারপরেই আপনারা পৃথিবী ছেড়ে রওনা হবেন। চলুন, যাই। ঐ দেখুন মহাকাশযান—

আরে ভাই বলব কী তোমাদের—সে কী ব্যাপার!

গঙ্গার ধারে কলের চিমনি দেখেছ? তার চাইতে মোটা—তার চাইতেও উঁচু—বিরাট বিরাট কি যেন সব—চারদিকে লোহার খাঁচা। মাথাগুলো সেই ছুঁচো-পানা চুরোট গুলোর মত ছুঁচ্‌লো।

গল্‌দা-চিংড়ির ল্যাজের ডগায় যেমন-ধারা পাখ্‌না মতন থাকে, তেমনি-ধারা পাখ্‌না আছে এরও ল্যাজের দিকে—দেখতে ওগুলো ত্রিভুজের মতো। খুব শক্ত সিমেণ্ট-কংক্রিটের



চাতালের উপর খুব শক্ত করে আঁটা। কতগুলির দেখলাম আবার মাথার দিকেও পাখ্‌না আছে।

ইঞ্জিনিয়ার বল্‌লেন—এই যে সব মহাকাশযান দেখছেন, এর সবগুলোই কিন্তু ফিরে আসবার রকেট নয়। যে গুলোর ডগায় ল্যাজে, দুদিকেই ডানা দেখছেন, সেই গুলোই শুধু ফিরে আসবার।

বাকীগুলো ফেরে না।

ঐ হল আপনাদের মহাকাশযান।

বলতে বলতে খুব চট্‌পটে তিনটি লোক আমাদের সামনে এসে দাঁড়ালেন। তাদের মুখ-চোখে, চলা-ফেরায়, স্বাস্থ্য, আনন্দ ও বুদ্ধি যেন ঠিক্‌রে পড়ছে।

ইঞ্জিনিয়ার বল্‌লেন—এঁরাই হলেন আপনাদের মহাকাশযানের কর্মী—এঁরাই আপনাদের নিয়ে যাবেন। এঁরা তিনজন, আর আপনারা তিনজন—এই ছ'জন হলেন আপনারা প্রথম মহাকাশ অভিযাত্রী। সম্পূর্ণ নির্ভর করবেন এঁদের উপর। এঁদের কথা শুনে চলবেন। দরকার হলে আপন প্রাণ দিয়ে এঁরা আপনাদের বাঁচাবেন। ইনি হলেন মহাকাশযানের ক্যাপটেন। সব চাইতে স্বাস্থ্যবান ও সুন্দর চেহারার লোকটি এগিয়ে এসে আমাদের হাত ধরে সে কি ঝাঁকুনি!

কথা বলছিলাম মহাকাশযানের কাছে দাঁড়িয়ে।

এমন সময় উপর থেকে আলমারির মতন কি একটা ফস্‌ ফস্‌ করে নেমে এলো—তার মাথায় লোহার তারের দড়ি বাঁধা।

ইঞ্জিনিয়ার বল্‌লেন—এই লিফ্‌টে চেপে এবার আপনাদের ওই ডগায় উঠতে হবে—সময় আর খুব নেই। আপনাদের পথ চেয়ে বসে থাকব—বিদায়।

ব্যথা ভরা চোখে তিনি আমাদের দিকে চেয়ে রইলেন—লিফ্‌ট উপরে উঠতে লাগল!

উঠতে উঠতে লিফ্‌ট থামল এসে মহাকাশযানের সেই ছুঁচলো মাথায় বারান্দার মত একটা জায়গায়।

আমি ঘাবড়ে গিয়ে বল্‌লাম—এটা কি হল? সব ছেড়ে একেবারে ডগায়?

ক্যাপটেন একটু মুচকি হেসে বল্‌লেন—চাঁদে গিয়ে যখন পৌঁছবেন না, তখন দেখবেন এর চৌদ্দআনাই নেই, আছে শুধু এই ডগাটুকু। এটাই হল স্পেস শিপ (Space Ship), মানে মহাকাশযান। আর একে ঠেলে তুলবে যে, অর্থাৎ যে চোদ্দআনা শেষ অবধি থাকবেনা, সেটাকে বলে রকেট (Rocket)! আপনাদের রকেটটা হল তিন পর্যায়ের রকেট। ইংরাজীতে 'থ্রি স্টেজ রকেট' (Three Stage Rocket)।

এর তিনটি ভাগ আছে। প্রতিটি ভাগে আলাদাভাবে ইঞ্জিন বসানো আছে। এর ওজন কতো শুনবেন?

গোটাটার মোট ওজন হল প্রায় পঁচিশ হাজার তিনশো আশী মন। এই মোট ওজনের মধ্যে প্রায় একুশ হাজার নয়শো আঠাত্তর মন হল তেল-জ্বালানী, আর বাকীটা, মানে তিন হাজার চারশো দুই মন হল রকেট, তার যন্ত্রপাতি আর যাত্রীদের নিয়ে মোট ওজন।

এ-তো জ্বালানী লাগে? আমি বল্‌লাম।

লাগবে না? এযে কী ব্যাপার একটু পরেই টের পাবেন-'খন। ছাড়বার সময়, আর তার পরে কয়েক মিনিট প্রতি সেকেণ্ডে দু'শো মনের উপরে জ্বালানী পুড়বে।—লাগবে না? এতো জ্বালানী লাগে বলেই রকেটটাকে আর তার যন্ত্রপাতি গুলোকে যতদূর সম্ভব হালকা ধাতুতে তৈরী করতে হয়েছে!

এটা একদিনে সম্ভব হয়নি। বহু যুগ ধরে বহু বিজ্ঞানীর অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে হয়েছে। তা না হলে মহাকাশ অভিযানের কথা ভাবাই যেত না।

এখন ঐ যে তিনটে ভাগের কথা বলেছি, প্রথমে চলবে শুধু নীচের বড় ভাগটার ইঞ্জিন,—সাতটা ইঞ্জিন রয়েছে ওখানে। এক সঙ্গে গর্জে উঠবে তারা, আর রকেট উঠতে থাকবে।

উঠতে উঠতে জ্বালানী পুড়তে থাকবে সেকেণ্ডে—ঐ যে বললুম—দু'শো মনের মতো। এতে ক্রমশঃই রকেটের ওজন কমতে থাকবে।

এই ভাবে খানিক পরে প্রথম ভাগটার কাজ শেষ হয়ে যাবে—ওটা আপনাতেই খসে গিয়ে প্যারাস্যুটে চেপে পৃথিবীতে নেমে আসবে—আর সঙ্গে সঙ্গে চালু হয়ে উঠবে দ্বিতীয় ভাগের ইঞ্জিন।

তখন রকেটটার ওজন দাঁড়াবে কতো বলুন তো?

মাত্র চার হাজার একশো পঁচাশী মন। দ্বিতীয় ভাগের সাতটা ইঞ্জিন গর্জে উঠবে সঙ্গে সঙ্গে—আর রকেট ছুটে চলবে দূরে—আরও দূরে—বহু দূরে।

যতোই চলবে, ততোই জ্বালানী পুড়বে—আর ততোই ওজন কমে আসবে।

তারপরে রকেট পৌঁছবে এমন একটা জায়গায়, যেখানটায় পৃথিবীর টান আর চাঁদের টান মুখোমুখি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখানটায় এসে দ্বিতীয় ভাগটাও খসে যাবে।

তখন এই ডানা-ওলা ডগাটুকুই কেবল চাঁদের টানে চাঁদের দিকে এগুতে থাকবে। তখন এর ওজন কতো দাঁড়াবে

জানেন? মাত্র পাঁচশো চুরানব্বুই মন। আর চাঁদে গিয়ে যখন পৌঁছবে, তখন ওর ওজম দাঁড়াবে ঐ পাঁচশো চুরানব্বুই মনের ছয় ভাগের একভাগ মাত্র।

ফিরবার সময় আমরা এতে করেই ফিরব।

সে কী? তা হবে কেন? পৃথিবীতে ফেরার পরেও তাহলে ওর ওজন ঐ ছয়ভাগের একভাগ থাকবে নাকি?—আমি জিজ্ঞেস করলাম।

ক্যাপটেন বললেন—বুঝলেন না? চাঁদের ওজন পৃথিবীর ছয়ভাগের এক ভাগ যে—তাই তো এমন। এই সৃষ্টিতে যা কিছু দেখছেন, সবাই সবাইকে টানছে। বিজ্ঞানী ভাষায় একে বলে মহাকর্ষ। এই টান আমরা দেখতে পাই না, বুঝতে পারি। এই টানাটানির ব্যবস্থা এমন নিখুঁত যে তার ফলে কেউ কারুর পথ ছেড়ে একচুল নড়তে পারে না! তাই না এই বিশ্ব-সংসার এক নিয়মে বাঁধা।

এখন 'ওজন' যাকে বলি, সে হচ্ছে এই টানের জোরের মাপ। অর্থাৎ যে জিনিস যতো বেশী টান খাচ্ছে ওজন তার ততো বেশী। এই টানের আবার বেশী কম হয় জিনিসের বস্তু আর দূরত্বের অনুপাতে।

'বস্তু' কাকে বলে বুঝলেন?

দেখতে বড় হলেই বা মোটা হলেই তার বস্তু বেশী হবে এমন কথা নেই। একমন তুলা আর এক-মনি একটা বাটখারা এ দুটোর চেহারা কি এক? কাজেই দেখছেন ঐটুকু বাটখারা যে ধাতুতে তৈরী তার বস্তু তুলার বস্তুর চাইতে কতো বেশী।

বুঝলেন তো এবার?

দেখছেন তা হলে,—পৃথিবীতে ফিরবার পরে রকেটের

শেষ অংশটুকুর ওজন পৃথিবীর টানের অনুপাতেই হবে—চাঁদের টান অনুসারে হতে যাবে কেন?

আপনি এখন একবার নিজের ওজন নিন, চাঁদে গিয়ে একবার নিন, আবার ফিরে এসে নিন—বুঝবেন তাহলে।

সব শুনেটুনে একদম ঘাবড়ে গেলাম।

জিজ্ঞেস করলাম—"দেখুন স্যার, কিছু মনে না করেন তো একটা কথা বলি। ক'দিনে বাড়ী ফিরতে পারব, বলুন না?

উত্তরে যা পেলাম, তাতে বুঝলে ভাই, গায়ের রক্ত হিম হয়ে যায় আর কি!

ফিরতে আদপে আমরা পারব কিনা বলতে পাচ্ছিনা। তবে ক'দিনে ফেরা যেতে পারে, সেটা বলতে পারি। এই ধরুন, যেতে তিন দিন, ফিরতে তিন দিন, আর ধরুন, ওখানে থাকব এই একদিন—এই সাতদিন। তবে সব কিছুই নির্ভর করছে রকেটের 'স্পিড্', মানে গতি বেগের উপর।

এর চাইতে ঢের কম সময়েও যাতাযাত করা যায়। তবে তাতে বিপদ অনেক।

জানেন তো, আমাদের এই পৃথিবীটা বাতাসের কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পৃথিবী ছাড়িয়ে প্রায় চারশো মাইল উপর পর্যন্ত বাতাস আছে। কিন্তু এতে এই বুঝায়না যে, এই সমস্ত জায়গার বাতাস একই অবস্থায় আছে। অর্থাৎ চারশো মাইল উপরের বাতাস আর এই কসমোপোর্টের বাতাস একই রকম।

দালানের যেমন একতলা, দুতলা, তিনতলা ইত্যাদি থাকে, বাতাসেরও তেমনি কতগুলো তলা, বা স্তর আছে।

বাতাস পৃথিবীর যতো কাছে, ততোই ঘন আর যতো দূরে, ততোই হালকা। বাতাস যতো ঘন হবে—চাপ তার ততোই বেশী হবে!

বাতাসের চাপ মানে কি জানেন?

এক ইঞ্চি লম্বা ও এক ইঞ্চি চওড়া জায়গায় ঘন বাতাসের চাপ হল সাড়ে সাত সের।

অবশ্য, যতোই উপরে ওঠা যায়, ততোই এই চাপটা কম আসে!

পৃথিবী থেকে আট দশ মাইল পর্যন্ত হল বাতাসের প্রথম স্তর। একে বলে ক্ষুব্ধ স্তর। এর মধ্যেই তার যতো ছুটাছুটি, দাপাদাপি, আর ঝড়-ঝাপ্‌টার তাণ্ডব। এর পরে প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশ মাইল পর্যন্ত শান্ত স্তর। এখানকার বাতাসে দাপাদাপি নেই। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কী শীত, কী শীত সেখানে! এর উপরের স্তর হল নানা রকম গ্যাসের স্তর। এখানকার বাতাস প্রচণ্ড বিদ্যুৎ শক্তিতে ভরে আছে। এখানে কিন্তু ভীষণ গরম। এখানকার খবর সঠিক এখনও পাইনি আমরা,—এবার বোধ হয় পাব।

কাজেই বুঝতে পারছেন, প্রথম স্তরের বাতাসের চাপ কাটিয়ে উঠতে কী ব্যাপারটাই না ঘটবে!

এখানে দুটো সমস্যা রয়েছে আমাদের সামনে।

বাতাসের চাপ কাটিয়ে উঠতে যতো দেরী হবে—জ্বালানী ততো বেশী পুড়বে। তার মানে—খরচ বাড়বে। কাজেই যতো জোরে ওঠা যায়, খরচ ততোই কম! কিন্তু মুস্কিল হল, খরচ বাঁচাতে গিয়ে প্রাণ বাঁচানো সম্ভব নাও হতে পারে। রকেটের বেগ যতো বেশী হবে বাতাসের চাপ

ততোই বেড়ে যাবে, আর তার ফলে রকেট জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যেতে পারে।

তাছাড়া উঠবার মুখে কয়েক মিনিট দেখবেন আমাদের ওজন কতো বেড়ে যায়। বেগ যতো বাড়বে—যাত্রীদের ওজন ততো বাড়বে। এই বাড়তি ওজন মানুষ যা সহ্য করতে পারে, তার একটা সীমা আছে। তাহল, তার নিজ ওজনের প্রায় চার গুণ। এতেই দেখবেন দম ফেটে মরবার হাল হয়ে উঠবে।

এর চাইতে বেগ যদি আরও বাড়ে, তবে আর বলতে হবে না—নাক মুখ দিয়ে রক্ত বেরুবে—চোখ ঠিকরে ছুটে যাবে—হৃদপিণ্ড, ফুস্‌ফুস্ ফেটে যাবে—আরো কতো কী হতে পারে!

ওদিকে আবার স্পিড্ কম দিলে তেল পুড়বে এতো বেশী যে সে খরচ কুলিয়ে ওঠা দায় হবে।

কাজেই আমরা এমন একটা মাঝামাঝি স্পিডে যাব, যাতে দুদিকই রক্ষা হয়। অবশ্য এতে ওজন বেড়ে যাবে প্রায় তিন-চার গুণের মতো—তবে একটু কষ্ট করে তা আপনারা সামলে নিতে পারবেন আশা করি।

আমি বল্‌লাম—স্পিড্‌টা কতো হবে, বলুন তো শুনি? ঐ যে এরোপ্লেন চলে, ওর চাইতে কতো বেশী?

ক্যাপটেন হেসে ফেল্‌লেন, বল্‌লেন—এতো করে এই বুঝলেন?

মনে রাখবেন, পৃথিবীর টান কাটিয়ে মহাশূন্যে বেরিয়ে যেতে হবে। এতে যে স্পিড্‌টা আমরা দেব—তা হল ঘণ্টায় প্রায় পঁচিশ হাজার মাইলের মতো। কোথায় আপনার

এরোপ্লেন,—বলুন তো? তবে এও ঠিক, যে আগাগোড়া পথটাতেই এই স্পিড্ থাকবেনা।

আমি কিছুই বুঝলাম না। বল্লাম—থাকবে না কেন? কমিয়ে দেবেন নাকি পরে?

ভদ্রলোক একটু হতাশ ভাবে বল্লেন—মুস্কিল হল দেখছি! এসব কথা আগেই আপনার জেনে আসা উচিত ছিল। যাক্গে—আকাশে ঢিল ছুঁড়েছেন কখনো?

আজ্ঞে হ্যাঁ, ছুঁড়েছি—কতো ছুঁড়েছি, সেই ছোট বেলা—

তবে তো নিশ্চয়ই ঢিলের গতি লক্ষ্য করেছেন।

প্রথম দিকটায় ঢিলটা বেশ জোরে উপরে উঠতে থাকে —তাই না? অর্থাৎ আপনার হাতের শক্তি ঢিলের গতি-শক্তিতে রূপ নেয়। সেই শক্তি পৃথিবীর টানকে কিছুক্ষণের জন্য হারিয়ে দিয়ে ঢিলটাকে উপর দিকে ঠেলে নিয়ে চলে।

কিন্তু শুরু থেকেই ঢিলটা বাধা পায়,—দুরকম বাধা। এক হল পৃথিবীর টান, আর হল বাতাসের চাপ। এই দুটোকে যতোই সে কাটাতে চায়, ততোই তার বেগ কমে আসে। তারপরে একটা জায়গায় গিয়ে খুব অল্প সময়ের জন্য ওটা থেমে যায়। তারপরে ওটা আবার নামতে শুরু করে পৃথিবীর দিকে। তুলবার সময় যেমন হাতের জোরের দরকার হয়েছিল, নামবার সময় কিন্তু তা দরকার হয় না। পৃথিবীর টানে আপনাতেই নামতে থাকে। যতোই নামে, গতিবেগ ততোই বাড়তে থাকে। তারপরে ওটা পৃথিবীর উপর আছাড় খেয়ে পড়ে।

এখানেও সেই কথা।

টিলটার চাইতে রকেটটা তো কতো বড়ো! ওর বস্তুও যেমন অনেক বেশী, ওজনও তেমনি অনেক বেশী। কাজেই পৃথিবীর টান কাটিয়ে টানের সীমানার বাইর পর্যন্ত পৌঁছুতে শুরুতে ওর প্রচণ্ড স্পিড্ দরকার হবে। সেই স্পিড্টা এমন ভাবে হিসাব করা হয়েছে, যাতে দুকূল রক্ষা হয়। অর্থাৎ রকেট জ্বলে না ওঠে, আমরা বাড়তি ওজনের চাপে মরে না যাই, আর কমতে কমতেও যেন স্পিড্টা শেষ অবধি আমাদের চাঁদের টানের সীমানার গায়ে পৌঁছে দিতে পারে।

একবার সেখানটায় পৌঁছতে পারলে আর পায় কে?

এবারে বুঝলেন তো, গোটা পথটায় সমান স্পিড্ থাকে না কেন?

তা হলে মোটের ওপর ইঞ্জিন চলবে কতক্ষণ?

খুব সামান্য—এই আট মিনিটের মতো। তার মধ্যে আবার ছয় মিনিট উঠবার সময়, আর দুই মিনিট চাঁদে নামবার সময়।

হঠাৎ গণেশ বলে উঠল—দেখ গোপালদা, এতক্ষণ কিচ্ছুটি বলিনি, মুখটি বুঁজে চুপটি করে শুনছিলাম। এবার আর মুখ না খুলে পারছি না। একটু বুঝে-সুজে কথা কয়ো —দু'লক্ষ উনচল্লিশ হাজার মাইল পথ চলতে ইঞ্জিন ঘুরবে মাত্র আট মিনিট? —দুৎ, ইয়ের আর জায়গা পাওনি?

দেখ, মেলা বকিয়ও না বলছি। বোঝনা-সোজনা কেবল ইয়ের মত কথা কও। ঠিক ওকথাই আমিও ক্যাপটেনকে শুধিয়েছিলাম, জানলে? তিনি কি বলেছিলেন, তাই শোনো—

মিনিট ছয় চলবার পরে আমরা এমন একটা জায়গায় এসে

পড়ব, যেখানে বাতাসের চাপ খুব কম—পৃথিবীর টানও। ঘণ্টায় পঁচিশ হাজার মাইল বেগের ধাক্কা নিয়ে রকেটটা এমন জায়গায় এসে পৌঁছবে যেখানে তার ইঞ্জিন আর না ঘুরলেও চলে। চিল যেমন খানিক উড়ে ডানা মেলে বাতাসে ভাসতে থাকে, রকেটটাও সেই হালকা হাওয়া আর পৃথিবীর সামান্য টান কাটিয়ে এমনিতেই ভেসে ভেসে এগুবে।

এখানটায়ই পৃথিবীর আবহাওয়া শেষ আর মহাশূন্যের শুরু।

অবশ্য ঠিক কোনখানটায় যে এই অবস্থাটা আসে তা বলা কঠিন। আবহাওয়াটা শেষ হতে হতে যেন মহাশূন্যে মিশে গেছে। ঠিক কোনো লাইন টেনে বলা যায় না—এই শেষ হল—আর এই শুরু হল। তবে প্রায় বারো থেকে কুড়ি মাইল উপরে গেলেই এই অবস্থাটা টের পাওয়া যায়। তারপরে ষাট-পঁয়ষট্টি মাইল পৌঁছলেই আসল মহাশূন্যের নাগাল পাওয়া যায়।

এইভাবে ভাসতে ভাসতে আমরা এগুতে থাকব।

তারপরে হবে এক মজার ব্যাপার।

এমন একটা জায়গায় এসে আমরা পৌঁছব, যেখানটায় চাঁদের টান সবে শুরু হয়েছে। একদিকে টানছে পৃথিবী—আর একদিকে চাঁদ। সেখানটায় দুটো টানই সমান। এ অবস্থায় রকেটের যদি নিজের কোনো গতিবেগ না থাকে, তবে সে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়বে,—নড়বেনা-চড়বেনা। কিন্তু আমাদের রকেট তো নিজ গতিবেগে এগিয়ে চলবে। তাই এই জায়গটা একটু কাটাতে পারলেই,—ব্যস্। তখন চাঁদের টানের জোর হবে বেশী। কারণ এ জায়গাটা পৃথিবী থেকে

বহুদূরে—আর চাঁদের কাছে,—প্রায় চব্বিশ হাজার মাইলের মধ্যে। তখন আর কী! চাঁদই আমাদের টেনে নিয়ে যাবে।

তবে এখানেও বিপদ আছে।

রকেট যদি টানের চোটে শুধু নামতেই থাকে তবে শেষ পর্যন্ত চাঁদের গায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গুঁড়িয়ে যেতে পারে। তাই আবার এঞ্জিন চালাতে হবে। এবার এগুতে নয় কিন্তু —ব্রেক কসতে। যাতে ধীরে ধীরে আলগোছে গিয়ে চাঁদের গায়ে নামা যায়। নইলে সর্বনাশ!

এমন সময় পাইলট এসে জানালেন—আর পাঁচ মিনিট বাকী।

ক্যাপটেন আমাদের নিয়ে ভেতরে ঢুকলেন।

ঢুকতেই দরজা খুব শক্ত হয়ে বন্ধ হয়ে গেল। মনটা কেমন করে উঠল! এই কামরার মধ্যে যেতে-আসতে সাতটাদিন বন্ধ থাকতে হবে! কে জানে, কোনো দিন আর বেরুতে পারব কিনা!

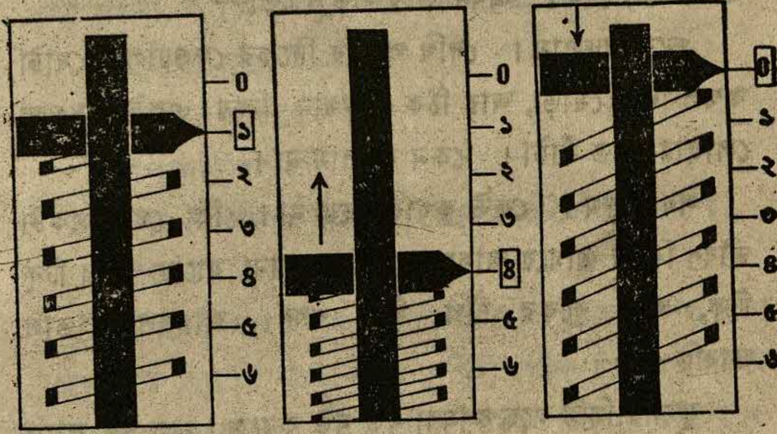
* * *

তাকিয়ে দেখি, কেবিনের মধ্যে তাকে তাকে বিছানা পাতা—দেয়াল ঘেসে জানলার পাশে। এদিকে তিনখানা, ওদিকে তিনখানা—একটার উপর আর একটা। দিব্যি স্প্রিং অাঁটা বিছানা। দড়ির সিঁড়ি বেয়ে বিছানায় উঠতে হয়। দেওয়ালে ঝল্‌মল্‌ করছে আলো। কত রকম যন্ত্রপাতি রয়েছে দেওয়ালের গায়ে, একটা ঘড়িও আছে। পাইলটের কেবিন রয়েছে আমাদের মাথার উপরে। ঘড়িটার কাছে দেখলাম একটা যন্ত্র—তার গায়ে শূন্য থেকে ছয় পর্যন্ত লেখা

আছে পরপর, আর ঘড়ির কাঁটার মতো একটা কাঁটা এক-এর গায়ে দাঁড়িয়ে আছে।

ভাবছি, এটা আবার কী ?

এমন সময় কোথা থেকে কে বলে উঠল—শুয়ে পড়ুন, শুয়ে পড়ুন। চিৎ বা উপুর হয়ে শোবেন। টান্ টান্ হয়ে শোবেন। আর দুই মিনিট—



ঐ যে কাঁটাওলা যন্ত্রটা দেখছেন, ওটার দিকে লক্ষ্য রাখবেন যেন সবসময়। এখন ওর কাঁটা রয়েছে এক-এ। তার মানে, রকেটটা এখনও স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সমান বেগে যখন রকেট চলবে তখনও কাঁটা এক-এ থাকবে, দেখবেন। তখন বুঝবেন পৃথিবীতে আপনার যে ওজন ছিল এখনও তাই আছে। কোন অসুবিধা টের পাবেন না। রকেট যখন ছাড়বে তখনই দেখবেন কাঁটাটা নীচের দিকে দুই, তিন, করে নামছে। চার পর্যন্ত নামতে পারে। সাথে সাথে দারুণ দম-বন্ধ ভাব বোধ করবেন। তখন বুঝবেন যতো সংখ্যায় কাঁটা রয়েছে, ওজন আপনার ততোগুণ বেড়ে গেছে।

অবশ্য মাত্র মিনিট তিন-চার এই অবস্থাটা থাকবে। আস্তে আস্তে কাঁটা আবার এক-এ উঠে আসবে—আপনারাও আবার আরাম বোধ করবেন।

এইভাবে কিছু সময় চলবার পরে দেখবেন কাঁটাটা এক ছাড়িয়ে শূন্যের দিকে উঠছে। তখন কিন্তু খুব সাবধান! আপনাদের কোন ওজনই থাকবে না কিন্তু তখন—বিতিকিচ্ছির সব ব্যাপার ঘটতে থাকবে। কি করতে হবে, তখন বলে দেব। এখন শুয়ে পড়ুন তো—

শুয়ে পড়লাম। দেখি পায়ের দিকের দেওয়ালটা মোটা কম্বল দিয়ে মোড়া, আর ঠিক মাঝখান দিয়ে একটা চওড়া লোহার পাত সাঁটা। কেন বুঝলাম না।

সব নিঝুম। কেউ কথা কইছে না। কি যেন একটা ভীষণ বিপদ এগিয়ে আসছে! শুধু শোনা যাচ্ছে ঘড়ির টিক্ টিক্, আর বুকের টিপ্ টিপ্ শব্দ। আকাশ পাতাল ভাবছি·········

ফুলের মিষ্টি গন্ধে কামরা মউ মউ করছে। ফুল-টুল আছে বোধ হয় কোথাও······

হঠাৎ সে কী শব্দ, আর সে কী ঝাঁকুনি! থর থর করে সব কেঁপে উঠল। বুঝলাম, এবার আমাদের যাত্রা শুরু হল।

কিন্তু এ কী?

কে আমার গলা টিপে ধরেছে? কে আমার বুকে পাথর চাপিয়ে দিয়েছে? শ্বাস বন্ধ হয়ে এলো যে! চোখের পাতা এতো ভারী কেন?

—মাগো!······

মনে পড়ল সেই যন্ত্রটার কথা।

দেখি, কাঁটাটা এরই মধ্যে চার-এর গায়ে পৌঁছে গেছে। বুঝলাম, ওজন চারগুণ বেড়ে গেছে। বাঁচবো তো? উঃ, কী গরম! উঃ!—

এমন সময় কোথা থেকে বসন্তের ফুরফুরে মিষ্টি বাতাস এসে সব জুড়িয়ে দিল। আঃ বাঁচলাম!—

বসন্তের বাতাস? সে আবার এলো কোত্থেকে? গোপালদা, কাব্যি একটু বেশী হয়ে যাচ্ছে না কি?

—গোবরা বলে উঠল।

মহামুস্কিল হল দেখছি—

গোপালদা বল্‌লে।

এইসব বিজ্ঞানের ব্যাপার তোমাদের বোঝান দায়!

ব্যাপারটা কি হল শোনো—

কেবিনের মধ্যে বাইরের বাতাস ঢুকবার পথ তো একেবারে বন্ধ। যাত্রাকালে পৃথিবী থেকে বাতাস বোঝাই করে আনা হয়েছিল। কিন্তু তা কতোক্ষণ? আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাসে সেই বাতাসের অক্‌সিজেনটুকু যদি ফুরিয়ে যায়—তবে তো মরণ। আমাদের ছেড়ে-দেয়া কার্বন-ডাইঅক্‌সাইডে আমরাই তো জ্বলে-পুড়ে মরব। কাজেই গাছপালা যে নিয়মে কার্বন-ডাই-অক্‌সাইড্ শুষে নিয়ে অক্‌সিজেন ফিরিয়ে দেয়, সেই ব্যবস্থা করা হয়েছে কেবিনের মধ্যে।

কাজেই দেখছ, একই বাতাস ঘুরে-ফিরে চলছে। আর আমাদের মন মেজাজ ঠিক রাখবার জন্য তার সাথে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে একরকম মিষ্টি গন্ধ।

পরিষ্কার? যত্তো সব!—

আবার এমনি মজা, রকেট তেতে উঠলেই বাতাস ঠাণ্ডা হয়ে যায়, আবার রকেট ঠাণ্ডা হলেই বাতাস তেতে ওঠে। মোট কথা,—শ্বাস-টাস বন্ধ না হলে দিব্যি আরাম রে ভাই!

মিনিট চার হল আমরা চলেছি। দমবন্ধ ভাবটা এবার কমে এসেছে।

ওদিকে সেই যন্ত্রের কাঁটাটাও আবার এক-এর দিকে উঠেছে। এতক্ষণে নিশ্চয় রকেটের নীচের অংশটা খুলে পৃথিবীতে নেমে গেছে, আর দ্বিতীয় অংশটার ইঞ্জিন চালু হয়ে গেছে।

আশ্চর্য, কিছুই টের পাচ্ছি না।

জানালা দিয়ে তাকিয়ে আছি—

সে কী অন্ধকার! কোথায় সেই নীল আকাশ? এযে অন্ধকারের মহাসমুদ্র, আর তার বুকে অসংখ্য আগুনের গোলা।

এগুলো কি? তারা নাকি? মিট্ মিট্ করে না তো? কেন? আকাশে এতো তারাও আছে?

ওটা আবার কি জ্বলছে? বিরাট একটা আগুনের গোলা দাউ দাউ করে জ্বলছে—আর তার থেকে বেরিয়ে-আসা লক্লকে জিভ গুলোর সে কী দাপাদাপি! বুঝলাম সূর্য।

কিন্তু সূর্যের আলো কই—কোথায় সেই সোনালী রোদ? এতো আগুন, তবু এতো অন্ধকার কেন? এযে দেখছি একই সঙ্গে রাত্রি আর দিন!

গোকুল এতক্ষণ চুপ করে শুনছিল। হঠাৎ কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলে উঠল—

ব্যাপার তো খুব ভাল ঠেকছেনা দাদা—কেন যে ছাই গেলে ওখানে!

গোপালদার কেমন একটা ভাব এসে গেছে। বলে চল্‌ল—

কেবিনের ভেতরের লুকোন মাইক বেজে উঠল, শুনলাম—আমরা পৃথিবীর আবহাওয়ার বাইরে এসে গেছি। এখানে বাতাস নেই বল্‌লেই চলে। বাতাসের জন্যেই আমরা আকাশকে নীল দেখি—তারাকে মিট্‌ মিট্‌ করতে দেখি। বাতাস আলোকে ছড়িয়ে দেয়। বাতাস এখানে নেই বলেই আলো ছড়িয়ে পড়ছে না, তাই এতো আলো, তবু এতো অন্ধকার! তাই তারাগুলো মিট্‌ মিট্‌ করছে না। বাইরে এখন বরফ-জমা শীতের চাইতেও শত-গুণ বেশী শীত। অথচ আপনারা দেখছেন, সূর্যের কী দাপাদাপি! এর কারণও ওই বাতাস-শূন্যতা। বাতাসে ভর করে তাপও ছড়িয়ে পড়ে। আমরা এখন আকাশের শান্ত স্তরের মধ্য দিয়ে চলেছি।

ঘড়িতে দেখি আমরা এতক্ষণে সাড়ে-পাঁচ মিনিটের মতো চলেছি। এঞ্জিনের শব্দ থেমে গেছে। রকেটের দ্বিতীয় অংশটাও বুঝি অনেকক্ষণ নেমে গেল। দম-আটকা ভাবটা কেটে বেশ একটু আরাম বোধ করছি এতক্ষণে।

কিন্তু এ আবার কী? আমার পিঠের তলার চৌকি কোথায় সরে যাচ্ছে? তলিয়ে যাচ্ছি, ডুবে যাচ্ছি—কোথায়? কোথায়?……

এমন সময় শুনতে পেলাম—ভয় নেই—লাফ-টাফ দেবেন না যেন। ঠিক যেমনটি আছেন, তেমনটি থাকুন চুপ্‌টি করে।

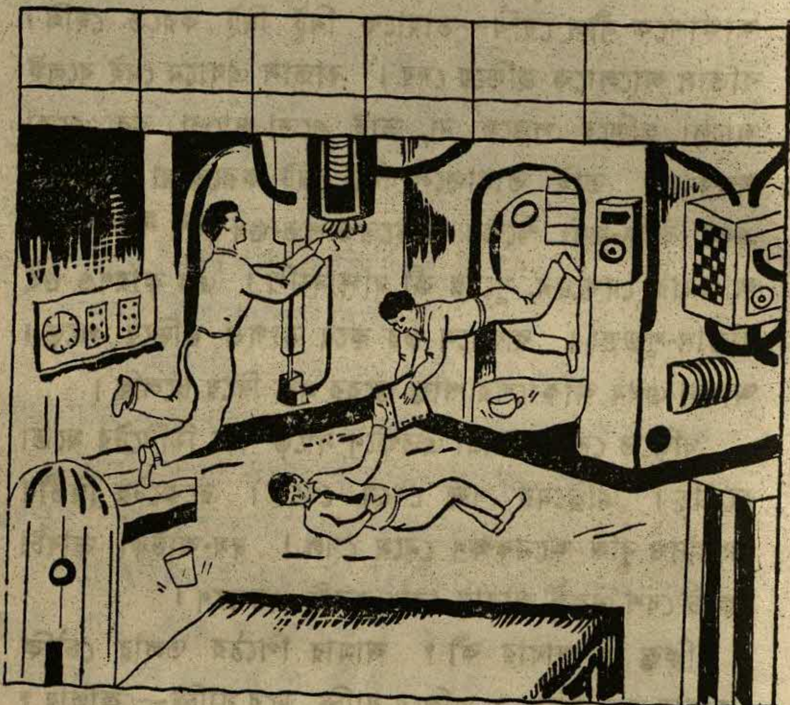
দেখি, কর্মীদের একজন সামনে দাঁড়িয়ে মুচ্‌কি হাসছেন। দিব্যি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছে তো! আর আমি কিনা কাত হয়ে শূন্যে ভাসছি! রাগে গাটা জ্বলে গেল।

কিন্তু একি দেখছি ? যাদু, না ভেলকি ?

আমাদের একজন এক ঠ্যাং তুলে ঝুলছেন—আর একজন ঝুলছেন মাথা নীচে, পা উপরে! ব্যাপার কি ?

এটা কি ভেসে গেল—কাপ ? ওটা ? ডিস ?

আরে ? আরে ? গেলাসগুলোও ভাসছে যে ?...



আরও একজন কর্মী এলেন। তাঁরা দুজনে মিলে আমাদের ধরে পায়ে একরকম জুতা পরিয়ে দিলেন। সাথে সাথে সে আর এক ভেলকি! ডিগবাজী খেয়ে টক্কাস্ করে আমাদের পা সেঁটে গেল কম্বল মোড়া দেওয়ালের সেই লোহার পাতের সঙ্গে।

আরে! দেওয়ালটা মেঝে হয়ে গেল যে! সব উলটে-পালটে তালগোল পাকিয়ে কি যে হয়ে গেল—কিছুই ঠাহর

করতে পারলাম না। পাইলটের কেবিন ছিল মাথার উপরে —এখন দেখি চলে এসেছে পাশের দিকে।

কর্মীদের একজন বল্‌লেন—

এ অবস্থার কথা তো আগেই বলেছি—তবে দুষ্টুমি করে আমরা একটু দেরী করে এলাম। আপনাদের এই দুর্ভোগের জন্য আমরা খুব দুঃখিত। মাফ্ করবেন, কিছু মনে করবেন না যেন।

এই বলে তাঁরা আমাদের চৌকিগুলোকে কেমন করে যেন ভাঁজ করে দিব্যি আরাম-চেয়ার বানিয়ে দিলেন। বললেন—এইবার হেঁটে এসে বসুন তো দেখি—। এই—এই তো পেরেছেন দেখছি! হাঁটি—হাঁটি পা-পা—

আমি জিজ্ঞেস করলাম—ব্যাপারটা কি করলেন বলুন তো? এখন তো বেশ আছি।

তিনি বল্‌লেন—

কিছুই না—খুব সামান্য। যে জুতা পরেছেন—তার তলায় রয়েছে চুম্বক, আর আপনার পায়ের তলায় রয়েছে কম্বলে মোড়া লোহা। চুম্বক লোহাকে টেনে ধরেছে। তাই পায়ের তলায় ভর করবার মতো একটা কিছু পেয়েছেন —সঙ্গে সঙ্গে আপনার হারানো ওজনও ফিরে পেলেন। বুঝলেন তো?

আমাদের কি রকম গা গুলোচ্ছিল।

বুঝতে পেরে কর্মীটি একটা করে বড়ি আমাদের খেতে দিলেন। ভারী মিষ্টি গন্ধ তার। খেয়ে বেশ আরাম পেলাম।

তারপর বুঝলে, খেতে বসে সে আর এক বিতিকিচ্ছির ব্যাপার! কিছুই গেলা যায় না, কিছুই তল হতে চায় না।

খাবারগুলো সব উড়ে উড়ে যেতে চায়। জলের গেলাস এলো। কিন্তু জল কই? এ যে দেখছি ছোট বড় নানা রকম গোল্লা গেলাস থেকে বেরিয়ে উড়ে উড়ে যাচ্ছে। কতগুলো আবার আমার নাক-মুখ ভিজিয়ে দিয়ে চলে গেল!

কর্মীটি দেখছিলেন। তাড়াতাড়ি এসে খাবার কায়দাটা শিখিয়ে দিতে তবে বাঁচলাম।

একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে নাকি, গোপালদা? বলছ, বল—তাই বলে একেবারে—? নকুল বলে বসল।

গোপালদা ভীষণ চটে উঠল। বল্‌ল—নাই শুনবে তো আমায় ডেকেছিলে কেন? অজ্ঞানকে বিজ্ঞান বোঝাতে যাওয়া দেখছি মহাপাপ! যত্তোসব—

অনেক করে গোপালদাকে ঠাণ্ডা করবার পরে আবার শুরু হল—

ভাবছ আমি খুব গুল দিচ্ছি? তাই না? অবশ্য পৃথিবীতে বসে তাই মনে হবে, দোষ নেই তোমাদের। সম্পূর্ণ ওজন বিহীন অবস্থা বলতে কি বোঝায় তা পৃথিবীতে বসে সত্যিই বোঝা কষ্ট। পৃথিবীর বাইরে তো যাওনি কখনো, বুঝবে কি করে? একটু আগেইতো তোমরা শুনলে কেমন করে চুম্বক-ওলা জুতা পরে তবে আমরা দাঁড়াতে পারলাম। আমাদের পায়ের তলায় শক্ত কিছু না থাকলে আমরা আমাদের ওজন টের পাই না।

এটা বোঝো তো?—না তাও বোঝো না?

পৃথিবীতে যে আমরা এত সহজে চলে-ফিরে বেড়াতে পারছি—তার কারণ হল ঐ পায়ের তলার শক্ত মাটি। মাটি টানছে আমাকে, আমি টানছি মাটিকে। তাই আমার পা চেপে আছে মাটির উপর। এটাই হল পৃথিবীতে আমাদের

ওজন-বোধ। এই বোধটুকু জন্মালেই বাকীটুকু বুঝতে পারবে।

এখন পায়ের তলা থেকে হঠাৎ যদি মাটি সরিয়ে নেওয়া যায়? কি হবে? বল, কি হবে? হাঁ করে রইলে যে! বল না দেখি?—

হবে এই, যে আমি পড়ে যেতে থাকব।

কোথায় পড়ব?

যে দিক থেকে মহাকর্ষের টান বেশী আসবে সেই দিকে—আর যতোই পড়ব, পড়ার বেগ ততোই বেড়ে যাবে। আর যদি কোন টান-বিহীন জায়গায় এসে পড়ি, তবে কেবল ভেসেই বেড়াব।

এখন আমাদের এই অবস্থাটা হল কেন, বুঝে নাও।

আমরা এমন একটা জায়গায় এসে পড়েছি, যেখানটায় পৃথিবীর টান কমতে কমতে খুব কমে গেছে, আর চাঁদের টান সবে টের পাওয়া যাচ্ছে। দুটোয় কাটাকুটি হয়ে একটা টান-শূন্য অবস্থা এসে দাঁড়িয়েছে।

এখন, পৃথিবীতে পায়ের তলার ভর যেমন মাটি, মহাশূন্যে রকেটের ভর হল এই টান। রকেটের সেই ভর আর এখন নেই—কাজেই আমাদের এই ওজন-বিহীন অবস্থা। এ ভারী মজার অবস্থা—কিছুই পড়ে যায় না—কিছুই ভাঙেনা—সব ভেসে ভেসে বেড়ায়। এ অবস্থায় তুমি একটা ছুঁচের ডগায়ও দিব্যি শুয়ে থাকতে পার।

এবার বুঝলেতো? গবেট কোথাকার!—

যাকৃগে। এবার আসল কথা শোনো—

জানালা ঘেঁসে বসে আছি। দূর আকাশে বলের মত কি একটা ভেসে যাচ্ছে। আবছা আবছা দেখতে পাচ্ছি।

শুনলাম, ওটা হল আমাদের পৃথিবী। মনটা ব্যাথায় মোচড় দিয়ে উঠল। মাইক বলে চলেছে—পৃথিবীর পেছন থেকে ঐযে কালো মতন একটা চাকৃতি ভেসে উঠেছে দেখছেন, ঐ হল চাঁদ।

ঐ তা হলে চাঁদ! ওখানেই আমরা যাচ্ছি!

হঠাৎ সাঁ করে ঝড়ের বেগে কি একটা আমাদের পাশ দিয়ে ছুটে গেল। রকেটের তীব্র আলো তার উপর গিয়ে পড়ল। কি সাংঘাতিক! এ যে একটা পাহাড়!

মাইক বলে উঠল—ঈশ্বর আমাদের বাঁচালেন। ধাক্কা লাগলে আর উপায় ছিল না। এটা হল একটা মস্ত উল্কা। এরা মহাশূন্য যাত্রা পথে ভয়ঙ্কর শত্রু। ছোট বড় নানা রকমের আছে এরা।

নানা রকম ধাতু-পাথরে নিরেট জমাট এদের দেহ। এরা সৌরজগতের বাসিন্দা। এরা সূর্যের সংসারে ঢুকে পড়েছে জোর করে। তাই বাঁধা নিয়মে চলতে চায় না। উড়নচণ্ডী, নিয়ম-ভাঙ্গা—তাই এদের নাম 'উল্কা'।

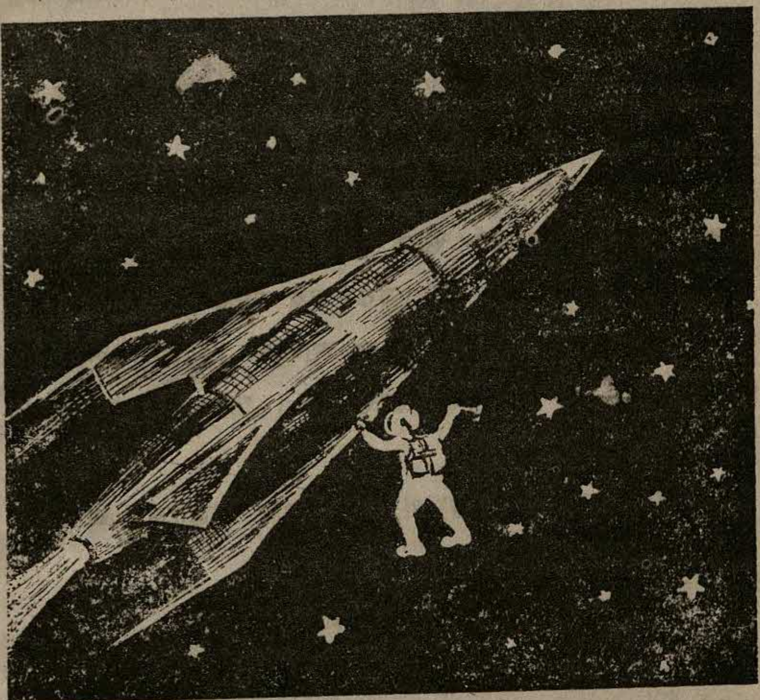
একা চলেনা এরা। চলে দলে দলে, ঝাঁকে ঝাঁকে। বিশেষ কতকগুলো দিন আছে, যখন পৃথিবী চলতে চলতে হাজির হয় এদের পথের কাছে। আর যায় কোথা? পৃথিবীর টান পারে না সামলাতে। সাঁ করে নেমে যায় পৃথিবীর বুকে। তেজহীন, আলোহীন উল্কা দারুণ বেগে বাতাস ঠেলে এগুতে থাকে, আর তারই ফলে জ্বলে ওঠে। আর তখনই পৃথিবী থেকে আমরা এদের দেখতে পাই—ঐ যে 'তারা-খসা', ঐ হল এই জ্বলন্ত উল্কা। চাঁদকে এরা ক্ষতিবিক্ষত করেছে—দেখবেন 'খন।

এদিকে চাঁদ ক্রমেই বড় হয়ে দেখা দিচ্ছে। বড়—বড়—

বড়—আরও বড়। এক পিঠে তার আলো, আর-পিঠে অন্ধকার।

জানালা ঘেঁষে বসে আছি—একটুও নড়তে ইচ্ছা নেই। যা দেখছি কোন দিনও আর তা দেখব না—প্রাণ ভরে দেখে নেই।

কিন্তু এটা আবার কী দেখছি? মাছের মত সাতার



কাটছে—আকাশটা যেন একটা পুকুর! কি ওটা? পাখী? না তো! মানুষ? না তো! অমন অদ্ভুত চেহারা মানুষের হয় কখনও?

মাথাটার মধ্যে কেমন যেন গোলমাল ঠেকছে। ভুল দেখছি না তো? কাকে বা জিজ্ঞেস করি?—

ঠিক এমনি সময় মাইক কথা বলে উঠল—

তাকিয়ে দেখুন বাইরে—আর একটা নতুন জিনিস দেখবেন।

ছোট ছোট এক ঝাঁক উল্কার ধাক্কা লেগে রকেটের বাইরের দেওয়ালটা খানিকটা চটে গেছে। তাই আমাদের একজন কর্মী গেছেন তা মেরামত করতে। ওঁর গায়ে যা দেখছেন তাকে বলে—'স্পেস্-স্যুট্' (Space suit)। মহাকাশ যাত্রার পথে এগুলো সঙ্গে নিতে হয়। এগুলো এমন জিনিস দিয়ে তৈরী যাতে উল্কা অথবা মহাকাশের নানারকম বিপদজনক আলো কোন ক্ষতি করতে পারে না।

ভাবছেন, লোকটি চলন্ত রকেট মেরামত করছেন কি করে ? তাঁর কাছে কিন্তু রকেট চলন্ত নয়, স্থির। তার মানে, রকেট যে বেগে ছুটছে—ওঁ-ও সেই বেগে চলেছেন। রকেটের টান বা আকর্ষণ ওঁকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

ঐ পোষাকের মধ্যে নানা রকম যন্ত্র আছে। কাজ শেষ হলেই ওঁ আবার ভেতরে চলে আসবেন। চাঁদে পৌঁছে আপনাদেরও এই পোষাক পরতে হবে। তখন দেখবেন।—

তাজ্জব বনে গেলাম !

হাসতে হাসতে ক্যাপ্‌টেন এসে দাঁড়ালেন আমার সামনে। বল্‌লেন—

কনট্রোল থেকে বলে পাঠিয়েছে—আপনার বাঁ-বুকে চিন্ চিনে একটা ব্যাথা হচ্ছে, এই অষুদটা আপনাকে এখুনি খেতে হবে।

আমি তো ভাই, বুঝলে কিনা—একেবারে হাঁ···

ব্যাথা ? সত্যই তো ! বাঁ-ধারের বুকটা ব্যথা-ব্যথা লাগছেই তো বটে—মাথাটাও কেমন যেন ঝিম্ ঝিম্ কচ্ছে···

ক্যাপ্‌টেন বল্‌লেন—একদম হাঁ হয়ে গেলেন যে ! নিন্—শিগ্‌গির খেয়ে নিন—জল্‌দি—সময় খুব কম।

আর এতেই হাঁ হলেন? কণ্ট্রোলে যাঁরা বসে আছেন, তাঁরা আমাদের সব খবর রাখছেন, আমাদের নাড়ী-নক্ষত্র-সব! নৈলে ওঁরা জানলেন কি করে আপনার বুকে ব্যথা হচ্ছে, অষুদ খাওয়া দরকার। আমরা কে কখন কেমন থাকছি, রকেটের যন্ত্রপাতি ঠিকমত চলছে কিনা, ঠিক পথে আমরা যাচ্ছি কিনা—স-ব ওঁরা জানছেন। আর জেনেই কি করতে হবে তাই বলে দিচ্ছেন।

ওই যে দেখলেন একটু আগে শূন্যে দাঁড়িয়ে রকেট মেরামত করা হল—সেটাও হল ওঁদেরই নির্দেশে। আমরা তো জানতেই পারিনি যে উল্কার ঘায়ে আমাদের রকেটটা জখম হয়েছে। ওঁরা জেনেছেন, এবং বলে দিলেন কী করতে হবে। মোটকথা, সারাক্ষণ আমরা রয়েছি ওঁদের চোখের সামনে। আমরা নিরাপদে পৃথিবীতে ফিরে না যাওয়া পর্য্যন্ত ওঁদের আর বিশ্রাম নেই।

কিন্তু ঐ—ঐ দেখুন—

এই বলেই তিনি দেওয়ালের কাঁটা-ওলা সেই যন্ত্রটির দিকে আঙুল তুলে দেখিয়ে একটা খালি বিছানায় টান্‌টান্ হয়ে শুয়ে পড়লেন। দেখি কাঁটাটা এক-এর ঘর ছাড়িয়ে নীচের দিকে নামছে।

বুঝলাম ব্যাপারটা।

ক্যাপ্‌টেন বল্‌লেন—

আর দুই মিনিট,—দুই মিনিটের মধ্যেই আমরা চাঁদে পৌঁছব। ঐ শুনুন ইঞ্জিন আবার চলছে। এবার চলছে ব্রেক কষতে—যাতে চাঁদের টানে হুমড়ি খেয়ে আমরা না পড়ি। যদি পড়ি, তবে কিন্তু সব শেষ। এই নামাটাই হল পাইলটের সব চাইতে শক্ত কাজ।

আবার দম আটাকা ভাব—আবার সেই বুকে পাথর-চাপা অবস্থা।

কাঁটাটা দুই আর তিন এর মধ্যে নড়ছে। ধীরে—খুব ধীরে রকেটটা নামছে। একটা তীব্র আলো রকেটের মাথা থেকে বেরিয়ে চাঁদের গায়ে পড়ল—স্পষ্ট দেখলাম চাঁদকে। তারপরে কখন যে রকেটটা গিয়ে চাঁদের উপর দাঁড়াল—টেরও পেলাম না—একটু ঝাঁকুনিও নেই।

আমরা চাঁদে এসে গেছি—মাইক বলে উঠল।

অবশেষে তিন দিনের বন্দীদশা আমাদের শেষ হল—চাঁদে পোঁছলাম।—বাঁচলাম!

ক্যাপ্‌টেন শুয়ে ছিলেন, এবার উঠে দাঁড়ালেন।

বল্‌লেন—চলুন, এবার চাঁদে বেরিয়ে আসি।

আমরা বল্‌লাম—চলুন।

বাঃ রে—বেশ তো—ভুলে গেছেন? এটা পৃথিবী নয়, চাঁদ। চলুন বল্‌লেই তো চলা যায় না। আগে ঐ স্পেস স্যুটগুলো পরুন—তবে তো!

বেরিয়ে দেখি, ঘুট্‌ঘুটে কালো আকাশের বুকে পৃথিবীর কী রূপ, সে কতো বড়, আর কী তার আলো! আমাদের তো একজন ফস্‌ করে একখানা কবিতার বই বার করে পড়তেই শুরু করে দিল!

পৃথিবীর বুকে চাঁদের আলোর চাইতে, চাঁদের বুকে পৃথিবীর আলো আশীগুণ বেশী—

—ক্যাপ্‌টেন জানালেন।

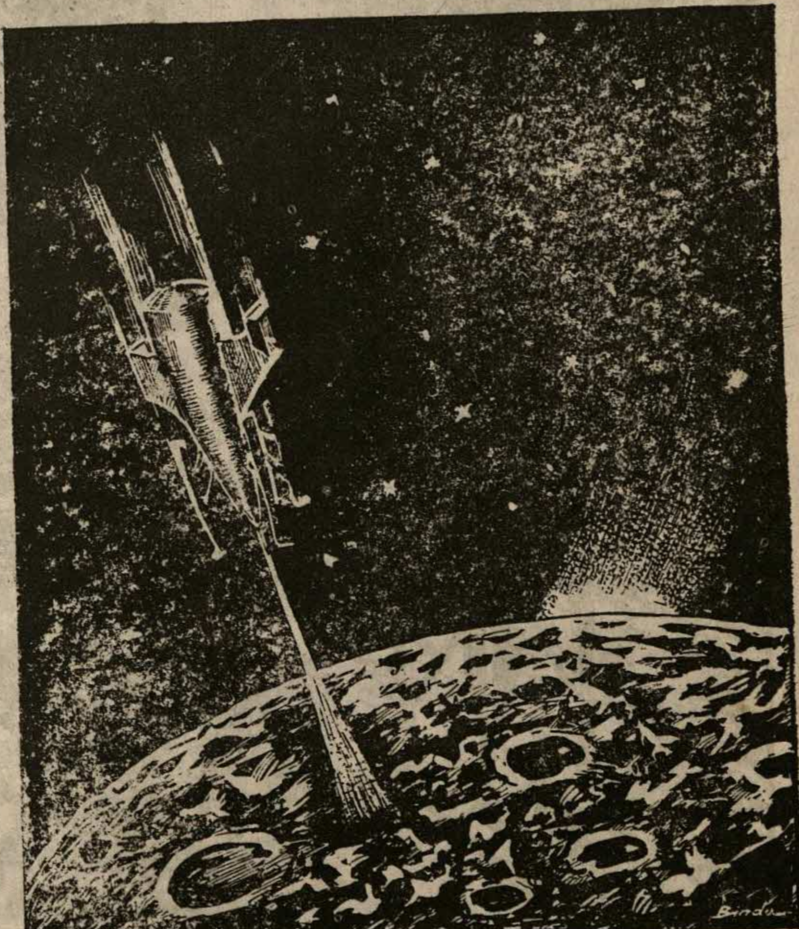
*   *   *

আমাদের পায়ের তলায় চাঁদ—আমাদের সেই 'সোনার চাঁদ'। এ কী তার ফুটি-ফাটা, ভাঙ্গা-চোড়া পোড়া-মুখো

চেহারা! হায়রে সোনার চাঁদ! সোনার কপালে আমার 'টি' দেবে কে?

কথা বলতে গেলাম—শব্দ নেই তো!

ক্যাপ্‌টেন মুখে কি একটা যন্ত্র লাগিয়ে বল্‌লেন—বাতাস নেই, তাই এমনিতে কথা বলা চলবে না। চাঁদ যেমনি বোবা



তেমনি কালা! যন্ত্র মুখে লাগিয়ে কথা বলুন। আর খুব পা টিপে টিপে হাঁটবেন যেন, নইলে টলে পড়ে যেতে পারেন।

কেন বলুন তো ?—আমি জিজ্ঞেস করলাম।

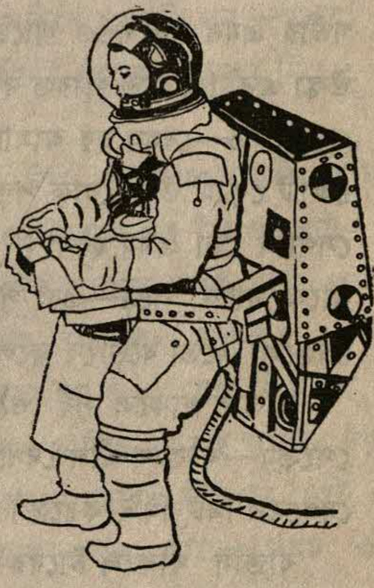
তিনি বললেন—আগেই তো বলেছি চাঁদে এলে আমাদের ওজন পৃথিবীর ওজনের ছয় ভাগের এক ভাগ হয়ে যায়।



যে পোষাকটা পরেছেন, পৃথিবীতে ওর খুব বেশী ওজন—আপনার তোলাই কষ্ট হবে, পরে হাঁটা তো ছাড়। কিন্তু

ওটা পরেও এখন আমাদের ওজন যা দাঁড়িয়েছে তা পৃথিবীতে আপনার আসল ওজনের চাইতেও কম। কাজেই পৃথিবীর অভ্যাস মতো যদি চলতে চান—তবে পরে-টরে যাবেন কিন্তু।

এমন সময়—আহা, সে কী দেখলাম!—আকাশ জুড়ে সূর্য উঠছে।



তোমরা তো জানো, আমাদের এক দিন মানে চাঁদের চৌদ্দ দিন। রকেটটা আমাদের এমনি হিসাবে ছাড়া হয়েছিল যে চৌদ্দ দিনের মাথায় আমরা গিয়ে পৌঁছতে পারি।

পুরো একটি ঘণ্টা ধরে ধী-রে ধী-রে সূর্য উঠল। কিন্তু কোথায় সেই রং-এর খেলা? কোথায় সেই আলো-আঁধরি? কোথায় সেই রংয়ে-রংয়ে রঙিন ঊষা? কোথায় সেই জবা-ফুলের মতো রক্ত-রং? এযে শুধু আগুন!

কিন্তু পৃথিবী সেই যে এক পায়ে দাঁড়িয়ে আছে—এক চুল নড়ছে না তো?

ক্যাপ্‌টেন বললেন—চাঁদের আকাশে পৃথিবী স্থির। কারণ চাঁদ ঘোরে পৃথিবীর চার দিকে, পৃথিবী নয়। কাজেই এখানে হারিয়ে যাওয়ার ভয় নেই। পৃথিবী দেখেই পথ চিনে নিতে পারেন।

*　　　*　　　*

নিঝুম, নিস্তব্ধ, নিঃশব্দ চাঁদ। পাহাড়, পর্বত, পাথর,

সুড়ি, ছাই আর বিরাট বিরাট সব গর্তগুলি দেখিয়ে ক্যাপ্‌টেন বললেন—ঐ দেখুন, উল্কা কী করেছে। উল্কাগুলো চাঁদের বুকে রীতিমত কামান দাগায়। দারুণ বেগে ছুটে এসে ফেটে পড়ে—আর তারই ফলে এই। কতো বড় বড় সব গর্ত আছে, জানেন ?

দেড়শো মাইল চওড়া এবং চৌদ্দ পনের হাজার ফিট গভীর এমন সব গর্তও আছে। বাতাস যদি থাকত তবে উল্কা এতটা করতে পারত না। বাতাসের চাপে উল্কা জ্বলে পুড়ে যেত—যেমন হয় আমাদের পৃথিবীতে। অজস্র, অসংখ্য, কোটি কোটি উল্কা রোজ পড়ছে আমাদের পৃথিবীতে। কই, সেখানে তো এমন হয়না ? অবশ্য খুব বড় গোছের দুএকটা মাঝে মাঝে পড়ে—এবং পড়ে এমনি ধারা গর্ত করে দেয়। সেগুলো এতো বড়ো যে জ্বলে পুড়ে সবটুকু শেষ হতে পারেনা।

বাতাস থাকলে সূর্য ওঠার সময় রং-এর খেলা দেখতে পেতেন—আকাশ নীল দেখতে পেতেন—আর তারাগুলোও দেখতেন মিট্‌ মিট্‌ করছে।

বাতাস থাকলে চাঁদের এমন মুখ-পোড়া চেহারা কখনও হত না। দেখ্‌ছেন, এখানে গোলগাল বা বাঁকাচোরা বলে কিচ্ছু নেই। সব খোঁচা-ওলা, কোনা-ওলা, সোজা মাথা উঁচিয়ে আছে। বাতাস আর জল আছে বলেই পৃথিবী এমন গোলগাল—সুডৌল, সুন্দর।

বাতাস থাকলে চাঁদে মেঘ হত, মেঘ হলে জল হত। বাতাস আর জল মিলে চাঁদকেও পৃথিবীর মতো সুন্দর করে গড়ে তুলত। কিন্তু তা হয়নি। তাই চাঁদ এতো রুক্ষ, এতো নির্জন, এতো নিঃসঙ্গ। কোথাও একটু সবুজের ছোঁয়া মাত্র নেই।

*　　*　　*　　*

হঠাৎ দেখি আমাদের একজন সহযাত্রী নেই। কোথায় গেলেন? আরে? এই তো ছিলেন এরই মধ্যে—? ক্যাপ্‌টেন কিছু না বলে সোজা কিছুদূর এগিয়ে গেলেন—তার পরে তাঁকেও আর দেখতে পেলাম না। জামার মধ্যে যে রেডিয়োটা ছিল তাতে শুনতে পেলাম তিনি আমাদের ডাকছেন। গিয়ে দেখি, বেশী দূর নয়, তাঁরা দুজনই দাঁড়িয়ে আছেন। বন্ধুটি বলছেন—তিনি একটু ঘুরে-টুরে দেখছিলেন—আমরা যে তাঁকে হারিয়ে ফেলব—তা তিনি বুঝতেই পারেন নি।

ক্যাপ্‌টেন বল্‌লেন—

ব্যাপারটা বুঝলেন? চাঁদ আকারে পৃথিবীর চাইতে পঞ্চাশগুণ ছোট। এতো ছোট বলে ওর বাঁকও ছোট।

সমুদ্রের বুকে যখন জাহাজ আসছে প্রথম টের পাই—তখন সবাইর আগে দেখা যায় জাহাজের মাস্তুল। বাকীটা পৃথিবীর বাঁকের নীচে ঢাকা থাকে। সেটা কিন্তু বহু, বহু দূরের ব্যাপার। কিন্তু এখানে খানিক গেলেই আপনি চাঁদের বাঁকের তলায় ঢাকা পড়ে যাবেন, কারণ, চাঁদ খুব ছোট যে।

ঐ দেখুন, ঐ পাহাড়গুলো—খুব কাছে—অথচ ওদের অর্দ্ধেকটাই দেখা যাচ্ছেনা—বাঁকে ঢাকা পড়ে আছে।

ক্যাপ্‌টেন আমাদের নিয়ে অনেক ঘুরে ফিরে বেড়ালেন। একটা জায়গায় এসে বল্‌লেন—

জানেন, চাঁদে 'সাগর' আছে? কিন্তু তাতে এক ফোঁটা জল নেই! কতো তাদের নাম—'শান্তি সাগর', 'অমৃত সাগর', 'তুহিন সাগর'—আরোও কতো!

ব্যাপার হল, উল্কার বিস্ফোরণে, কিম্বা চন্দ্র-কম্পনের (ভূমিকম্পের মতো) ফলে ঐ যে সব বড় বড় গর্তগুলো সৃষ্টি হয়েছে, ওগুলোকেই গ্যালিলিও 'সাগর' বলে ভুল

করেছিলেন—সেই ভুল এখনও চলছে। কোনো কোনো সাগরের মধ্যে আবার পাহাড় মাথা খাড়া করে দাঁড়িয়ে আছে—ঐ দেখুন।

এর পরে তিনি আমাদের একটা ভারী মজার জিনিস দেখালেন। সেটা চাঁদের মাঝামাঝি জায়গায় 'মেঘ সাগরের' কাছে।

প্রায় ষাট মাইল লম্বা খুব উঁচু সোজা একটা দেয়ালের মতো দাঁড়িয়ে আছে সেটা। দেখে অবাক হয়ে গেলাম। কি করে এমন অদ্ভুত ব্যাপার সম্ভব হল ?

ক্যাপ্‌টেন বল্‌লেন—

এটা নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে। কেউ বলেন সাংঘাতিক রকম কোন বিস্ফোরণ বা চন্দ্র কম্পনের ফলে এটা জন্মেছে। আবার কেউ বলেন, সূর্য উঠলে চাঁদ ভীষণ গরম হয়ে ওঠে, আর সূর্য ডুবলে বা গ্রহণ লাগলে ভীষণ ঠাণ্ডা হয়ে যায় কিনা, তাই এরকম হঠাৎ গরম, আর হঠাৎ ঠাণ্ডার ফলেই এটার সৃষ্টি।

কিন্তু এতো হল শুধু অনুমান। এর পেছনের সত্য কতটা আছে তা আমাদের জানতে হবে, এবং সেই জন্যই আমাদের চাঁদে আসা।

এই বলে তিনি তাঁর একজন সহকর্মীকে কি যেন ইঙ্গিত করলেন। সহকর্মীটি তখুনি কি রকম একটা যন্ত্র নিয়ে হাজির হলেন। ক্যাপ্‌টেন খানিক এদিক ওদিক দেখে যন্ত্রটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চাঁদের বুকে বসাতে লাগলেন।

আমি বল্‌লাম—এটা কি করছেন ? কী হবে এতে ?

ক্যাপ্‌টেন বল্‌লেন—এবারে সব অনুমানের শেষ। আর কোনো 'বোধহয়', 'হয়তো'র অপেক্ষা আমরা করব না। এই

রইল এই যন্ত্র চাঁদের বুকে পোতা। এ করবে কি জানেন? যখুনই চাঁদে কোন বিস্ফোরণ ঘটবে, বা যখুনি চন্দ্র-কম্পন হবে—তখুনি সাথে সাথে খবর পাঠাবে পৃথিবীতে। আর ওখানে বসে আমাদের বিজ্ঞানীরা বিচার করে দেখবেন এরকম বিস্ফোরণ বা কম্পনে চাঁদের প্রকৃতির কী কী পরিবর্তন ঘটতে পারে। একেবারে হাতে-নাতে পরীক্ষা!

* * * *

এই ন্যাড়া-মুড়ো, ফুটি-ফাটা, পোড়া-মুখো চাঁদ দেখতে আর ভাল লাগছিল না। আর তাছাড়া, বলতে কি, বাড়ীর জন্যও মনটা কেমন কচ্ছিল। ক্যাপ্‌টেনকে বল্‌লাম—

বড্ড খারাপ লাগছে। চলুন, এবারে ফিরে যাই। তবে দেখুন স্যার, কিছু মনে করবেন না—চাঁদের সেই চরকা-কাটা বুড়িটা? আর সেই খরগোস? তারা গেল কোথায়? একটু দেখা করে যেতাম। ইয়ে, মানে—আমার ছোট্ট-মেয়ে এলাটা বেজায় চাঁদ-পাগলা কিনা, ওকে একটু বলতে-টলতে হবে তো।

ক্যাপ্‌টেন হো হো করে হেসে উঠলেন।

বল্‌লেন—ওসব কিচ্ছু নয় মশায়। সব বাজে গল্প, মানুষের কল্পনা। পৃথিবী থেকে চরকা-বুড়ি বা খরগোস বলে যা মনে হয় তা হল এই গর্তগুলো, আর পাহাড়গুলোর আলো-ছায়ার খেলা। বাতাস নেই বলে এখানে আলো ছড়িয়ে পড়েনা, তাতো জানেন, তাই আলোর নীচেই থাকে ভীষণ অন্ধকার। তাই এমন দেখায়।

হিসেব মত আমাদের ফিরবার সময় ক্যাছিয়ে এলো। ক্যাপ্‌টেন বল্‌লেন—

চলুন রকেটে ফিরে যাই। একটু পরেই রওনা হওয়ার

কথা। ফিরবার পথে আমরা চাঁদের লুকোনো মুখখানা একবার দেখে যাব'খন—ও পিঠের কতগুলি ফটোও তুলতে হবে। মানুষ আজও ঐ অন্ধকার পিঠের বিশেষ কোন খবর জানতে পারেনি।

এমন সময় ওঁদের একজন এসে বললেন—কিন্তু স্যার একটা কাজ যে পড়ে রইল? হাতে তার একটা থলে। ক্যাপটেন থলের দিকে একবার চেয়ে বললেন—ওঃ হো—ভুলেই তো গেছলুম দেখছি—নিন্, তাড়াতাড়ি করুন।

এই বলে তাঁরা তিনজনা মিলে টপাটপ্ চাঁদের নুড়ি কুড়ুচ্ছেন আর থলেতে পুরছেন। একজন আবার কি রকম একটা যন্ত্র ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চাঁদের মাটির মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেন। তুললেন যখন—তার মধ্যে চাঁদের পেটের মধ্যেকার পাথর নুড়ি ভর্তি। সেগুলোও পোরা হল থলেতে।

কী হবে এদিয়ে?—আমি শুধোলাম।

চাঁদের ঠিকুজি।—

মানে?—

মানে আবার কী? চাঁদের বয়স, তার জন্মবৃত্তান্ত, এই সব নিয়ে ভারী তর্ক চলছে। পণ্ডিতে পণ্ডিতে তুমুল লড়াই। কিন্তু মজাটা কোথায় জানেন? ওঁরা কেউ চাঁদে আসেননি। শুধু কাগজে লড়াই—শুধু হিসেব আর অনুমান। তাই নিয়ে চললুম এই থলে-ভর্তি পাথর-নুড়ি। এবার দেখুন ওঁরা পরীক্ষা করে—এই পাথর-নুড়িগুলোর বয়স কতো; কোন স্তরের পাথর কতো পুরোনো, কী দিয়ে এগুলো তৈরি—মানে, কি কি মৌলিক পদার্থ রয়েছে এর ভেতর। তাতেই চাঁদের বয়সের একটা খাঁটি হদিশ মিলবে। আরও জানা যাবে—চাঁদ সত্যই পৃথিবীর সন্তান কিনা। মানে, পৃথিবীর

শৈশবে একটা টুকরো ছিট্‌কে গিয়ে চাঁদ তৈরি হয়েছিল কিনা।

আরও জানা যাবে চাঁদের মাটি পাথরে জল আছে কিনা। দরকার হলে ওর মাটি নিংড়ে মানুষ জল বার করতে পারবে কিনা। ওখানে ঘর বাঁধতে হলে জল চাইতো!

* * * *

আমরা রকেটের দিকে রওনা হলাম। খানিক গিয়ে দেখি একজন আবার নেই। আরে! গেলেন কোথায়! আমি খানিকটা এগিয়ে গেলাম। গিয়ে দেখি তিনি ক্যামেরা হাতে নিয়ে কিসের যেন ফটো তুলছেন।

কচ্ছেন কি মশায়—খুঁজে মরছি আপনাকে!

পদ-চিহ্ন—পদ-চিহ্ন কুড়ুচ্ছি।

মোলো যা—ক্ষেপে গেলেন নাকি সবাই চাঁদে এসে!

কিসের ছবি তুলছেন ওগুলো?

আরে মশায় এতো কসরৎ করে যে চাঁদে এলুম, হেঁটে বেড়ালুম, তার তো একটা প্রমাণ চাই। পৃথিবীর মানুষ তো বিশ্বাসই করবে না আমাদের কথা। তাই নিয়ে চললুম চাঁদের বুকে আমাদের পায়ের ছাপের ছবি। কাগজে বেরুবে সবাই দেখবে, তবে না বিশ্বাস করবে। আমরাও দেখব, আমাদের বাড়ীর সবাইও দেখবে!

পাইলট অনেকক্ষণ বসে রকেটের যন্ত্রপাতি ভাল করে পরীক্ষা করে দেখলেন,—তারপরে ইঞ্জিনটা একবার খুব জোরে ঘুরালেন। একটা আলো জ্বলে উঠল—বুঝলাম এবারে রওনা হব। ক্যাপ্‌টেন বল্‌লেন—ফিরবার হুকুম এসেছে, চলুন এবার।

আবার সেই জানলার কাছে বসেছি। বাড়ী যাচ্ছি, মনটা খুশিতে ভরে উঠল।

রকেটটা একটু কেঁপে উঠল—তারপরে আবার যাত্রা হল শুরু।

*　　　　*　　　　*

আবার সেই অন্ধকার আকাশে আগুনে সূর্য, আগুনে তারা, সব ভাসছে। একই আকাশে চাঁদ আর পৃথিবী জ্বলছে। সে দৃশ্য আর ভুলবনারে ভাই!

দুটো দিন এমনি করে কেটে গেল। পৃথিবী ক্রমশঃ বড় হয়ে দেখা দিচ্ছে—বড়—আর-ও বড়।

ঐ আমার পৃথিবী, আমার জন্মস্থান, আমার কর্মস্থান, আমার মায়া, মমতা, স্নেহ, ভালবাসা, হাসি, কান্না, সুখ দুঃখ মাখানো পৃথিবী—আমার সব!—

পৃথিবী আমাকে ডাকছে—মা যেমন ছেলেকে ডাকে—তেমনি ডাকছে।—

যাচ্ছি—যাচ্ছি, আমি তোমার কাছেই যাচ্ছি মাগো!—চাঁদে আমার কাজ নেই, স্বর্গ আমি চাইনা—আমি তোমার বুকেই থাকব—যাচ্ছি। *　　*　　*

উঠুন—আমরা এসে গেছি যে—

জানলে,—টের পাইনি,—মোটেই টের পাইনি,—কেমন যেন ইয়ে হয়ে গিয়েছিলাম। লাফ দিয়ে বেড়িয়ে এসে প্রথমেই আমার মাটির-মায়ের ধূলা মাথায় মেখে নিলাম—

*　　　　*　　　　*

সব চুপ। কারুর মুখে কথাটি নেই। গোপালদা কা যাদু জানে! কি রকম বিবশ করে দিলে আমাদেরকে!

*　　　*　　　*　　　*

বিশেটা কখন যে এসে বসছে, দেখিনি। ওটা বড্ড ঠোঁট-কাটা। বড্ড ভয় ওকে নিয়ে। তাই ওকে দেখে একটু

ঘাবড়ে গেলাম। কি জানি—আবার কি বলে-টলে বসে—

যা ভাবা তাই!

ফস্ করে বলে উঠল—

কবে তুমি নাবলে যেন গোপালদা। বল্‌লে?

গোপালদা এতক্ষণ চোখ বুঁজেছিল, যেন ধ্যানে ডুবে আছে। ধী-রে ধী-রে চোখ মেলে বল্‌লে—এই তো, কাল বিকেলে, ভাই।—

আরে! এই পরশু না তোমাকে দেখলাম বৌবাজারে ছাতা সারাচ্ছ?

দেখলেই বা। ছাতা ছিঁড়লে সারাতে হবে বৈকি।

মোল যা! তবে গেলেই বা কবে, আর এলেই বা কখন?

গেলাম কোথায়, যে আসব?

তবে যে বড় বল্‌লে—?

বল্‌লাম বলেই যেতে হবে?

মানে—?

মানে আবার কি? তোমরা পাঁচজনে ধরে বসলে, তাই একটা গল্প বলে দিলাম—এখন বোঝো তোমরা!

এই মরেছে। তবে আদৌ যাওনি?—

তবে এত খবর পেলে কোথায়? এও কি সব বানানো?

বানানো হতে যাবে কোন দুঃখে? পড়তে হয়রে ভাই, পড়তে হয়। পড়াশুনো করতে হয়, শুধু ইয়ে বেড়ালেই চলে না। পড়তে হয়, বুঝতে হয়, হজম করতে হয়। তারপরে সুন্দর করে গুছিয়ে বলার কায়দাটি শিখতে হয়। আকাশ নিয়ে আজকাল কি রকম গবেষণা চলেছে—দেখছনা, কতো মাতামাতি? কতো বই বেরিয়েছে বাজারে, কতো খবর রয়েছে ত'তে। সেই আকাশের গল্প বলে

তোমাদের তাক্ লাগিয়ে দেব বলেই তো এদ্দিন লুকিয়ে ছিলাম।

পড়েছি জান? শুনলে মুণ্ডু ঘুরে যাবে—যন্তোসব !!

* * *

ধীরে ছাতাটি বগলে নিয়ে গোপালদা হন্ হন্ করে বেরিয়ে গেল।



সহজ ভাষায় বিজ্ঞান পরিবেশনের যে রীতি গ্রহণ করেছিলেন জগদানন্দ রায়, তার সার্থক রূপায়ণ হয়েছে আধুনিক যুগে। আধুনিক বিশ্বের বৈজ্ঞানিক চেতনার সঙ্গে যোগ রেখে নিত্য নূতন বিষয় নিয়ে রচনা হচ্ছে বিজ্ঞানের বই। অনেকেই এদিকে এগিয়ে এসেছেন। কিন্তু বিষয় বৈচিত্রে, রচনার সাবলীলতায় এবং চিত্রের ভঙ্গীমায় যাঁরা শিশু পাঠককে বিজ্ঞানমুখী হতে সাহায্য করেছেন, তাঁদের মধ্যে বিশেষ ভাবে স্মরণীয় **দেবদাস দাশগুপ্ত** * * * * **'আকাশ ও পৃথিবী', 'আজবকল', 'চাঁদের দেশ', 'পরমাণুর প্রকৃতি', 'প্রাণ-এর কথা'** ইত্যাদি বইয়ে দেবদাস দাশগুপ্ত যে বিষয় বৈচিত্রের অবতারণা করেছেন তা সত্যই উপভোগ্য।

—বাংলা শিশু সাহিত্য : **গ্রন্থপঞ্জী** হইতে সংশোধীত।

(ভারত সরকারের উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গ গ্রন্থাগারিক সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত)

শ্রদ্ধেয় দেবদাসবাবু—

* * আপনার বিজ্ঞানের বইগুলি চমৎকার হয়েছে। বড় টাইপের চয়ন খুবই উপযোগী। এই বই আমার খেলাঘরের ছেলেরা নিয়মিত পড়ছে—বড়রা পড়ে পড়ে ছোটদের শোনাচ্ছে—আমার খুব কাজে লেগেছে। * * *

ইতি—

মৈত্রেয়ী দেবী

শ্রীদেবদাস দাশগুপ্তের 'আকাশ ও পৃথিবী' বইখানি পড়েছি। লেখা খুবই ভাল লেগেছে। রহস্যময় আকাশের আশ্চর্য গল্প তিনি অতি সুন্দর সরল ভাষায় বলেছেন। সকলেই বইখানি পড়ে আনন্দ লাভ করবেন।

—সুখলতা রাও